ছায়া দিগন্ত

ট্রেনটা স্টেশন থেকে ছাড়বার পরই, পয়েণ্টসম্যান জিৎনারায়ন ডিস্টাণ্ট সিগনালটার দিকে একবার তাকিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা এখনও ওভারব্রীজের দু'পাশ থেকে মন্থরগতিতে উপর দিকে উঠছে।

সারেংহাটির পাশে আজ যাত্রা আছে, রামায়ণ গানের একজন সমজদার ভক্ত জিৎনারায়ণ, সমস্ত রাত ধরে শুনবে—অবশ্য এক ছিলিম খেয়ে নেবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফাগুয়াটা এসে গেছে, জমবে ভালই, যা শীত পড়েছে।

বেশ শীত পড়েছিল সে রাত্রে, কিন্তু জিৎনারায়ণের আর মৌজ করে রামযাত্রা শোনা হয় নি।

কালভার্ট পার হবার মুখে সারেংহাটি জংশন আসার পূর্বেই ইঞ্জিনটা বে-লাইন হয়েছিল। চব্বিশ ফুট উঁচু থেকে ইঞ্জিনটা নীচে পড়েছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বিরাট একটা দৈত্যশিশু শুয়ে যেন ফোঁপাচ্ছে।

বাঁ দিকে কাৎ হয়ে ইঞ্জিনটা পড়েছিল, চাকাগুলো উপরের শূন্য আকাশের দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছে। ইসরাইল সাহেব—এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, রিলিফ ট্রেনের সঙ্গেই এসেছিলেন, এসে দাঁড়ালেন ইঞ্জিনটার পাশে। সামনের দিকের অর্দ্ধেকটা গেঁথে গেছে নীচের নালাটার ভিতরে। তখনও ষ্টীম রয়েছে, ভ্যাকুয়াম ব্রেকটা লাগান ছিল কিনা কে জানে?

নালার জল বেয়ে চলেছে ইঞ্জিনটার গায়েতে এঁকেবেঁকে, যেন দামাল দুরন্ত ছেলেটা রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করে এইমাত্র ফিরেছে।

ইসরাইলের লক্ষ্য পড়ল চিমনীর উপর ফেটে গেছে? আরও এগিয়ে গেল ইসরাইল, জুতোটা কাদায় বসে গেল—না ফাটার দাগ নয়, একটা লম্বা কেঁচো ফানেলের গায়ে এঁকে বেঁকে উঠছে। এইটে দেখার জন্য অনেক কাদা ঘাঁটতে হ'ল তাকে। বদ্ধ জলাশয়ে অনেক দিন থাকবার পর কেঁচোটার দেশ ভ্রমণের সখ হ'ল নাকি? ইসরাইল আশ্চর্য হ'ল—এই পরিবেশের মধ্যেও মানুষের মন সচেতন থাকে?

লক্ষ্য করল ইসরাইল ইঞ্জিনটা ডবলিউ-পি টাইপের। অনেক টাইপের ইঞ্জিন আছে, যেমন—সি-ডবলিউ-ডি, এ-ডবলিউ-ডি, এ-পি, ডবলিউ-পি, ডবলিউ-জি।

স্মোক বক্সের দরজাটা খুলে গেছে—ভিতর থেকে ছাই, টুকরো কয়লা বাইরে বেরিয়ে এসে জড়ো হয়েছে। নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনটা একরাশ ভস্মমিশ্রিত কয়লা প্রসব করল?

ইসরাইলের ঠোঁটে ব্যাঙ্গের হাসি ঝলসে উঠল।

ইঞ্জিনের পনি হুইল দুটো দেখা যাচ্ছে। লাইনের উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে ওরা, ঠিক টাট্টু ঘোড়ার মত। পিছনের বড় চাকাগুলির মত পনি হুইল দুটো শুধু একঘেয়ে রকমের অবিরাম ঘুরে চলে না—লাফিয়ে লাফিয়ে বেঁকে চুরে লাইনকে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে—পতিব্রতা স্ত্রীর মত। পতিদেবতার পদাঙ্ক অবিচল ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে, ভুল দেখে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হঠাৎ পিছু ফিরে থমকে দাঁড়ায় না।

ইসরাইলের মনে পড়ল ছেলেবেলায় দাদীর সঙ্গে পাটনাসরিফ গিয়েছিল। পাশের লাইনে একটা ট্রেন ছাড়বার মুখে ইঞ্জিনের চাকাগুলো ঘুরে যেতে লাগল। ট্রেনটা গতিহীন, কিন্তু লাইনের উপর চাকাগুলো শুধু ঘসঘস ঘুরে পিছনে পিছনে যাচ্ছে—ওকে স্লেমিং বলে। পরে অবশ্য ইসরাইল জেনেছিল বয়লারের ভেতর ময়লা জমলে কিংবা জলের আধিক্যে ও রকম হয়। লিভারটা ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা একটু পিছনে নিয়ে যেতে হয়, তার পর আবার সামনে, তখন চলতে সুরু করে ইঞ্জিন, প্রথম ধীরে ধীরে তার পর দুলকী চালে।

ফায়ার বক্সের উপর তামার ক্রাউন প্লেটটার দিকে নজর পড়ল—হ্যাঁ ঠিক আছে। সীসের প্লাগগুলোও গলে যায় নি—এখনও অক্ষত রয়েছে। গেজ গ্লাসের কাঁচটাও ভাঙে নি। রেগুলেটার যেটা নামলে ইঞ্জিনটা চলতে সুরু করে সেটাও অক্ষত। পিষ্টন কভারটা ফেটে গেছে। বড় চাকাগুলোর জার্নাল ঢাকাই আছে। এক্সেলবক্সেরও ক্ষতি হয় নি—চাকার তলায় ব্যালেন্সটা এখনও কালো চকচক করছে। ইঞ্জিনের পিছনে টেণ্ডারটা ইঞ্জিনের সঙ্গেই নীচে পড়েছে। পাথুরে কয়লা স্তুপাকারে টেণ্ডারের পাশে পড়ে রয়েছে।

ইসরাইলকে লাইনটা এবারে দেখতে হবে। ট্রলিটা এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নি—সেটা এলে অনেকদূর পর্যন্ত দেখে আসা যেত।

তিনটি বগী ইঞ্জিনের সঙ্গে নীচে পড়েছিল, খবরের কাগজের টীকায় বলতে হয়—"দেশলায়ের বাক্সের মত গুড়া হইয়া গিয়াছে"। চতুর্থ এবং পঞ্চম বগী দুটি নীচে পড়ে নি বটে, কিন্তু টেলিস্কোপের মত একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ক্রেন এসেছে একটা নয় দুটো। বগীগুলোকে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলছিল। ক্ষিপ্রহাতে আসগর চেন টেনে চলেছে। প্রকাণ্ড লোহার হুকটা গলিয়ে দিয়েছে একটা পার্টিসনের কব্জার ভিতরে। তাড়াতাড়ি করা দরকার—ভিতরে হয়ত অনেকগুলো মানুষ আটকে রয়েছে। কাঠ লোহার পাত, মোটা তার, ষ্টীলের কাঠামো, সব মিলে যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে।

—বাঁয়ে লাগাও। চীৎকার করে উঠল আসগর, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে ওর। জীবনরাম চিরকালই দরকারের সময় বোকা হয়ে যায়, মাংসপেশীগুলো যেন অকেজো হয়ে যায় ওর, কাজের কথা শুনতেই পায় না—এমনকি আসগরের ইঙ্গিত ও বুঝতে পারে না। আরিয়া—আবার চীৎকার করল আসগর, থরথর করে কেঁপে উঠল ভাঙা বগীটা—হ্যাঁ, ক্রেনটা চালু হয়েছে এবার। কর্কশ একটানা আওয়াজ হচ্ছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সারেংহাটির অদূরে ৩নং কালভার্টের কাছে যেন একটা বিরাট কারখানা গজিয়ে উঠেছে। হাজার হাজার কামার একযোগে হাতুড়ি পিটতে সুরু করেছে যেন।

জনস্রোতের কোলাহল, আহতদের আর্ত্তনাদ ও গোঙানি, লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণ, কুলীদের কলরোল, অফিসারদের চিৎকার সব মিলিয়ে যেন একটা তাণ্ডবের সৃষ্টি হয়েছে। এতক্ষণে একটা একটা করে দেহগুলো বের করা হচ্ছে।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ পাশেই একটা তাঁবু খাটিয়েছেন। রোগীদের ভাগ করে নিয়েছেন দু'ভাগে—ব্লাড ট্রান্সফিউসানের কেসগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রিলিফ ট্রেনের কামরায়।

নিহত ও আহতদের ষ্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাত্র ছয়টি ষ্ট্রেচার এসেছে, তাই কম্বল এবং লাঠি দিয়ে ষ্ট্রেচার তৈরী করে নিতে হয়েছে।

দুর্ঘটনা ঘটে রাত সাড়ে ন'টার পর তখন সারেংহাটি গ্রাম ঘুমন্ত বলা যায়।

সারেংহাটি জংশনের অব্যবহিত পূর্বে তিন নম্বর কালভার্টের কাছে ট্রেনটা লাইনচ্যুত হয়েছিল। তখন সারেংহাটি গ্রাম জনহীন নিস্তব্ধ—কেবল চকের দোকানগুলো খোলা আছে।

সারেংহাটি আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের অবশ্য কাজ মেটে সেই রাত একটায়। সামনে হ্যাজাক জ্বালিয়ে হরিদাস জিলিপীর জন্যে বেশন ও সবেদা গুলো রাখছে।

পাশেই বেণের দোকানের ধীরেন আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের আলোতে খাতা লিখছে। রোজ সে এই কাজটি করে—তেলের খরচও বাঁচে, চোখের কষ্টও কম হয়। রাত্রে কম আলোতে লিখতে চেষ্টা করলে ধীরেনের চোখ জ্বালা করে তা সে জানে। গনি মিঞা তার জুতোর দোকানটা বন্ধ করে চলে গিয়েছে, দোকানের সামনে অর্ধদগ্ধ কাগজটা পড়ে রয়েছে, রোজ দোকান বন্ধ করার সময় গনি মিঞা এটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

বলাই ডাক্তারের ডাক্তারখানার একটা কপাট ভেজান। টেবিলের উপরে পা তুলে দিয়ে ডাক্তারবাবু বসে আছেন—ডান ধারের টুলে বসে মহেশ বাঁড়ুজ্যে তাঁর প্রাত্যহিক যকৃত এবং পেটের ব্যাধির অবিকল বিবরণটি পেশ করছিলেন। ডাক্তারবাবুও নিয়মানুসারে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে গভীর মনঃসংযোগের মহড়া দিচ্ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর কথাই চিন্তা করছিলেন। তিন মাসের মধ্যেও প্রতিশ্রুত শাড়ীটি এতাবৎকাল পর্যন্ত তাকে উপহার দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মেজর কল্যাণসুন্দরম এ কাজেও অভ্যস্ত, গত মহাযুদ্ধে সেনাবিভাগে তিনি বেশ সুনাম করেছেন।

কিন্তু মেজর আসবার আগে সারেংহাটি ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করছিলেন ডাঃ বলাই পালচৌধুরী, আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরিদাস, বেণের দোকানের ধীরেন, পয়েন্টসম্যান জিৎনারায়ণ এবং গ্রামের অনেকেই।

হঠাৎ বিপদে পড়ে তারা প্রথমে স্তম্ভিত ও দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে সামরিক কায়দায় যেন কাজ সুরু করে দিলে। এত নিয়মানুবর্তিতা ওদের মধ্যে ছিল একথা ভাবাও শক্ত। কোথা থেকে একরাশ কম্বল, পানীয় জল, খাটিয়া, দুধ, ব্যাণ্ডেজের জন্যে ছেঁড়া কাপড়, তুলো, বিছানা, ওষুধ জড়ো হ'ল তা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে। অকৃপণ ভাবে সব দিক দিয়েই সারেংহাটি গ্রামের লোকেরা সেদিন যে সাহস এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলো, মেজর কল্যাণসুন্দরমের রিপোর্টে সেকথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ একবার তাকিয়ে দেখলে রেবার দিকে, আশ্চর্য্য এই বাঙালী নার্সটা। যুদ্ধের সময়ও বহু নার্স তিনি দেখেছেন কিন্তু একসঙ্গে এত বিপদ এবং ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সতর্ক ও স্থির মস্তিষ্কে কাজ করতে তিনি কখনও দেখেন নি।

ট্রান্সফিউসান সেট্‌টা খাটান ছিল, তার ছুঁচ একজন লোকের ডান হাতের ধমনীর ভিতর দেওয়া রয়েছে। অত প্লাজমা আছে ত? ভাবছে রেবা, শীতকালের রাতেও রেবার কপালে ঘামের বিন্দু জমে উঠেছে।

আর একটা ষ্ট্রেচার ঢুকল, ওদিকের লম্বা বেঞ্চিটায় তাকে শোয়ানো হ'ল। অন্য একজন নার্স লোকটার ডান হাতের জামাটা তুলে দিলে। নির্ভুল ভঙ্গীতে ছুঁচটা ধমনীর ভেতর ঢুকিয়ে দিলে রেবা। লোকটার গলা দিয়ে যেন একটা অস্বাভাবিক গোঙানি বেরুচ্ছে—তাকিয়ে দেখলে রেবা।

দূর থেকে মেজর কল্যাণসুন্দরম্ লক্ষ্য করলেন, রেবা যেন পড়ে যাচ্ছে। দ্রুতপদে এসে রেবার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলে।

—হোয়াটস আপ?

রেবা ঘাড় নাড়লে—না কিছু হয় নি তার!

অধ্যাপক সুরেন চৌধুরীর নাম হয় ত অনেকে জানেন না, তার কারণ সহজে তিনি লোকচক্ষুর সম্মুখে আসতে চান না। জীবন্ত মানুষকে তিনি একটু ভয় করেন যেন। তাঁদের কার্যকলাপে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য নেই। বিগত দিনের মানুষের কীর্ত্তিকলাপ এবং রীতিনীতি জানতেই তাঁর ভাল লাগে। চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি তাই করেছেন। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায়

গবেষণায় আজীবন তিনি মনঃপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন, তাঁর জীবনে অন্য কোন জিনিসের স্থান নেই, এমনকি নিজের সংসার সম্বন্ধেও তাঁর মনোযোগ নেই! এক রকম উদাসীন বলা যায়।

লীলা দেবী—মানে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। আত্মভোলা স্বামীটিকে নিয়ে দুটি মেয়ের মুখ চেয়ে সাংসারকে জোড়াতাড়া লাগিয়ে দিন যাপন করেছিলেন। লীলা দেবী বেঁচে থাকতে অধ্যাপক চৌধুরীর কোন দিকেই লক্ষ্য করতে হয়নি। হঠাৎ সেদিন মালতীর দিকে নজর পড়ল—তাঁর বড় মেয়ে মালতী। ঠিক দেখতে লীলার মত, এতটুকুও তফাৎ নেই, সেই ঘাড় ফিরিয়ে হাসির ভঙ্গীটিও যেন নকল করেছে ও। ঘন কালো কোঁচকানো চুল, লম্বা ছিপছিপে ঋজু দেহ, হ্যাঁ বেশ বড় হয়েছে, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে কিন্তু লেখাপড়ার চেয়ে সংসারের কাজ করতেই যেন বেশী ভালবাসে। এষা তাঁর ছোট মেয়ে কিন্তু ঠিক বিপরীত। তাঁর নিজের রংটা এষাই পেয়েছে, চোখ দুটো বড় বড়, লীলার মত। কিন্তু মেয়েটা যেন একটু একগুঁয়ে বলে মনে হয়। লেখাপড়ায় ভালই। সিঁড়িতে রমেনবাবুর গলা শোনা গেল। রমেনবাবু অধ্যাপক চৌধুরীর প্রতিবেশী। সুযোগ পেলেই গায়ে আলোয়ানটি জড়িয়ে তিনি এখানে আসেন। রমেনবাবুকে অধ্যাপক চৌধুরীর দস্তরমত ভয় করেন। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে তিনি যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবেন তা বলা বেশ শক্ত। শিষ্টাচার সম্ভাষণ এবং পরস্পর কুশল সংবাদাদি বিনিময়ের পর অধ্যাপক চৌধুরী আশা করেন রমেনবাবু বোধ হয় ফিরে যাবেন, কিন্তু তা কোন দিনই হয় নি। রমেনবাবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বকে যেতে পারেন। অপরপক্ষে শ্রোতা যথেষ্ট মনোযোগী কিনা সে দেখার অপেক্ষাও তিনি রাখেন না। রমেনবাবুর গলা শুনতে পেয়ে অধ্যাপক চৌধুরী একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই মালতীর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। রমেনবাবুর ত অনেক খবরই রাখেন, মালতীর বিয়ের সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখলে হয়।

—এই যে প্রফেসার চৌধুরী কেমন আছেন? ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন রমেনবাবু।

—আসুন! উত্তর দেন অধ্যাপক। স্বরে উৎসাহের লেশ নেই, তাতে কিন্তু রমেনবাবুর কিছু এসে যায় না।

—যা ঠাণ্ডা পড়েছে, শীতে যেন জমে যাচ্ছি। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন রমেনবাবু।

—হ্যাঁ তা বটে। আবহাওয়া সম্বন্ধে অধ্যাপক চৌধুরীর মতভেদ নেই।

—এই দারুণ শীত, আপনি মশাই ও পাথরটা নিয়ে কি নাড়াচাড়া করছেন?

—এটা গুপ্তযুগের প্রস্তরলিপি।

—লিপি মানে চিঠি নাকি?

—না ঠিক চিঠি নয়, তবে তখনকার দিনে ত কাগজ ছিল না তাই সবই পাথরে খোদাই করা থাকত।

আবার ঘরে ঢুকল মালতী।

—বাবা তুমি চান করবে না?

—ও হ্যাঁ করব, আমি যাচ্ছি এখুনি।

মালতী পাশের বারান্দা পেরিয়ে চলে গেল।

অধ্যাপক চৌধুরী তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, আচ্ছা রমেনবাবু!

—অ্যাঁ!

—আপনার জানা কোন ভাল ছেলে আছে?

—কেন বলুন ত?

—মালতীর বিয়ের কথা ভাবছিলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে বইকি, যেমন দেখতে শুনতে তেমনই চৌখস। মানে এই বয়সে খুব উন্নতি করেছে, গাড়ী, বাড়ী সব। আর যা খেলে না তা আর কি বলব।

—খেলে!

—হ্যাঁ ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস—ঐ যে বললাম যাকে বলে চৌখস, আমারই সম্পর্কে শ্যালক। গর্বিত ভাবে কথাটি শেষ করলেন রমেনবাবু।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সুনীলকে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। বিয়ে দেবার জন্যে সকলে ত ঝুলোঝুলি। কিন্তু বিয়ে ও করতে চায় না। রহস্যের ভঙ্গীতে বললেন রমেনবাবু।

—কেন?

—স্যার বলেন কেন? হাসলেন রমেনবাবু, বলে আগে লাখ পঁচিশ ব্যাঙ্কে আসুক তার পর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। অবশ্য আপনি যদি বলেন ত কথাটা পাড়তে পারি।

—ছেলের কে আছেন?

—বাবা নেই, মা আছেন।

—আপনি ইচ্ছে করলে খবর নিয়ে দেখতে পারেন কোন খুঁত পাবেন না, সে আমি বলতে পারি।

—না না, আপনি যখন বলছেন আর আপনার যখন আত্মীয় তখন আর বলার কি আছে?

রমেনবাবু ঠিকই বলেছিলেন সুনীল রায় খেলোয়াড় লোক। সেটা বোঝা গেল মালতীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কিছু দিন পরে। প্রথম জানতে পারে এষা। বিয়ের কিছুদিন পরেই এষা লক্ষ্য করল মালতী যেন নিভে গেছে। মুখখানি ঘিরে যে কোমলতা মালতীর নিজস্ব ছিল সেটা যেন অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবরণের উপর আর একটা নতুন আবরণ এসে পড়েছে। এষা নিজে মেয়ে সুতরাং সে জানে নতুন আবরণের মানে কি? সেটা শুধু ব্যক্তিত্বকে ঢাকা দেয় না, অন্তরের অন্তঃস্থলটা পর্যন্ত যেন একটানা পাথর দিয়ে মুড়ে ফেলে। মালতী হাসে বটে কিন্তু সেটা হাসি নয়। সজ্জা আছে ঠিক, কিন্তু মনের পটভূমিতে সে সজ্জা খুবই বেমানান বলে এষার মনে হয়েছিল। হাস্যমুখী চঞ্চল মেয়েটা হঠাৎ নিশ্চুপ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? ও হাসি ত কান্নারই রূপান্তর, ও কান্না ত ফুলশয্যাকে ভুলবারই চেষ্টা।

এষা জানে মা নেই, বাবার কোন দিকে নজর নেই, তাই তাকেই বুঝতে হবে, তাকেই ভার নিতে হবে, ভাগ নিতে হবে। তাই জোর করে একদিন কথাটা পাড়লে সে।

—তোর কি হয়েছে বল্ ত?

—কেন হবে আবার কি? মালতী যেন হতচকিত হয়ে গেল এষার প্রশ্নে।

—তোর যেন কি হয়েছে?

—বিয়ে হয়েছে, সে ত জানিসই। প্রধান ব্যবস্থাপক ত তুই-ই ছিলি।

—আমার কথার উত্তর কিন্তু এটা হ'ল না, আমাকে লুকোস নি দিদি, সব কথা খুলে বল্। এষা এগিয়ে গিয়ে মালতীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

মালতীর চোখের সামনে ঘন অন্ধকার নেমে এল, হঠাৎ শুনতে পেল, কানের কাছে একটানা ক্রমবর্ধমান গুঞ্জনধ্বনি, নিস্তব্ধ মাঠের মাঝে থেমে যাওয়া ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দের মত। তলার ঠোঁট আর চিবুক থরথর করে কেঁপে উঠল।

সমবেদনায় বাঁধের মুখ বুঝি ভেঙে গেল। বন্যার ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে মালতীকে তলিয়ে দিলে। মেয়েছেলের লজ্জার ইতিহাস সেদিন মালতী তাঁর বোন এষাকে বলেছিল। সুনীল রায়ের মুখোস খুলে গিয়েছিল, তাঁর জ্বলন্ত নির্লজ্জ স্বরূপটা সেদিন এষা দেখে চমকে উঠেছিল। মালতীর দুঃখের ভারে এষা যেন নিজেই ভেঙে পড়ল। এষার জীবনে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল কিন্তু অন্যভাবে। সঞ্জীব বোঝাবার চেষ্টা করেছিল একাধিকবার, কিন্তু এষা তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে, বিয়ে সে করবে না।

—তুমি ভুল করছ এষা, আমাদের জীবনে অন্য দৃষ্টান্তের ছাপ পড়ার কোন প্রয়োজন দেখি না। ঐ বিষয়ে আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে।

—আছে সঞ্জীব, সব দৃষ্টান্তেরই মূল্য আছে, বিশেষতঃ প্রিয়জনের।

—সুনীল রায় ত সবাই নয়। সঞ্জীবের স্বরে বিরক্তির আভাস।

—আমি কিন্তু মালতীর বোন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় এষা।

—ভালবাসার মূল্য তবে কোথায়? যেন গর্জে উঠল সঞ্জীব।

—মূল্য আছে বলেই আমি বিয়ে করব না। তুমি কোনদিন আমার গায়ে হাত তুলবে, তা আমি নিশ্চয়ই হতে দোব না। তুমি কোনদিন আমায় ফেলে অন্য মেয়েকে নিয়ে আনন্দ পেতে চেষ্টা করবে তা কি আমায় সহ্য করতে বল?

—সেকথা এখানে ওঠে কেন, তোমার-আমার মধ্যে এ প্রশ্ন আসে কেন?

—আমি তোমায় ভালবাসি সঞ্জীব, তোমার ক্ষতি আমি করতে পারি না।

—আমার ক্ষতি? তোমায় বিয়ে করলে আমার ক্ষতি হবে, বলছ কি এষা?

—ঠিক বলছি সঞ্জীব, পাবার আকুলতায় তুমি অন্ধ হয়ে গেছ।

—সে কথা ঠিক, তোমার মত ভালবাসাটা মেপে করতে শিখিনি বোধহয়। সঞ্জীবের স্বরে সুস্পষ্ট ব্যঙ্গ।

—তুমি আমায় ভুল বুঝ না সঞ্জীব, তোমাকে মিনতি করি, ভুল বুঝো না। ব্যাকুল হয়ে উঠল এষা, তোমাকে আমি পেয়ে হারাতে চাই না মালতীদির মত।

—তা হয় না এষা।

—আমি ত তোমারই সঞ্জীব। আমি তোমার জীবন, আমি তোমার সূর্য্যের আলো, শরতের স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্যের মাধুরিমা।

—ও ত কমলাকান্তের কবিতা হ'ল।

—কে কমলাকান্ত?

—মনে নেই আমাদের সঙ্গে পড়ত কমলাকান্ত সরকার। আমাদের চারণ, আমাদের ভালবাসার ছোঁয়ায় যে কবি হয়ে উঠল।

—হাঁ মনে পড়েছে। না সঞ্জীব এ কবিত্ব নয়, এ আমার জয়, মালতীদি হেরেছে কিন্তু আমি জিতব। হ্যাঁ, আমি কালই বাইরে যাচ্ছি। চাকরী পেয়েছি কিনা।

—কিন্তু এত ব্যস্ত কেন?

—নিজেকে বুঝতে চাই সঞ্জীব, তোমাকে দূর থেকে বুঝতে চাই। কাল একবার আসবে?

—কোথায়?

—স্টেশনে, ৭নং প্ল্যাটফর্মে। আর তোমার ছাদে আলসের ধারে যে মাধবীলতা হয়েছে, তা থেকে কয়েকটা ফুল আনবে।

সঞ্জীব গিয়েছিল স্টেশনে ফুল নিয়ে।

লাইনটা দেখে ইসরাইল ফিরে এল। ফিসপ্লেটগুলো ঠিক আছে, হস্তক্ষেপ করে নি কেউ। পয়েন্টসম্যানের কোন ত্রুটি হয় নি বলেই মনে হ'ল। এবার সারেংহাটি কালভার্টের অন্দর অংশগুলো ভাল করে দেখতে হবে। দুর্ঘটনার সরেজমিন তদন্তের প্রথম অংশ তার রিপোর্টের উপরই নির্ভর করবে হয় ত। আবার ইসরাইল ফিরে এল ইঞ্জিনটার কাছে। লিভার থেকে যে লম্বা লোহার পাতটা পিষ্টন বক্সের সঙ্গে লাগান আছে, তাকে বিডল রড বলে। বিডল রডটা একটু বেঁকে গেছে বলে মনে হ'ল। খুলে যায় নি বটে তবে অকেজো হয়েছে নিশ্চয়ই।

আসগরের কাজ পুরোদমই চলেছে। ক্রেনে করে বগীর বিভিন্ন অংশ গুলি সরানো হচ্ছে। পার্টিশনের কাঠগুলো এবং ধ্বংসাবশেষ জড়ো করা হয়েছে খালের ওধারে, যেখানে নলখাগড়ার বন, তারই পাশে। আস-

গরের হঠাৎ নজর পড়ল একটা ভাঙা পার্টিশনের উপর, সেটা এখনও বিচ্ছিন্ন করা হয়নি, হুকে যেন একটা কি ঝুলছে, ভাল করে নজর করে দেখলে আসগর, একটা সবুজ রঙের লেডিজ কোট। হুঁঃ, লেডিজ কোট, ফুলদার রঙীন লেডিজ কোট, চিৎকার করে উঠল আসগর—আরিয়া। আবার জীবনরাম বোকার মত হাঁ করে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। থর থর করে আওয়াজ হ'ল ক্রেনের, রাত্রিজাগরণের পর কোন বৃদ্ধ যেন ধরা গলায় ক্রমাগত কেসে যাচ্ছে। পার্টিশনের সঙ্গে সবুজ রঙের লেডিজ কোটটা হুকে দুলতে দুলতে অপর পাশে গিয়ে পড়ল।

হাসনুর সবুজ রং ভাল লাগে তাই সুনীল তাকে এই কোটটা কিনে দিয়েছিল, সুনীল রায়ের সঙ্গে হাসনুর সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। দেশাই ফিল্মসের ডাইরেক্টার ধীরেন ভড় হাসনুর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তবে এ যোগাযোগের একটা উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকের সঙ্গে সুনীল রায় সহজেই জমিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিজেই জমে গেল। সুরমা-আঁকা চোখের নেশায় সুনীল যেন পাগল হয়েছিল। হাসনুর—মানে ফিল্মের শ্রীলেখা সত্যিই সুন্দরী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একটা ফিল্মষ্টারের আজ্ঞাবহ হ'ল নাকি, সুনীল রায় একথা কয়েকবারই ভেবেছে কিন্তু জীবনটা ভালভাবে উপভোগ করতে হবে বৈকি? আর মালতী? সে ত তার স্ত্রী, সে ত আছেই—তার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার কি?

পার্কসার্কাসের একটা ফ্লাটে হাসনু থাকে। ফিল্ম ডাইরেক্টর ধীরেন ভড়ের সঙ্গে সুনীল একদিন ওর ফ্লাটে গিয়েছিল। সুনীলের সঙ্গে ধীরেন ভড়ের অনেক দিনের আলাপ. বয়সের পার্থক্য থাকলেও সম্পর্কটা প্রায় পুরনো বন্ধুত্বের। সিনেমা লাইনে ধীরেন ভড অনেক মেয়ের নাগাল পেয়েছে সুনীল রায়ের সাহায্যে। সুনীল রায়ের চেহারার খ্যাতি আছে। মাঝারি ধরনের উচ্চতা, মুখে গ্রীসীয় ভঙ্গীর সুস্পষ্ট ছাপ, সুঁচালো সতেজ চিবুক, তীক্ষ্ম নাক, মাথার চুল অল্প কোঁচকানো এবং ব্যাকব্রাশ করা। গৌরবর্ণ মুখে লালচে আভাস—কোথায় যেন একটা শিশুসুলভ কোমলতা লুকানো আছে ওর মুখে। দরকার হলে ধীরেন ভড় সুনীলকে টোপ করে, ছোকরার চেহারা যেমন, চালচলনও তেমনি। সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে ধীরেন ভড়ের

ডালহৌসি স্কোয়ারের আপিসে সুনীল রায় উপস্থিত হ'ল। সুনীলের পরণে কালো আচকান, চোস্ত পাজামা, হীরের বড় বড় বোতাম এবং আংটি। সজ্জাটা চমকপ্রদ বলা যায়, অবাক হয়ে ধীরেন ভড় সুনীল রায়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল।

—কি দেখছ কি? আত্মপ্রশংসা শুনবার জন্য ব্যগ্র হয় সুনীল রায়।

—আঃ, যা সেজেছ না, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে হাসনুর।

—তা হলে চল, আর দেরী কেন?

—হ্যাঁ চল, কিন্তু একটা কথা।

—বল।

—অপর পক্ষও কম নয়, হাসনুর গান বা নাচের বোধ হয় স্বাদ পাওনি, আর শুধু গান-নাচ কেন বাবা, পরে ত···কালচে দাঁত বার করে ধীরেন ভড় অট্টহাস্য করল।

গাড়ী চৌরঙ্গী হয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এল। —হাঁ, আর একটা কথা। বললে ধীরেন ভড়।

—কি?

—কল্পনার মত অত খরচ করতে পারব না।

—কেন? লোকসান হয়েছিল নাকি তোমার?

—না ইয়ে, তা অবশ্য হয় নি। ধীরেন ভড় আমতা আমতা করলে।

—এসব ব্যাপারে একটু খরচ করতে হয়। মনে করিয়ে দিলে সুনীল রায়।

—হ্যাঁ, তা কি আর জানি না, অত কষ্ট করে যোগাড় করলাম আমি আর শেষ পর্যন্ত দেখ···

—দখল পেলে নান্নুভাই দেশাই। কথাটা শেষ করলে সুনীল রায়।

—বল ভাই, দুঃখ হয় কিনা বল?

—তা হয়। সিগারেট ধরালে সুনীল রায়।

—আর একটা কথা।

—বল।

—ঝট্ করে বিয়ে করলে কেন ব্রাদার?

মুহূর্ত সুনীল রায় সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটার দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তার পর বললে—জীবনে স্থৈর্য চাই ধীরেন, প্রতিষ্ঠার জন্যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে টাকা চাই আর সঙ্গে একটি স্ত্রী।

—এবং শাঁসাল শ্বশুর, এঁ্যা কি বল? নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হ'ল ধীরেন ভড়।

গাড়ী পার্ক সার্কাসের একটা ম্যানসনের মধ্যে ঢুকল।

সুনীল রায় কিন্তু হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেললে। হাসনুর সুরমা-আঁকা দীঘল নেশায় বেসামাল হয়ে গেল। এতদিনের লোভনীয় টোপটা অকস্মাৎ অকেজো হয়ে গেল। অনায়াসে টোপটাকে গলাধঃকরণ করে নিলে হাসনু বানু। ধীরেন ভড়ও দস্তুরমত ঘাবড়ে গেল। এ কি কাণ্ড! কণ্ট্রাক্ট সই হ'ল বটে, কিন্তু হাসনুও তো নতুন খেলা পেয়ে মেতে গেল। স্যুটিংয়ে যায় না, টেলিফোনে পাওয়া যায় না, ধীরেন ভড যেন হাঁপিয়ে উঠল। দু'মাস হয়ে গেছে অথচ একটা স্যুটিংও সম্ভব হয়নি। কর্তাকে আজে-বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে আর ত ঠেকান যাবে বলে মনে হচ্ছে না। নানুভাই দেশাই পাকা ঝানুলোক। দেশাই ফিল্ম কোম্পানীর পয়সা নিশ্চয়ই খোলাম-কুচি নয়। সেদিন আর রোখা গেল না, নানুভাই বোমার মত ফেটে পড়ল।

—কেন এত দেরী হচ্ছে, ঠিক করে বল। হুঙ্কার দিল নানুভাই।

—প্রেমে পড়েছে সার। ভয়ে ভয়ে বললে ধীরেন ভড়।

—কে? আবার হুঙ্কার।

—সুনীল রায়কে পাঠিয়েছিলাম হাসনুকে আনবার জন্যে, কিন্তু একেবারে জমে গেছে।

—তুমি একটা বুদ্ধু আছ।

—ধীরেন ভড় কেশবিরল মাথা চুলকাতে সুরু করলে।

—আউটডোর সিন ক'টা আছে? প্রশ্ন করলে নানুভাই।

—পাঁচটা।

—ঠিক আছে, পাহাড়ে জায়গা চাই ত?

—হাঁ।

—তা হলে নিয়ে যেতে হবে ওদের। বলে দাও, ওদের জন্যে আলাদা বাংলো দোব, অন্য সব ব্যবস্থাই থাকবে, যত তাড়াতাড়ি পার ব্যবস্থা করে ফেল, আর শোন, গাড়ী রিজার্ভেশনের কথাটা ভুলো না।

—কিন্তু আগের স্যুটিংগুলো। বোকার মত প্রশ্ন করে বিপদে পড়ল ধীরেন ভড়।

—চোপরাও। চীৎকার করে উঠল নান্নুভাই দেশাই, আগের স্যুটিং হবে কি করে, ওদের বাইরে বার করতে না পারলে ?

—তা ঠিক, আচ্ছা আমি তাই ব্যবস্থা করছি। পালাতে পারলে বাঁচে ধীরেন ভড়।

সুনীল রায়কে খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হ'ল ধীরেন ভড়ের, কারণ সুনীল রায় নিজেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। নানাদিক দিয়ে অবাঞ্ছিত বিপদ এসে গেছে। একটার পর একটা যেন মিছিল করে পরামর্শ করে জড়ো হয়েছে তার পাশে। হ্যাঁ, টাকা তার চাই, প্রচুর টাকা, তা না হলে হাসনুর কাছে মান থাকে না। হাসনু ভাববে সে বিত্তহীন। তা হলে ত মূল্যহীন হয়ে যেতে হবে তার কাছে। মালতীর কথা অবশ্য ভাববার মত নয়, তার দাবীও কিছুই নেই বললেই হয়, উপরন্তু সম্প্রতি তাকে যেন মালতী এড়িয়ে চলে, ভালই। তবে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল টাকা, ধীরেন ভড়ের কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে বলে ত মনে হয় না।

সুনীল রায় বসে আছে ঘরে, একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা এসে জড়ো হয়েছে। হঠাৎ যে এত টাকার টানাটানি হবে, একথা সে ভেবে দেখে নি। মালতীর কাছে বোধ হয় কিছু টাকা আছে, শ্বশুরমশাইয়েরও অর্থাভাব বলে ত মনে হয় না।

মালতী ঢুকল ঘরে, অনেকদিন পরে সুনীলকে দেখলে যেন, তীব্র বেদনার মধ্যেও মনটা দুলে উঠল তার।

—এই যে মালতী। কথাটা সুরু করল সুনীল, কোথায় ছিলে ?

ভঙ্গিতে মনে হ'ল, মালতী যেন তার কাছে দুষ্প্রাপ্য।

—এখানেই। কেন ? মালতীর স্বরে কৌতূহল।

তোমাকেই খুঁজছিলাম, বিশেষ দরকার, তুমি একবার বালিগঞ্জে দেখা করতে যাবে ?

—কেন, বাবার সঙ্গে কি দরকার ! মালতী বুঝতে পারে না সুনীলের মনের কথা।

—কিছু টাকার দরকার, বাবার কাছ থেকে যদি···

—না। দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয় মালতী, ও তাই তাঁর খোঁজ পড়েছিল। কানের পাশে কে যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে, রক্তবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ।

—একটা নতুন ব্যবসা সুরু করেছি। উৎসাহের সঙ্গে সুনীল বললে।

—ব্যবসাটা নতুন নয়, অনেক দিনের পুরানো। বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় মালতী।

—তার মানে? ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল সুনীল রায়ের।

—তার মানে, তোমাকে এবং তোমার ব্যবসাকে আমি ভালভাবেই চিনি। স্পষ্টভাবে এবং ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করে মালতী।

—তোমার কথাটা খুব স্পষ্ট হ'ল না মালতী।

—না হোক, কথাটা বুঝতে তোমার পক্ষে দেরী হওয়া উচিত নয়, আর না জানার ভাণ করলেও বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

—তুমি হয় ত আমার বিরুদ্ধে একটা মনগড়া অভিযোগ খাড়া করেছ মালতী, হয় ত কানে তোমার কেউ বাজে কথা ঢুকিয়েছে, লোকের কথায় কান দিলে অনেক দুঃখ পাবে।

একটা সিগারেট ধরালে সুনীল, অগ্নিসংযোগ করার সময় সুনীলের হাতটা একটু কেঁপে উঠল। লক্ষ্য করেছে সুনীল আজকাল প্রায়ই এটা হয়। ইচ্ছাশক্তির উপর ওটা নির্ভর করে না। যখন হাতটা কাঁপে তখন সেটা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারে কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কাঁপুনিটা বন্ধ করা যায় না, আঙুলের মাংসপেশীগুলো যেন আর ইচ্ছাধীন থাকে না।

—কোন কিছুতেই দুঃখ পাব না আমি। মুখ ফিরিয়ে বলল মালতী, তুমি যদি ভেবে থাক আমার ওপর চাপ দিয়ে বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে তা ভুল করছ। নিজেকে পুরুষ ভেবে যদি আমার দুর্বলতার সুযোগ নেবার চেষ্টা কর তা হলেও ভুল করবে।

—না, তুমি দুর্বল হবে কেন, বাবার টাকা রয়েছে, তা ছাড়া নিজেও সুন্দরী! ব্যঙ্গ করল সুনীল।

—হ্যাঁ, সেটাও একটা মনের জোরের কারণ বইকি। মালতী উত্তর দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুনীল উঠে পড়ল, মিথ্যা তর্কে লাভ নেই, অন্য ব্যবস্থা করে নিতে

হবে। কাপড়-জামাগুলো বদলে নিলো স্থনীল, ধোপত্নরস্ত স্থ্যট আর ম্যাচ-করা টাই পরলে। টাকা সে যোগাড় করে নেবে, কোনদিন তার কিছু অভাব হয় নি, শুধু একটু কষ্ট করে জোগাড় করে নেওয়ার অপেক্ষা। মালতী তার রূপের গর্ব আর বাবার টাকা নিয়ে বসে থাকুক, তাতে তার আপত্তি নেই।

রাস্তায় নেমে নৃপেনের কথা মনে পড়ল, একবার দেখলে হয় চেষ্টা করে। নৃপেন উত্তরাধিকারস্থত্রে বেশ কিছু পেয়েছে, তা ছাড়া নিজে ডাক্তারীতে পশার জমিয়েছে।

স্থনীল যখন ডাক্তার নৃপেন মুখার্জির বাড়ী পৌছল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

—এস কন্দর্পকুমার! অভ্যর্থনা করলে নৃপেন—হঠাৎ কি ব্যাপার?

—দরকার না হলে কি ডাক্তারের বাড়ী লোক আসে? উত্তর দিলে স্থনীল।

—হ'ল কি বলত? মুখে রেখা পড়েছে, না তু'একটা চুল পাকল বলে ভয় পেলে?

—না। হাসল স্থনীল—নার্ভের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

—ও ত একটু হবেই, ড্রিঙ্কটা একটু কমাও। প্রকৃতির প্রতিশোধের জন্যে এখন অনুযোগ করলে ত চলবে না। সে কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। আর তাকে যখন সম্মান দাও নি তখন সে ছাড়বে কেন? ডাক্তারী ভঙ্গিতে বললে নৃপেন—কিন্তু শুধু এই জন্যেই আমার কাছে এসেছ? আরও কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে।

—হাঁ, কিছু টাকারও দরকার।

—সে ত সকলেরই দরকার।

—তা ঠিক, কিন্তু আমার বিশেষ দরকার।

—তোমার বিশেষ দরকারটি কি, তা অনুমান করা শক্ত নয়, যাই হোক ওটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়।

—বলতে আর বাকি রাখলে কি?

—ডাক্তারের বিশেষ অধিকারের মধ্যে বিনামূল্যে উপদেশ বিতরণ করাটা একটা—

—উপদেশ দিও, তার আগে ডুবন্ত লোকটাকে জল থেকে তোল।

—ডুবন্ত লোকটির দেহের সঙ্গে একটি বিশ মণ পাথর বাঁধা রয়েছে, তুলতে গেলে আমি শুদ্ধ তলিয়ে যেতে পারি। আর তা ছাড়া দেবার মত অবশিষ্ট কিছুই নেই।

—সে কি, তুমি তো প্রচুর টাকার মালিক শুনেছি।

—ভুল শুনেছ। বাবার কিছু টাকা পেয়েছি বটে, তবে তা থেকে অধিকাংশ টাকাই খরচ করেছি। হাসপাতালে কিছু দিয়ে পুণ্যলাভ করলাম, একটা দেশী গাছ-গাছড়ার ওষুধের কারখানা খুলেও বেশ কিছু লোকসান দিয়েছি। সম্প্রতি পোলট্রি করে নতুন জাতের হাঁস এবং মুরগী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা গেল। আর তা ছাড়া টাকা থাকলেও তোমাকে আমি দিতাম না।

—কেন ?

—অসুখ যাতে না হয় তার জন্যে আমরা টিকা দিই জান ত ?

—হাঁ, তা জানি।

—সুতরাং ডাক্তার হয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। টাকাটা তুমি যে ভাবে খরচ করবে তাতে রোগ হওয়া খুব স্বাভাবিক।

—আমার ধারণা ছিল ডাক্তারেরা ব্যবসায়ী হিসাবে বুদ্ধিমান, কিন্তু এখন ত অন্য রকম মনে হচ্ছে, অবশ্য ব্যবসার খাতিরে জ্ঞানমার্গের কথার অবতারণা যদি করে থাক তা হলে অন্য কথা।

হেসে উঠলো নৃপেন। সুনীল রায় ঠিক তেমনি আছে। মেডিকেল কলেজে একসঙ্গে দু'জনে ভর্তি হয়েছিল। কোনক্রমে প্রথম ধাপটা উত্তীর্ণ হয়েছিল বটে তারপর জগন্নাথের রথের মত নিশ্চল হয়ে পড়ল সুনীল। অবশ্য কারণ ছিল বৈকি। ডাক্তারী পড়তে গেলে মন এবং দেহকে যেভাবে তৈরি করতে হয় সেদিকে সুনীল নজরই দিলে না, সুতরাং নিষ্কৃতি পেয়ে যেন সে বেঁচে গেল।

পরেশ ঘরের ভিতর ঢুকল। নৃপেনের ছোট ভাই, কিছু দিন হ'ল ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে। রুক্ষ চুল, কালো ফ্রেমের চশমা, ছিপছিপে লম্বা চেহারা, ঘরে ঢুকেই তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য না করেই সুরু করল পরেশ, দাদা আমায় বাইরে যেতে হবে।

—সদর দরজা ত খোলাই, বাইরে যাবার জন্তে এর আগে কোনদিনই অনুমতি নিতে হয়েছে বলে ত মনে পড়ে না।

না, কলকাতার বাইরে যেতে হবে।

ও তাই বল, হঠাৎ ?

না, হঠাৎ নয়, পার্টির কাজে।

হ্যাঁ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার বন্ধু সুনীল রায়—এ আমার ভাই পরেশ। পরস্পর নমস্কার বিনিময় করলে ওরা।

সম্পর্কের কথা বলে অন্যায় করি নি ত ? পরেশের দিকে তাকিয়ে রইল নৃপেন।

কেন, অন্যায় কিসের ?

তোমরা ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের দাম দাও না।

না, ওকথা ভুল।

কেন, তোমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান আদর্শ রাজনৈতিক। অন্য কোন আদর্শ সেখানে ঠাঁই পাই না এ কথা ঠিক নয় ?

আংশিক ভাবে বলা যায়।

তোমাদের রাজনৈতিক ছকে ফেলে তোমরা বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য এমন কি মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ে নিয়েছ, বোধ হয় নিজেদের 'থিওরি' মেলাবার জন্যে ?

কিন্তু আমাদের 'থিওরী' ভুল প্রমাণ করে নি কেউ।

থিওরী কোন দিন ভুল হয় না, তোমার মত ব্যাধিগ্রস্ত মনই তাকে আঁকড়ে ধরে জীবনের বহু মূল্যবান সম্পর্কগুলো অব্যবহার্য করে দেয়।

ওকথা তোমরা চিরকালই বলেছ দাদা, মানুষকে শোষণ করবার জন্যে মজদুরের পরিশ্রমকে হাতিয়ার করে তাদেরই শেষ করেছ। কখনও ধর্মের আফিং খাইয়ে, কখনও ছিটে-ফোঁটা দিয়ে ক্ষুধা বাড়িয়ে মজা উপভোগ করেছ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য কখনও অস্বীকার করা যায় না। শ্রেণীযুদ্ধে যারা এতদিন হেরে এসেছে সেই শ্রমিক এখন ধনিকদের হারাবে।

বাঃ, বেশ বলেছ পরেশ, তা হলে বৈজ্ঞানিক সত্য হ'ল শ্রেণীযুদ্ধ এবং তোমাদের মতে মোটামুটি দুটি দল শ্রমিক ও ধনিক, কেমন ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আমার মতেও দু'দল—রুগী এবং ডাক্তার। বল্লালসেনের আমলে অবশ্য দল আরও বেশী ছিল—পূজারী, ব্যবসায়ী, ছুতোর, কুমোর ইত্যাদি। আবার

দেখ, বিশ্বপ্রেমিকরা বলেছেন মানুষ একজাতি। সুতরাং নিজের মত এবং ইচ্ছানুযায়ী যে কেউ মানবজাতিকে ভাগ করতে পারে, আপত্তি কি? আর বৈজ্ঞানিক সত্য? যে কোন থিওরীর পিছনে এই একটা ছোট কথা যোগ করে দিলেই কি জিনিসটার সত্যতা প্রমাণিত হ'ল?

না, তা নয়, তবে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সত্য প্রমাণিত হয় নি, মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবধারাকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক ছাঁচে ও দার্শনিক ছিটেফোঁটায় এক অদ্ভুত খিচুড়ির সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমার মত গোঁড়া এবং অন্ধরা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য তৈরী করতে গিয়ে আরও জঘন্য স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা করেছে, আরও উগ্র একদল শাসকশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মত তারা উন্মত্ত হয়ে লণ্ডভণ্ড করে চলেছে, আর তোমরা দূর থেকে দেখে বাহবা দিচ্ছ। ভুল স্বীকার করবার মত সৎসাহস তোমাদের নেই।

তুমি যে ইঙ্গিতটা করলে তা আমি বুঝতে পেরেছি দাদা, তবে দেশ শাসন করতে গেলে ও রকম একটু রক্তপাত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অনেক জায়গায় তা হয়েছে।

তোমার মুখে শাসন কথাটা বড় বেমানান লাগছে পরেশ। অনেক জায়গায় রক্তপাত হয়েছে তা স্বীকার করি। তুমি হয় ত বলবে রাজনৈতিক কারণে সেটার প্রয়োজন আছে, আমি তা মানি না। মানুষের উপর মানুষের শ্রদ্ধা রাজনৈতিক মতবাদ দিয়ে মুছে ফেলা যায় না। মানুষকে মনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলেছে বটে, তবে তাতে সাফল্য লাভ করতে তোমরা পারবে না।

আমি তোমার কথায় আপত্তি করি দাদা। শ্রদ্ধা হারায় নি বরং তাঁদের আত্মসম্মান ফিরে এসেছে, নিপীড়িত নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর একটা বিশেষ অংশ ফিরে পেয়েছে আত্মচেতনা ও মর্যাদা।

তাই গলা দিয়ে কারো বেসুরো ধ্বনি উচ্চারিত হলে সে ধ্বনি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়? আত্মসম্মান ও মর্যাদার ঐখানেই ইতি নাকি? না না পরেশ, ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী আদর্শকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করা বাতুলতা নয় শুধু, অন্যায়, পাপ।

তোমরা দাদা, এতদিন পাপ আর পুণ্য নিয়েই রাজত্ব করে এলে।

আমার ভারতীয় ঐতিহ্য আমার থাক পরেশ, তার উদারতা বুঝবার মত

ক্ষমতা তোমার আছে কিনা জানি না তবে এইটুকু জেনে রেখ আমাদের মন্ত্রে আছে :

মধুবাতা ঋতায়তে
মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী
মধুনক্তম্ উতোষসঃ
মধুমৎ পার্থিবং ব্রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতিঃ
মধুমান অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ

তর্পণের সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আমরা শুধু পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই না, মানবজাতি, জীবজন্তু এমন কি লতাগুল্মকেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। তার নাগাল পাওয়া তোমার পক্ষে শক্ত।

সুনীল অস্থির হয়ে পড়েছিল। ভাইদের রাজনৈতিক মতবিরোধের বিষয়ে তার খুব ঔৎসুক্য ছিল না। সুনীল উঠে দাঁড়াল।

নৃপেন ব্যস্ত হয়ে বললে, বস, বস সুনীল, এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

না, এবারে একটু যেতে হবে।

যাবে, এত ব্যস্ত কেন ? হ্যাঁ পরেশ, তুমি যেও তবে একটা কাজ করতে হবে, মাসীমাকে তোমায় নিয়ে যেতে হবে।

মাসীমা কোথায় যাবেন ?

তীর্থ করতে, আপত্তি আছে নাকি ? নৃপেন পরেশের দিকে তাকিয়ে রইল ?

না, নিয়ে যাব। পরেশ মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দাদার সঙ্গে তর্কের তার শেষ নেই। দাদাকে কোন জিনিস বোঝান শক্ত, পরেশ সে চেষ্টা করেও নি। তবে তর্ক করতে কেউই কম নয়। জিনিসটা বিরক্তিকর নয়, বরং লোভনীয়। পরিণতি নেই বটে, তবে উত্তেজনা আছে। নৃপেন তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত পরেশের যাবার পথে, তারপর হেসে সুনীলকে বললে, ভাবছি ছোকরার এর পরে উগ্রতাটা এই রকমই থাকবে কিনা ?

কেন ?

বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

সেকি, এত অল্প বয়সে ?

মাসীমার ইচ্ছে, আর তা ছাড়া "সফট ভালভ" হিসেবে একটি সুন্দরী বউ ছোকরার পক্ষে ভালই হবে। ভাবী শ্বশুরও খুব জাঁদরেল। মাথার উপর একজন জোরাল লোকের দরকার।

কে বলত ?

ব্রজেশ্বর ব্যানার্জী। পুলিসে কাজ করেন বটে কিন্তু ভারী আমুদে লোক। তা ছাড়া মেয়েটিও সুন্দরী।

সুনীল নৃপেনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অতটা সময় বৃথাই নষ্ট হ'ল তার।

নাঃ, আর দেরী করা চলে না। রাস্তায় নেমে সুনীল মনে মনে সব ঠিক করে নিলে। হ্যাঁ টাকা আছে, তবে উপায়টা সহজ নয়, তা হোক, জোগাড় তাকে করতেই হবে। না হলে হাসনু—

টাকা সুনীল রায় পেয়েছিল—প্রচুর টাকা।

ব্রজেশ্বর ব্যানার্জিও পুলিস থেকে সেই টাকার অন্তর্ধান সম্বন্ধেই খোঁজ করার ভার পেয়েছিলেন। কলকাতার নামজাদা একটা সার্কিট আপিস থেকে মোটা অঙ্কের একটা টাকা রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিল।

ব্রজেশ্বরবাবু কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন—কেন বাপু, এই ত সেদিন কাঁকুড়গাছির কেস সবেমাত্র শেষ হয়েছে, তাঁর কি একটু বিশ্রামের প্রয়োজনও নেই ?

বউবাজারের বাসায় তিনি মোটা কালো থলথলে দেহটায় তৈলমর্দন করছিলেন। মাথায় চুলের লেশ নেই, বিরাট টাক। বাঁ হাতের তালু দিয়ে তিনি সজোরে মাথাটা ঘষছিলেন, কখনও সোজা ভাবে, কখনও বৃত্তাকারে, কখনও বা তেরছা, তির্যক ভাবে। কবে যেন কোন্ মাসিক পত্রিকায় পড়েছিলেন মাথায় রক্তচলাচল ভাল হলে চুল হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত। বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত তেইশ বছর ধরে অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিধিটি তিনি পালন করে এসেছেন, অবশ্য শেষের দিকে উদ্দেশ্যের কথাটা আর স্মরণ নেই, অভ্যাসটা

কিন্তু থেকে গেছে। কাঁসার বাটিতে রক্ষিত তেল বাঁ হাতের অনামিকা দিয়ে নাসিকা-গহ্বরে চালান করে সজোরে নিশ্বাসের সঙ্গে তেলটুকু আত্মসাৎ করে নিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

তেল সম্বন্ধে তাঁর রীতিমত দুর্বলতা আছে। জিনিসটির কার্যকারিতায় তিনি শুধু বিস্মিত নন, মুগ্ধও বলা চলে। ব্যবহারিক জীবন থেকে সুরু করে চাকরী জীবন পর্যন্ত পদে পদে এটার দরকার। এমন অদ্ভুত গুণের যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না। একযোগে খাদ্য ও ওষুধি, একসঙ্গে তীব্রতা ও মসৃণতা, লঘুতে সুপাচ্য, গুরুতে দুষ্পাচ্য আর সঙ্গী হিসাবে ত অপরিহার্য। চলৎশক্তির, তা যন্ত্রেরই হোক আর ব্যবসা, চাকুরী বা রাজনীতি ক্ষেত্রেই হোক একে পরম বন্ধুস্থানীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। পথ সুগম করে চিক্কণ কোমলতা এনে দেয়, মন্থরতা অদৃশ্য হয়ে আসে নিরঙ্কুশ গতিবেগ, মোলায়েম নির্ভরতা।

ব্রজেশ্বরবাবুর চোখে জল এসে গেল। তৈলস্তরের গুণগরিমায় নয়, তেলটার বেশ ঝাঁজ আছে, জবর রকম ঝাঁজ, এইটাই ত নিগূঢ় আনন্দ, পরম উপভোগ্য।

কলঙ্ক-ধরা তেলের বাটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, তারপর পায়ের নখগুলোতে নিপুণতার সঙ্গে সমানভাবে তেল লাগালেন, নিখুঁত শিল্পীর ভঙ্গীতে তাঁর মোটা আঙুলটাকে সূক্ষ্ম তুলি বলে ভুল করা বাইরের লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়। পায়ের নখে তেল দিলে যে চোখের জ্যোতি বাড়ে একথা তিনি জানেন। পাশ থেকে একটি পালক তুলে নিয়ে তৈলসিক্ত করে কানে দিলেন, তারপর পালকটা দুটি আঙুলের সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলেন, আরামে চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এল ব্রজেশ্বরবাবুর। "কানে কাঠি নাকে তেল, মধ্যে মধ্যে খাবে বেল"—বলতেন ভূপতি মাষ্টার। ছেলেবেলায় আরামবাগে থাকবার সময় ভূপতি মাষ্টার পড়াতেন ব্রজেশ্বরবাবুকে। ভূপতি মাষ্টার আজ বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন, তাঁর সেই শীর্ণকায় অবাধ্য ছাত্রটি তাঁর উপদেশ অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে কি পরিমাণে লুপ্ত স্বাস্থ্য উদ্ধার করেছেন।

বাবা!

কি রে বুড়ি?

ব্রজেশ্বরবাবুর মেয়ে কল্যাণী, শাড়ীটা কোমরে জড়ানো, বেশ লম্বা, কপালের কাছে একটা কাটা দাগ, ঠিক ভ্রূ দুটোর মাঝখানে। স্কুলের মেয়েরা তাকে ত্রিনয়নী বলত সেই জন্য। রংটা বেশ ফর্সা, ঘন কুঁচকানো লম্বা চুল। কল্যাণীকে ব্রজেশ্বরবাবু বুড়ী বলে ডাকেন।

এবারে ওঠ। বললে কল্যাণী।

এই উঠি আর কি !

না এখুনি ওঠ, মা রাগ করছে।

একটু আরাম করে তেলও মাখতে দিবি না ?

দেড় ঘণ্টা ত হ'ল, ওদিকে রান্না সব কমপ্লিট।

প্রায় মেয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন স্বরমা দেবী শাড়ীতে হাত মুছতে মুছতে, কি গো, হ'ল ?

হ্যাঁ, এই যে যাই। মা মেয়ে একসঙ্গে তাগাদা স্বরু করেছ আর কি রক্ষে আছে, একটু আরাম করে যে তেল মাখব তারও উপায় নেই।

রান্না হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে !

কি রান্না করলে ?

যা হুকুম হয়েছে তাই।

আহা বলই না ছাই, শুনি।

শুক্তো, কুমড়োফুল ভাজা, মুগের ডাল, আলু ভাতে, মাছের ঝোল আর চাটনী।

আর পেঁপে ছেঁচকি ? সেটা ভুলে গেছ ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। পেঁপে ছেঁচকিও করেছি—নাও, ওঠ দিকি নি।

এই উঠি। আর দু'খানা অমনি পাঁপড় ভাজলে না কেন ?

বেশ খেতে বস, গরম গরম ভেজে দেব'খন।

ভাজতে ভাজতে আবার চাখতে স্বরু করো না যেন। একটু রসিকতা করলেন ব্রজেশ্বরবাবু। কল্যাণী একটু হেসে চলে গেল।

কি আক্কেল বল ত ? অত বড় মেয়ে, তার সামনে এই রকম ঠাট্টা করতে একটু লজ্জা করে না ? কিন্তু তাঁর গলার স্বরে রাগের আভাস থাকলেও ভাল লাগার ইঙ্গিতই অধিক পরিস্ফুট। তারপর একটু চাপা গলায় বললেন, হ্যাঁ গা, ওখানে গেছলে ?

হ্যাঁ।

কি বললে ?

ডাঃ নৃপেন মুখার্জী মানে পাত্রের দাদার মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছে।

ছেলে দেখে এসেছ ত ?

না। আমতা আমতা করেন ব্রজেশ্বরবাবু।

কেন ? কোন কাজ যদি তোমার দ্বার হয়। বিরক্ত হয়ে বললেন স্বরমা দেবী।

কি করব বল, এদিকে আবার এক ঝামেলা।

কি আবার ?

ঘাড়ে আর একটা কেস চাপিয়েছেন সেনসাহেব। টাকা চুরির ব্যাপার।

তুমি বললে না কেন যে এখন তোমার সময় নেই।

তা বললে শুনছে কে ? এর নাম হ'ল চাকরী। তা যাই হোক, খোঁজ অবশ্য সবই পেয়েছি, দু' একদিনের মধ্যেই মিটে যাবে বলে মনে হয়। খবরটা একটু পরেই বাসদেও নিয়ে আসবে হয় ত।

যাও, চান করে নাও। বললেন স্বরমা দেবী।

সুবোধ বালকের মত ব্রজেশ্বরবাবু স্নানের ঘরে ঢুকলেন। পরিপাটি করে স্নান করলেন, তারপর আহার সেরে পানের ডিবেটি নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। কিন্তু বসতে না বসতে বাসদেও একটা মস্ত স্যালুট করে এসে দাঁড়াল। ব্রজেশ্বরবাবু তার মুখের দিকে তাকালেন।

হুজুর, পাত্তা মিল গিয়া। বাসদেও বললে।

যাক বাঁচা গেল।

লেকিন হুজুর···

আবার কি ?

আজ ভাগে গা।

এই মরেছে, কোথায় ?

সাত নম্বর প্লাটফরম—ট্রেনসে কাঁহী যায়গা।

কথাটা শুনে ব্রজেশ্বরবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই শীতের রাতে একটা জুয়াচোরের পিছনে পিছনে পাড়ি দিতে হবে নাকি ? কিন্তু উপায় কি, কথায় বলে চাকরী !

ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি এখুনি হেড আপিসে যাচ্ছি।

বাসদেও স্যালুট করে চলে গেল।

সুরমা যখন ঘরে ঢুকলেন, ব্রজেশ্বরবাবু তখন জামা কাপড় প্রায় পরে ফেলেছেন।

অবেলায় আবার কোথায় বেরুচ্ছ ?

হুঁ, চাকরীর আবার বেলা আর অবেলা। ব্রজেশ্বরবাবুর কথাটা অনেকটা কান্নার মত শোনাল। একটা জোচ্চরের পিছনে এখন ধাওয়া করে মরি !

কোথায় ?

রিপোর্ট পেলাম ত ট্রেনে করে বাইরে যাচ্ছেন।

সে কি, তোমাকেও যেতে হবে নাকি ?

তা হয় ত হবে।

তা হলে কল্যাণীর বিয়ের কি হবে।

ফিরে আসি, তার পর।

ক'দিন লাগবে ?

বামালসুদ্ধ ধরা পড়লে দু' একদিনেই ফিরতে পারব।

আমি এদিকে বিকেলের জন্য একগাদা কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর দম করে রেখেছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তা হলে এক কাজ কর না···

কি ?

টিফিন কেরিয়ারে দিয়ে দাও, ট্রেন ধীরে সুস্থে খাওয়া যাবে'খন।

ব্রজেশ্বরবাবু যখন ৭নং প্লাটফরমে এসে পৌছালেন তখন ট্রেন ছাড়তে আর বেশী দেরী নেই, পিছনের দিকের কোন কামরায় জায়গা নেই, সুতরাং এগিয়ে চললেন তিনি। মেদবহুল দেহটা যতদূর সম্ভব দ্রুত চালান যায় তার চেষ্টা করলেন। সুটকেস, বেডিং আর টিফিন কেরিয়ারটা সযত্নে বেঞ্চির তলায় রেখে দিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু প্লাটফরমে নামলেন। অদূরে বাসদেও দাঁড়িয়ে, সেও সঙ্গে যাচ্ছে। ট্রেনের পিছনের দিকে বিজয়সিংহ জায়গা পেয়েছে। দেহরক্ষী

হিসাবে ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেই সে থাকে। কালো লম্বা, অনেকটা কুস্তিগীরের মত চেহারা। চকিতে বাসদেও তাঁকে ইশারা করলে। এতক্ষণ পর আসামীকে দেখতে পাওয়া গেল, লোকটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে, পরনে কালো আচকান ও পায়জামা, মাথায় একটা মুসলমানী ধরনের কালো টুপী। ঘুরে দাঁড়াল—বাঃ, চমৎকার চেহারা ত, বাঙালী না কাশ্মীরী? নাম ত সুনীল রায়। হ্যাঁ, জামাই করার মত চেহারা বটে! পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ে গেল সুনীল রায় একজন পলাতক আসামী। দ্‌ঃকার নেই বাবা চেহারায়।

বুড়ীর কথা মনে পড়ে গেল। ডাঃ নৃপেন মুখার্জির ভাই কেমন দেখতে কে জানে। একবার দেখে এলেই হ'ত। যত সব ঝক্ক ঝামেলা। পাশ দিয়ে একটা লোক হনহন করে চলে গেল। মোটা থপথপে চেহারা, কিন্তু জামার বাহার দেখবার মত। লোকটা বড় বড় রঙীন হরিণ মার্কা হাওয়াই সার্ট, আর একটা নীল রঙের প্যাণ্ট পরে রয়েছে, বয়স তার চেয়ে কম নয়, কিন্তু সাজের ঘটার কমতি নেই।

ফিল্ম ডাইরেক্টর ধীরেন ভড় সুনীলের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছিল। ব্রজেশ্বরবাবু নিজের জায়গায় গিয়ে জুত করে বসলেন। পানের ডিবে থেকে দু'খিলি পান আলগোছে মুখে দিলেন, সঙ্গে এক চিমটে জরদা ক্রমাগত চিবোতে লাগলেন। চিবুক আর থুতনীর মাংসপেশীগুলো একযোগে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে লাগল—মুখ-গহ্বরের গ্রন্থিগুলো কাজ সুরু করল। সরস হয়ে এল তাঁর মন ও মুখ। একটা তৃপ্তির আবেশ এল তাঁর মুখের ভাবে।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ কিন্তু লক্ষ্য করলেন, রেবা যেন প্রাণপণ শক্তিতে নিজের কাজ করে চলেছে। নতুন কেসটারই ভার নিয়েছে সে। নানা ভাবে চেষ্টা করছে মৃতপ্রায় লোকটাকে টেনে আনবার জন্যে। চাঞ্চল্য নেই, বরং একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা এসেছে ওর কাজের মধ্যে।

আপনার কাছে এট্রোপিন-মরফিন আছে? ধূলিধূসর পোশাকে একজন রিলিফ ট্রেনটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ তার দিকে একবার তাকালেন, কেন?

একটা ইস্‌প্লিনটার ঢুকেছে—এ্যাপিগাষ্ট্রীক রিজিয়নে। আমার কাছে এ্যাম্পুল নেই।

আপনি ডাক্তার ?

হ্যাঁ, আমার নাম বলাই পালচৌধুরী।

ওঃ, চলুন।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ একটা বড় ব্যাগ নিয়ে ডাঃ পালচৌধুরীর সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

না, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, রেবা যেন অস্থির হয়ে উঠল, এখন কি করবে সে ? কাছে যা ছিল সবই ত দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু সে এত চঞ্চল হচ্ছে কেন ? ও ত একটা রোগী, তাকে চিকিৎসা করছে সে, সেবা করছে। আর একটা ইনজেকশন দিলে রেবা। কপালের পাশ থেকে রক্ত পড়ছে—অনর্গল, ফোঁটা ফোঁটা করে তিল তিল করে বেরিয়ে যাচ্ছে তার প্রাণশক্তি। ব্যাণ্ডেজটা ভিজে গেছে, চিবুকের পাশে একটা ক্ষীণ রক্তের ধারা শুকিয়ে রয়েছে। কাল্‌চে রঙের রক্তের রেখাটা ঠোঁটের কোণে মিলিয়ে গেছে। চোখ দুটো আধ-বোজা, শ্বাস পড়ছে বটে কিন্তু কখনও বা দ্রুত ঘন ঘন, কখনও-বা স্তিমিতপ্রায়। পালসটা রেবা একবার দেখল, এত দ্রুত যে, শোনা সম্ভব হ'ল না। মাঝে মাঝে যেন অনুভবই করা যাচ্ছে না। আর একবার তাকালে রেবা—লোকটার ঠোঁট দুটো কাগজের মত ফ্যাকাসে। ঘোলাটে চোখ দুটো খুলে তাকাল লোকটা, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে যেন রেবার দিকে তাকিয়ে আছে।

কে ?

আমি নার্স। উত্তর দিলে রেবা।

না না, বল তুমি কে, বল। আর্তস্বরে চীৎকার কড়ে উঠল কমলাকান্ত।

আমি, আমি রেবা। থর থর করে কাঁপছে রেবা, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে যেন সে, আশপাশের জিনিসগুলো সচল হয়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে যেন তার চতুর্দিকে।…

ঝন্…ঝন্ · ঝন্…। তৃতীয় বগীর চালাটা আটকে ছিল।

এইবার ক্রেনে করে সেটা তোলা হচ্ছে। আসগরের হাতের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠেছে। হাফ্রিজ—চীৎকার করলে আসগর। লোহার ফ্রেমটা যেন প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিচ্ছে। এতদিনের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কটা জোর করে ছিঁড়ে দিচ্ছে ওরা…।

কড়…কড়…কড়াৎ…। জোর করে সম্পর্ক কি ছিন্ন করা যায়।

রেবা আবার তাকাল লোকটার দিকে। হ্যাঁ, সেই লোক, কোন ভুল নেই। ভেবেছিল জীবনে আর কোন দিনই তার সঙ্গে দেখা হবে না। সযত্নে যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, শেষ সময় আবার তার কাছেই ফিরে এল কি করে? এ আবার সম্ভব না কি! ঘোলা ঘোলা চোখে এখনও তাকিয়ে আছে কমলাকান্ত রেবার দিকে। আঃ, কি শান্তি! আবার এত দিনের হারানো রেবা ফিরে এসেছে। তার এত কাছে! এ যে বিশ্বাস করা যায় না। কত দিন দেখে নি ওকে, ভাবছে কমলাকান্ত, থুতনির কাছে সেই পরিচিত আঁচিলটা যেন জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু এ কোথায়? জায়গাটা ঠিক পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না ত? এত কলরোল কিসের? কর্কশ একটানা বজ্রনির্ঘোষ কেন? ওকি এত অন্ধকার হয়ে এল কেন? রেবা, রেবা, তুমি কোথায়? তোমায় আর দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কমলাকান্তের বুকের ওপর ভেঙে পড়ল রেবা—ভেঙে পড়ল আকাশচুম্বী পর্বত প্রচণ্ড আলোড়নে, সমুদ্রের হুঙ্কার-গর্জনে সব চাপা পড়ে গেল। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তলিয়ে দিলে রেবাকে।

কতবার তাকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হ'ল? নতজানু হয়ে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কতবার তাকে ভূমি চুম্বন করতে হ'ল, সেবারও এই কমলাকান্তকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। রেবাদের প্রাচীনপন্থী পুরাতনধর্মী সংসার ও সমাজ তার এবং কমলাকান্তের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, মিলতে দেয় নি তাদের···

কমলাকান্ত বসেছিল চুপ করে, সামনে রেবা দাঁড়িয়ে।

কিন্তু রেবা, তোমায় ওরা জোর করে বিয়ে দেবে অন্য লোকের সঙ্গে?

হ্যাঁ কমল!

কিন্তু তুমি, তুমি কি বল রেবা?

আমার বলার কিছু নেই, আমার যে কেউ নেই কমল।

আমি ত রয়েছি রেবা, চিরদিন তোমার পাশে থাকব। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতির কি দরকার আছে?

কমল, জীবনের সঙ্গে ভালবাসার শত্রুতা আছে, তাই ভালবাসার জিনিস মিলিয়ে যায় ঢেউয়ের দোলাতে—

জীবন নেই রেবা, আছে শুধু প্রান্তরের গান, মনভোলানো ছন্দ। ঢেউ

নয় রেবা, মত্ততা নয়, প্রচণ্ডতা নয়, উচ্ছ্বাস নয়, বেগ নয়, আছে শুধু শান্ত গোধূলি আর হিমছোঁয়া শ্বেত শতদল।

আমি কবি নই কমল, তোমার মত চিন্তাশক্তি নেই, তাকে নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে কাল কাটাতে পারব না। তোমায় পেতে গেলে আমার একটা দিক ভেঙে যাবে, মুছে যাবে। তুমিও আমায় সবটা পাবে না।

কিন্তু তোমায় আমি হারাব না রেবা, তোমায় বিয়ে করতে না পারলেও তুমি আমার···।

ও কথায় আমি শান্তি পাব না। আমি বাস্তব চাই, সম্পূর্ণতা চাই, দুঃখ হাসি, রোগশয্যার পাশে ক্লান্তিহীন রাত্রি, ক্ষুধায় খাদ্য—স্বপ্নের কুহেলী নয়, কথার মালা নয়।

রেবার বিয়ে হয়েছিল ননীবাবুর সঙ্গে। ননীবাবু উকিল, মোটা বেঁটে লোকটি, দেখলেই মনে হয় ভালমানুষ। বিয়ের পর রেবাকে নিয়ে তিনি মালদহে চলে গেলেন। নতুন করে নিজের মনকে তৈরি করতে সুরু করলো রেবা। সংসারের মাঝখানে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিল সে। স্বপ্নের দেশ যেন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। জানালার ধারে রেবা দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে রয়েছে রাস্তার ওপরে, সামনে হারু ছুতোরের কারখানা। লোকটা কি কাজই না করতে পারে! শুকনো কঙ্কালসার দেহ, কিন্তু সমানে কাজ করে যায়। কিসের অনুপ্রেরণায় কে জানে!

জানালার ঠিক তলায় কাঁচা নর্দমা। একবার তাকিয়ে দেখল রেবা সেই দিকে। নর্দমাটার পাশে দু'তিনটে কচুগাছ, বড় বড় ঘন সবুজ পাতাগুলো ছত্রাকারে ছড়িয়ে রয়েছে। নর্দমাটার জলটা কর্দমাক্ত। একটা শালপাতা জলের ওপর ভেসে আসছিল, নর্দমার বাঁকের মুখে আটকে গেল। জলটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে, শুকনো শালপাতাটারও যেন জলের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা কিন্তু পারছে না ; মাঝে মাঝে নড়ছে বটে কিন্তু গতিহীন।

হঠাৎ নিজের কথা মনে হল রেবার। সেও যেন ওই শালপাতাটার মত আটকে আছে, কে যেন তাকে বাঁকের মুখে ধরে রেখেছে।

কি গো, কার ধ্যান করছ? ননীবাবু কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, বাঘের থাবার মত একটা লোমশ হাত রেবার কাঁধের উপর রাখলেন।

না! এমনি দেখছি। বলল রেবা।

মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নিশ্চয়ই।

আমি কি মায়ের সঙ্গে ঝগড়াই করি শুধু?

না, তা অবশ্য কর না, কিন্তু মাঝে মাঝে অবাধ্য হও, তাতেই মা রেগে যান।

তোমার মায়ের সব কথা শোনার মত নয়।

হ্যাঁ, সে আমি জানি, তা হলেও যতদূর সম্ভব মানতে হবে।

সে উপদেশ দিনের মধ্যে আর কতবার দেবে?

লক্ষ্য করেছি, মায়ের পক্ষে কোন কথা বললেই তুমি অনর্থক রেগে যাও।

মায়ের পক্ষে সব সন্তানেরাই কথা বলে, তাতে কেউ আপত্তি করবে না।

তোমার মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে রেবা যে, স্ত্রীর কথা শুনেই প্রত্যেক লোকের চলা উচিত।

না, ও বিশ্বাস আমার নেই আর ওটা কোন স্ত্রীরই কাম্য নয় বলে আমি মনে করি।

আচ্ছা, একথা বোঝ না কেন যে, মা বুড়ো হয়েছেন, আর ক'দিনই বা আছেন, তার মনের মত চলতে আপত্তি কি? মাও সুখী হন, সংসারেও শান্তি আসে।

সংসারে শান্তি আসা সম্ভব নয়।

কেন! যেন অবাক হয়ে গেলেন ননীবাবু।

কারণ তোমার মা আমায় পছন্দ করেন না।

এ আর নতুন কথা কি বললে, বাংলা দেশের শাশুড়ীরা চিরকালই পুত্রবধূদের খুব ভাল চোখে দেখেন না।

অন্ততঃ ভদ্র ব্যবহারটা আশা করা চলে ত?

সেটা উভয়ত।

আমার ব্যবহার খারাপ নাকি?

হ্যাঁ।

কি রকম?

আজই তুমি মায়ের অবাধ্য হয়েছে, ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ায় উঠেছিলে কেন? জান মায়ের গঙ্গাজল আছে, ও-দাওয়াতে উঠলে মায়ের রাগ হতে পারে।

সেটা আমি জানব কি করে, গঙ্গাজল ত ওখানে থাকে না।

ঐখানেই ত বিচারবুদ্ধি, ঐখানেই ত 'পাওয়ার অব অবজারভেশন'। ননী-বাবুর দুটো জ্র কয়েকবার ওপর-নীচ করল। এই ত সেদিন সেখ মণ্টু আলীর কেসে আমি বললাম, 'ইওর অনার, আসামীর বাঁ চোখ খারাপ।' হাকিম ত অবাক। বুঝিয়ে দিলাম, চিঠিটা পড়বার সময় সে ডান চোখ দিয়ে পড়েছে। একেই বলে 'পাওয়ার অব অবজারভেশন'। ননীবাবুর স্ফীত উদরের চর্বির উপর তরঙ্গ খেলে গেল। মোটা নাকের পাশ দিয়ে শ্লেষ্মামিশ্রিত নস্যের ক্ষীণ ধারা গড়িয়ে আসছে। রেবা একবার তাকিয়ে দেখল স্বামীর দিকে, মনের মধ্যে হঠাৎ যেন সব আলো একসঙ্গে নিভে গেল। কতকগুলো কৃমি যেন কিলবিল করে দুর্গন্ধ নর্দমাটার ভিতর থেকে উঠে আসছে।

বৌমা! সুহাসিনী দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন। ছেলের পরেই মা।

কি মা?

সারা সকাল কি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে বাছা, গেরস্তের সংসারে একি অলুক্ষণে কথা!

কেন মা, আমি ত...

থাক। বাধা দিলেন সুহাসিনী দেবী, তোমার আর কাজের ফিরিস্তি দিতে হবে না—কাজের মধ্যে জানালার ধারে দাঁড়ান, নয় ছাদে ঘুরে বেড়ান।

না মা, আজ শরীরটা ভাল নয়। একটা অজুহাত দেখাবার চেষ্টা করে রেবা।

তোমরা কলকাতার মেয়ে মা, তোমাদের শরীরটা বড়। এই যে আমার বোন, যখন বেঁচে ছিল, এই সেদিনের কথা। ঘরে নৃপেন, ওর ছেলে অত বড় ডাক্তার, কোনদিন শরীর খারাপ উচ্চারণ করতে শুনি নি। যাও, স্নান করে এসে রান্নাঘরে যাও। ননীকে আবার কোর্টে বেরোতে হবে। সুহাসিনী দেবী নিষ্ক্রান্ত হলেন।

জানালার ফাঁক দিয়ে নর্দমাটা একবার তাকিয়ে দেখে নিলে রেবা—সেই শুকনো শালপাতাটা এখনও বাঁকের মুখে আটকে রয়েছে।

কমলাকান্ত কিন্তু আটকে রইল না, জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে, তার কাব্যপ্রীতি যেন বেড়ে গেল অকস্মাৎ। প্রতিশোধের তীব্রতা দিয়ে যেন সে

সাহিত্যচর্চা স্বরু করল। রেবার মত কমলাকান্ত কিন্তু ভোলবার চেষ্টা করে নি, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই তা সে জানে। মনের দিক দিয়ে ক্ষতি-পূরণের কথাও ভাবে নি সে, কারণ কমলাকান্ত জানে ক্ষতির দুঃখ মনে পুঞ্জীভূত করে রাখলেই সে ক্ষয় হয়ে যাবে। ভালবাসতে ভুলে যাবে, স্নিগ্ধ শ্যামলিমা অন্তর্হিত হবে, বনমর্মর নিস্তব্ধ মূক হয়ে যাবে। বটের ছায়ায় আর রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাবে না। ধুনো ঘাসের উপর জোনাকীরা আর আসবে না। শেষ সে হবে না, জীবনের শেষ নেই তা সে অনুভব করে। ভালবাসার কি ইতি আছে। উষর মেরুতে সে যে কাঁটাগাছ হয়ে বেঁচে আছে; শৌখীন অর্কিডের মত নয়। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের দরকার হয় না। সঞ্জীব দত্ত আর এষাকে কমলাকান্ত চেনে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ে ওরা। ওদের মধ্যেও পরিপূর্ণতা এল না! বেশ মেয়ে এষা। কিন্তু রেবার মত নয়। রেবা অত বেশী লেখাপড়া শেখে নি বটে, কিন্তু মনের সজীবতা এষার চেয়ে অনেক বেশী। এষা আর সঞ্জীবের ভালবাসার কত গল্প রেবাও শুনেছে তার কাছে।

বেচু দত্ত ষ্ট্রীটের অন্ধকার গলির ভেতর সেই পুরনো মেসটায় কমলাকান্ত এখনও থাকে। ধূলিধূসর মলিন পরিবেশ কিন্তু বেশ আছে সে। না, কারও বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। কারণ আদর্শের গুমোটে তার মন বদ্ধ নয়। পৃথিবীর বৈচিত্র্যে তার রসপিপাসু মন ভরে আছে। কিছুই তার হারায় নি। সেদিনের বকুলঝরা সন্ধ্যায় যে অপরূপ সঙ্গীতধারায় তার মন অভিষিক্ত হয়েছিল, তার ছন্দের ছোঁয়াচ, তার স্নিগ্ধমধুর আবেগ এখনও তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেচু দত্ত ষ্ট্রীটের মেসের কামরাটা ছেড়ে কমলাকান্ত কোথাও যেতে চায় না। সে নিজে স্বয়ম্ভূ, পরিপূর্ণতা এসেছে ওর জীবনে।

বালিশের ওপর মাথা রেখে তাকিয়ে থাকে কাঠের পার্টিশনের দিকে। টিকটিকিটা তার খুব পরিচিত। কাটা কাটা দাগ লেজের কাছে, ক্রীম রঙের দেহ। তাকে যেন চেনে বলে মনে হয়! তার আসার অপেক্ষায় যেন উন্মুখ হয়ে থাকে।

তালাটা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে কমলাকান্ত প্রথমেই দেখে নেয় টিকটিকিটা

কোথায়, রোজ প্রায় এক জায়গায় থাকে—পার্টিশনের কোণে, গলাটা দেহ থেকে ঊর্ধ্বদিকে তুলে তাকিয়ে থাকে। কালো ছোট ছোট গোল চোখ দিয়ে তাকে যেন নিরীক্ষণ করে দেখে। হলদে পার্টিশনের রঙের সঙ্গে টিকটিকির ক্রীম রঙের বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে তা সে লক্ষ্য করেছে।

কমলদা! পার্টিশনের ওপার থেকে সুকুমারের গলা শোনা গেল। সুকুমার সিটি কলেজে বি-এস্‌সি পড়ে। কমলাকান্তর একজন বিশেষ ভক্ত, মানে গুণমুগ্ধ ভক্ত বলা চলে। কমলাকান্তর লেখা কবিতা, প্রবন্ধ সব তার প্রায় কণ্ঠস্থ।

কে, সুকুমার?

হ্যাঁ, দাদা আমি। আপনার বইটা বেরিয়েছে আজ?

কবিতার বইটা?

হ্যাঁ, ঐ যে উর্মিমুখর? অদ্ভুত হয়েছে। সুকুমারের স্বরে উৎসাহের দীপ্তি।

ছবিটা, না ফ্রেমটা? হেসে উঠল কমলাকান্ত।

না না। ঘরের ভেতর ঢুকল সুকুমার—শীর্ণকায় যুবক, অত্যন্ত সাধারণ, কৈশোরের কোমলতার সঙ্গে এখনও ছেলেমানুষী ভাব ফুটে আছে ওর মুখে চোখে।

প্রত্যেকটা কবিতা আমার ভাল লেগেছে কমলদা।

কেন ভাল লাগল বলত?

তা ত জানি না—

আমি কিন্তু জানি?

কি?

প্রেমে পড়েছ বোধ হয়। মজা দেখবার জন্য বললে কমলাকান্ত।

কি যে বলেন কমলদা! কানের পাশ লাল হওে ওঠে সুকুমারের।—হ্যাঁ, আপনি সাহিত্য সম্মেলনে যাবেন না? তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ে সুকুমার।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ছাড়লে না, যেতেই হবে।

আমিও যাবো কমলদা।

পাগল নাকি, এক মাস বাদে পরীক্ষা, ভুলে গেছ?

ক'দিন আর লাগবে। অনুযোগের ভঙ্গীতে বললে সুকুমার।

না, তোমার যাওয়া সম্ভব নয় সুকুমার—তোমার কমলদা তোমায় ভবঘুরে করতে চায় না নিশ্চয়ই।

ভবঘুরেরাই ত জীবনের সবটা দেখতে পারে, দুঃখ আর সৌন্দর্যের স্বাদ পায়।

সময় হলে সবই পাবে, এত ব্যস্ত কেন? আশ্বাস দেয় কমলাকান্ত।

কমলাকান্ত ভেবেছিল রেবা না হলে তার জীবন হয়তো মিথ্যা হয়ে যাবে। বোধ হয় নিজেকে স্থির রাখতে পারবে না, হয়তো তুষার-ঝটিকার মত শতধারে চূর্ণ করে ফেলবে নিজেকে। সুকুমারের মুখের দিকে তাকাল কমলাকান্ত। উজ্জ্বল চোখে যখন সুকুমার তার নিজের মনের কথা বলে, তখন বেশ লাগে। হায় রে ঐকান্তিকতা! কতটুকু মূল্য আছে তার! আজ যে সত্যকে আঁকড়ে আশ্রয় করে পাথেয় করে সারাজীবন চলতে চায় মানুষ, কাল সেটা কোথায় যায়? হায় রে! আকুলতা, পথ চলতে নব-জীবনের স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে যে সে-তাকে কি ছাড়া যায়?

অনুপমের দল হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরের ভিতর, এই নিন টিকিট, চলুন, ট্যাক্সি এনেছি, একেবারে ষ্টেশনে পৌছে দিই। অনুপম সাহিত্যিক সম্মেলনের একজন পাণ্ডা।

কিন্তু দু'ঘণ্টা দেরী আছে যে ট্রেনের?

তা হোক, একটু আগে যাওয়াই ভাল কমলদা।

তৈরী হয়ে নিলে কমল, সামান্য খুঁটিনাটি জিনিসগুলো গুছিয়ে নিল একটা সুটকেশে। দরজা বন্ধ করবার সময় একবার ঘরের ভেতরটা তাকিয়ে দেখে নিলে। টিকটিকিটা হলদে পার্টিশনের কোণ থেকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অসম্ভব! চীৎকার করে উঠল কেটু, হানিফ গেছে ইলেকশন করতে, বয়টা সারাদিন পড়ে আছে অসুখের অজুহাতে, আমি কি করব?

তা হলে কফিখানা থেকে কাবাব আর চাপাটি আনা যাক। সার্টের হাতা গুটোতে গুটোতে রবার্ট উত্তর দিলে।

মাঝে মাঝে এমন সিলি কথা বল যে, রাগ ধরে আমার। জলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় কেটু স্বামীর দিকে।

না, না, তুমি রাগ করো না ডিয়ারী, আমি দেখেছি ডক্টর সমারসেট

তোমার ব্লাডপ্রেসারের পক্ষে যা যা করতে মানা করেছেন, তুমি তাই করছ। থামাবার চেষ্টা করে রবার্ট।

স্ত্রীর অসুখের জন্য সম্প্রতি বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে তার। ডাক্তার সমারসেট নামজাদা চিকিৎসক। নেটিভ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা ওরা করায় না, তাতে ওদের ইজ্জত যায়, সমাজে বদনাম হয়। ডাঃ সমারসেটের ফি, ওষুধের দাম, রক্ত-পরীক্ষার ফি ইত্যাদি নিয়ে বেশ একটা মোটা রকমের বিল হয়েছিল, সেকথা রবার্ট ভুলে যায় নি। স্ত্রীর অসুখের চেয়ে ডাক্তারের মোটা বিলটা অনেক ভয়াবহ। ওয়েলেসসির ট্রামটা মোড় ফিরছে, তারই অদূরে গলির ভেতর একটা দোতলা ফ্লাটে রবার্ট ডগলাস থাকে।

সে অনেক দিনের কথা, তাব বাবা তাকে ছোটবেলায় এই বাড়ীতে নিয়ে ঢুকেছিল। হরিধন আঢ্যের বাড়ী, পয়ত্রিশ টাকা ভাড়া, তিনটে ঘর, একটা লম্বা বারান্দা ও বাবুর্চিখানা. আশপাশে বস্তি, বেশীর ভাগ অধিবাসীই মুসলমান। প্রতিবেশী হিসাবে ওদের সঙ্গে ডগলাসদের বরাবরই প্রীতির সম্পর্ক আছে। বস্তীটায় দিবারাত্র কলরোল লেগে রয়েছে, সর্বদাই যেন একটা হৈ-হৈ ভাব। বস্তীটায় না হয় হ'ল, কিন্তু সামনের ঐ কফিখানা! সারাদিন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত সমানে লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। একদল ঢুকছে, আর একদল বেরোচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, জোয়ান কেউ বাদ নেই। কুলি, মজুর, রিকসাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে বস্তীর মালিক আহম্মদ আলী পর্যন্ত সকলেরই অবারিত দ্বার, কারোর কোন দ্বিধা নেই, কারণ ওখানে পার্থক্য নেই, ভেদাভেদ দেই, অধিকার সকলের সমান। কফিখানাটার নাম হ'ল "সিতারা", দেওয়ালে নানা রঙের কাচের সংমিশ্রণে ইংরেজী এবং উর্দুতে নামটা বেশ বড় হরফে লেখা! বারান্দা থেকে ববার্ট ওদের সব দেখতে পায়, দরজার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তার সামনে একটা চৌকো ট্রে'র ধরনের উনুন থাকে—লোকটা চা তৈরী করে। সকাল থেকে একনাগাড়ে রাত বারটা পর্যন্ত অদ্ভুত ক্ষিপ্র লোকটা। বোতামওয়ালা গেঞ্জী এবং লুঙ্গীপরা এই লোকটার পরিপাটি কাজ দেখবার মত--উপভোগ্য বলা যেতে পারে। পর পর সাজানো থাকে চায়ের কাপ

আর ডিসগুলো। মোটা ধরনের, এক সময়ে রং সাদা ছিল। এখন সেটা একটু ম্লান হয়েছে। সাদা কলাই-করা কেৎলিটা দেখবার মত, বিরাট বলা চলে। কেৎলীর হ্যাণ্ডেলটা পুরনো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাঁধা। সামনের উনুনের সঙ্গে কেৎলীটার সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। ধূলি-মলিন কাপড়-পরা মায়ের কোলে যেন অবাধ্য শিশুটি।

রবার্ট গুণে দেখেছে একসঙ্গে তেরো কপ চা তৈরী করে লোকটা। প্রথমে একটা এ্যালুমিনিয়মের ছোট ডেকচি থেকে ছোট চামচ করে নির্ভুল হিসাবে চিনি দিয়ে দেয়, তারপর আর একটা বাটি থেকে দুধ, চামচ দিয়ে দুধের সরটা পিছন দিয়ে সরিয়ে দেয়। তার পর কেৎলী থেকে চায়ের লিকার ঢালে, লোকটার অদ্ভুত নিপুণতা, হিসাবে এতটুকু তারতম্য নেই, ক্রমাগত এই করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে একটা বিড়িতে দু'এক টান দিয়ে নিচ্ছে, নিভে গেলে সামনের উনুনের কয়লাতে ছুঁইয়ে নিয়ে আবার ধরিয়ে নেয়। খালি কাপগুলো ফেরত দিয়ে যাচ্ছে একটা ছোকরা। নীচে বসানো একটা বালতীর জলে সবটুকু ডুবিয়ে টেবিলের উপর জড়ো করে রাখছে, আর লোকটা একের পর এক চা করে চলেছে। অপর দিকে চেয়ারে বসে আছে দোকানের মালিক রমজান। এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে—সামনে একটা ছোট টেবিল, তার উপর কয়েকটা কাচের জারে কেক, বিস্কুট রাখা আছে, পাশে একটা ছোট কাচের আলমারী। ভেতরে মার্বেল পাথর দেওয়া মাঝারি ধরনের কয়েকটা টেবিল পাতা। ভেনেস্তা কাঠের হলদে রঙের চেয়ারগুলো সাজানো রয়েছে টেবিলগুলোর চতুর্দিকে। টেবিলের উপর একটা করে সাদা রঙের জগ বসান। ওটার জল প্রয়োজনানুযায়ী ভোক্তার দল ব্যবহার করে। নানারকম লোকের সমাগম হয়। কত বিচিত্র তাদের পোশাক, বিভিন্ন রঙের লুঙ্গী, আচকান, স্যুট-পরিহিত এই জনতাকে দেখতে ভারী ভাল লাগে রবার্টের। বেশ একটা মমতা জন্মে গেছে, কারণ অনেক দিন এই দোকানের রুটি-কাবাব খেয়েছে সে।

সেলাম সাহাব! মুখ ফিরিয়ে রবার্ট শহীদকে দেখতে পেল।

কি খবর? রবার্ট ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখে নেয়, কাছাকাছি কেউ আছে কিনা। শহীদের সঙ্গে রবার্টের বেশ প্রাণের যোগ আছে। দুজনে মিলে প্রায়ই কফিখানার ভেতরের ঘরে বসে এক-আধ বোতল খায়;

কেট্ সেটা জানে। মত্ত অবস্থায় অনেকদিন স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, মাথায় জলপটি দিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি তাকে করতে হয়েছে রবার্টকে সামলাবার জন্যে। কেট্ জানে ঐ শহীদ রবার্টকে প্রলুব্ধ করে। বাস্তবিক পক্ষে শহীদের কিন্তু কোন দোষ নেই। ও অভ্যাসটা রবার্ট পেয়েছিল ম্যাকের কাছ থেকে—ইঞ্জিন ড্রাইভার ম্যাকডোনাল্ড, তাকে বেশ মনে আছে রবার্টের। অসুরের মত যেমন চেহারা তেমনি অপর্যাপ্ত খেতে পারত ম্যাক, আর শক্তিও ছিল তেমনি! প্রায় বলত, "রবার্ট, মাই বয়, লোহার দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে দেহে শক্তি চাই, খাও, প্রচুর খাও।" পাশেই বড় মগ ভর্তি থাকত বিয়ার। কথায় কথায় চীৎকার করত আর মগে চুমুক দিত, তখন সবে রেল কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছে রবার্ট ডগলাস।

বেশ ছিল তারা ব্রিটিশের আমলে, যেমন সম্মান তেমনি লোভনীয় চাকরী। আর এখন—ঠিকই বলে কেট্, ওদের স্পর্ধা বেড়ে গেছে স্বাধীনতা পেয়ে। ব্রাউন লোকগুলো মাথায় সাদা টুপী পরে আবার যেন মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছে। তার বড় মেয়ে জেনী স্বামীর সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে। ছেলে-টাকে ইংলণ্ডে রেখে গেছে, এখন স্বামী-স্ত্রী—রবার্ট আর কেট্ ডগলাস এই পচা ভাঙা বাড়ীটায় পড়ে আছে।

রবার্ট!—ডাকলে কেট্।

ইয়েস, ডিয়ারী!

ও কে? শহীদ না? শহীদকে দেখতে পেয়েছে কেট্। শহীদ ততক্ষণে কফিখানার সংলগ্ন লাল কাপড় বিছান পানের দোকানে পান কেনার অজুহাতে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে।

আরে! তাই ত মনে হচ্ছে। রবার্ট যেন এই প্রথম শহীদকে দেখতে পেল।

তোমার আর কতদিন ছুটি আছে। তীক্ষ্নস্বরে প্রশ্ন করলে কেট্।

পরশু পর্যন্ত। তার পরেই ১১০কে নিয়ে মোগলসরাই।

বুঝেছি। এবার তোমার সঙ্গে আমিও যাব।

তুমি! কোথায়?

তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ঐ ট্রেনেই যাব। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় কেট্।

বেশ তাই হবে। আমি তা হলে পাসের ব্যবস্থা করি। রবার্ট নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। একটা সুন্দর রাত থেকে বঞ্চিত হ'ল সে। শহীদটা বোকার মত বাড়ীর কাছে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কেন? এখন আর অন্য কোন উপায় নেই—কেটের সঙ্গে হয় সিনেমা, না হয় উল কিনতে চাঁদনী—ধুত্তোর, বরাতটাই খারাপ।

রবার্টের যখন ছুটি থাকে, তখনই সে লক্ষ্য করেছে তার মনে অবসাদ আসে, নানা রকম অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিসগুলো চোখের সামনে বড় বলে মনে হয়, তখন কেটের কথাবার্তা যেন তার কাছে অসঙ্গত আর অর্থহীন ঠেকে—হামিদের চিকেনকারী বিস্বাদ হয়ে যায়। রংচটা দেওয়াল, খয়েরী রঙের দরজাগুলো, টেবিলে রাখা উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তিশোভিত জ্যামপট, জানালায় টাঙান সড্ রঙের পর্দাগুলো, সবাই তার কাছে শুধু নিরর্থক নয়, বিরক্তিকরও হয়ে পড়ে। অথচ ডিউটিতে থাকার সময় এইগুলোই তাকে হাতছানি দিত, ফেরবার তাগিদ দিত যেন। কিন্তু এতদিনে রবার্ট ভাল করে বুঝেছে যে, বাড়ীতে তার শান্তি নেই। আরাম আছে হয়তো, কিন্তু সুখ নেই। কোথা থেকে জড়তা এসে অদৃশ্য ক্ষয়রোগের মত তিলে তিলে তার মনকে পঙ্গু করে দেয়। তার সত্তাকে যেন বিলুপ্ত করে ফেলে।

ম্যাকডোনাল্ডের কথা মনে পড়ল—কি শক্তি, কি উৎসাহ! লৌহদানবকে চালাবার কৃতিত্ব যেন শক্তিমান পুরুষেরই কাজ।

ম্যাক্ ইঞ্জিনটাকে ভালবাসত—অদ্ভুত ভালবাসত, প্রায়ই বলত, "রবার্ট মাই বয়, মনে রেখ এটারও প্রাণ আছে। তোমার গার্লকে যেমন ভালবাস, ঠিক তেমনি এটাকেও ভালবাসতে হবে।" জুট আর ক্যান হাতে নিজে জার্নালএ্যাক্সেলগুলো পরীক্ষা করতো, হাতের তালু দিয়ে তাদের উষ্ণতা অনুভব করতো ছেলের কপালে হাত দিয়ে যেমন মায়েরা জ্বর দেখে। পিষ্টন-কভারের উপর স্নেহভরে হাত বুলোতো যেন অনেকদিন পর ফিরে আসা পরিচিত বন্ধু। রবার্টও নিখুঁত ভাবে দেখে নিত। সঙ্গে সঙ্গে বিজবিজ করে বলত, "কি, ঠিক আছে তো ওল্ড গার্ল? কোন অসুবিধা নেই, কিসিং কম্‌ফারটিবল্?" ষ্টোকার আবদুল তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসত—সাহেবের এ অভ্যাসটার কথা ও জানে।

প্রথম যেদিন রবার্ট গাড়ী চালায় সেকথা তার এখনও বেশ মনে আছে।

প্রথম ভয় পেয়েছিল, ১৩নং আপ নিয়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে অবশ্য ম্যাকডোনাল্ড ছিল—মনে মনে বেশ গর্বিত রবার্ট, আজ সে নিজে গাড়ী চালাবে। আগেই ম্যাক বলে দিয়েছিল তার সাহায্য না নিয়েই গাড়ী চালাতে হবে, ভেবে নিতে হবে, ম্যাক যেন অনুপস্থিত।

যথারীতি সিগন্যাল ক্লিয়ার দিল এবং গার্ডের হুইসল পড়ল। রবার্ট রেগুলেটারটা ধরে নীচের দিকে চাপ দিল। ঘস্‌ঘস্‌ করে ইঞ্জিনের চাকা ঘুরতে লাগল—ফ্লেমিং হচ্ছে, কি বিপদ! প্রথমেই এই। লিভারটা ঘুরিয়ে রেগুলেটার-টায় আবার চাপ দিলে সে, গাড়ী একটু পেছন দিকে চলল—তারপর লিভারটা ওপর দিকে ঘুরোল, চাপ দিল রেগুলেটারটায়, এইবার চলতে সুরু করল গজেন্দ্রগমনে। পিছনে বসে ম্যাক লক্ষ্য করছে, বাবা যেন দেখছে ছেলেটার প্রথম চলতে শেখা। দাঁত দিয়ে মোটা ধূমায়িত পাইপটা টিপে ধরে আছে, কালো রঙের টুপীটা কপালের উপর নামানো, হাতে মগ। দুটো ষ্টেশন বেশ চলল, লৌহদানব আজ্ঞাবহ ক্রীতদাসের মত বেশ চলতে লাগল রবার্টের ইঙ্গিতে। পনি হুইলগুলো এক লাইন থেকে অপর লাইনে টাট্টু ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে নির্ভুল ভাবে অগ্রসর হতে লাগল—গর্বিত হ'ল রবার্ট, আড়চোখে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। তৃতীয় ষ্টেশনটা ছাড়বার কিছুক্ষণ পরে রবার্ট লক্ষ্য করল লাইনের ওপর প্রায় আধ মাইল দূরে পেছন ফিরে একটা মোষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হুইস্‌লের চেনটা ধরে টানল, তীক্ষ্ণ কর্কশ একটানা আওয়াজ, না! নিশ্চল হয়ে রয়েছে ওটা। রেগুলেটারটা কমিয়ে দিলে—ভ্যাকুয়াম ব্রেক টানা ছাড়া আর উপায় নেই। হঠাৎ তার হাতটা সজোরে কে যেন ঠেলে দিল। পেছনে দাঁড়িয়ে ম্যাক, ফুল! করছো কি? ভ্যাকুয়াম দিলে গাড়ী উলটে যাবে যে!

কিন্তু ওটা! রবার্ট ইঙ্গিত করলে মোষটার দিকে।

এতগুলো লোকের জীবনের চেয়েও ওটার দাম বেশী নাকি?

রেগুলেটারটা বন্ধ করে ভ্যাকুয়ামটা ধীরে ধীরে টানতে লাগল ম্যাক। কর্কশ হুইস্‌লটা সমানে বেজে চলেছে। গাড়ীর গতি কমেছে বটে কিন্তু থামানো গেল না, হঠাৎ দুলে উঠলো। প্রচণ্ড ধাক্কায় যেন ইঞ্জিনটা টাল খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইঞ্জিন থেকে ম্যাকডোনাল্ড, রবার্ট, আবদুল, ফায়ারম্যান সকলে নেমে এল। হঁ্যা, মহিষাসুর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। কিন্তু মুশকিল হ'ল আর

একদিকে, যতবার ইঞ্জিন চালাতে যায় ততবার ইঞ্জিনের চাকাগুলো ঘুরে যায়, ফ্লেমিং হতে থাকে। মোষের মোটা চামড়া জড়িয়ে গেছে চাকার সঙ্গে। বেশ মনে আছে রবার্টের, প্রায় আধ ঘণ্টা লেগেছিল গাড়ীকে চালু করতে।

বাবুর্চি হামিদ ফিরেছে, কেটের গলা শোনা যাচ্ছে। উত্তেজিত গলার স্বর ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠছে, সম্ভবতঃ হামিদকে উদ্দেশ্য করে। না, হামিদের কোন কসুর নেই। বাবুরা তাকে ছাড়ে নি, একটার বদলে সাতটা ভোট তাকে দিয়ে দিইয়েছে, সে কি করবে? অনেকে তো এই সুযোগে ব্যালট-পেপার বিক্রী করে বেশ কিছু রোজগার করেছে, সে তো তাও করেনি।

মুচকি হাসল রবার্ট, মনে মনে বললে, ভালই হয়েছে, মর এবার তোরা নিজেরা মারামারি করে, আমরা মজা দেখি। এই তো গত দাঙ্গার সময় কি সব তোড়জোড়—ছাদের ওপর ইটের গাদা, বোমা তৈরী, ছুরী শান্ দেওয়া, দোকান লুঠ করা, সবই তার চোখের সামনে হয়েছে। তার কাছে এক পক্ষ অপর পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে—অপরের নিষ্ঠুরতার ভুরি ভুরি জ্বলন্ত নিদর্শন দিয়েছে। মাঝে থেকে গফুরের কাছ থেকে পচিশ টাকায় একটা অলওয়েভ রেডিও সেট কিনেছিল রবার্ট এবং নন্দ গোয়ালার কাছ থেকে বার টাকায় সেলাইয়ের কল গস্ত করেছিল, পরে সে-দুটো অবশ্য বুদ্ধি করে টাটায় এবং ভাগলপুরে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

রবার্ট! ডাক দিল কেট্।

ইয়েস, ডিয়ারী।

হামিদের কথা শুনলে?

হ্যাঁ, তাই তো শুনছি।

এ যে চোরের রাজত্ব হ'ল।

তাই তো দেখছি। সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে সায় দেয় রবার্ট।

পচিশ টাকার রেডিও কিংবা বার টাকার সেলাইয়ের কলের কথা ওদের আর মনে নেই, হাজার হোক্ অনেক দিনের কথা কিনা!

কোথায় বেরুচ্ছ? প্রশ্ন করল কেট্।

পাসের ব্যবস্থা করতে হবে তো। যেতে যেতে কৈফিয়ৎ দেয় রবার্ট।

দেখ আবার শহীদের সঙ্গে কোথাও জমে যেও না যেন। শেষ কথাটা

বলে কেট্ যেন নিশ্চিন্ত হ'ল, ততক্ষণে কিন্তু রবার্ট বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, কথাটা কানে গেল কিনা সন্দেহ।

বারান্দা থেকে দেখতে পেল কেট্, রবার্ট জোর পায়ে মোড়টা পার হয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কেটের। আশ্চর্য লোকটা! এত বয়স হ'ল তবু এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান এল না। লোকটা শুধু ইঞ্জিন চালাতেই শিখেছে, জীবনে কিন্তু কি করে নিজেকে চালাতে হয় তা জানে না।

মনে পড়ে গেল কেটের প্রথম যৌবনের কথা। টাটায় থাকত কেট্ তার বাবার সঙ্গে। টাটা কোম্পানীর ফোরম্যান জেমস তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার বাবারও কোন অমত ছিল না। কেট্ও হয়তো জেমসকেই বিয়ে করে ফেলত, যদি না অকস্মাৎ রবার্ট ডগলাসের সঙ্গে আলাপ হ'ত। জেমসের সঙ্গে তুলনা করলে রবার্টকে ঠিক বিপরীত বলা যায়—রবার্ট যেন চমক লাগিয়ে দিলে তাকে, কারখানাফেরত ক্লান্ত স্বল্পভাষী জেমস, আর সদানন্দ-যৌবন-চঞ্চল রবার্ট, কত তফাত! কেট্কে হাসিতে আনন্দে ডুবিয়ে দিলে রবার্ট। জেমসের ক্লান্ত-বিষণ্ণ মুখের জায়গায় এল আর একটা আনন্দোজ্জ্বল হাসিহাসি মুখ। কেটের বাবাব কিন্তু আপত্তি ছিল—কোথাকার কে তার ঠিক নেই—রেল কোম্পানীতে সবেমাত্র চাকুরী পেয়েছে, আর তাকে কিনা কেট্ বিয়ে করতে চায়? জেমসের কত টাকা মাইনে, একটু ভারিক্কী বটে, তাতে ক্ষতি কি? হাসিখুশী দিয়ে তো আর পেট ভরবে না। কিন্তু কেটের কাছে রবার্টই একমাত্র পাওয়ার মত জিনিস হ'ল। টাকাব কথা সে ভাবতেই পারলে না, বাবার অনুরোধ, উপরোধ, ভীতিপ্রদর্শন পর্যন্ত উপেক্ষা করলে কেট্। এই সেই রবার্ট, ভাবতেও অবাক লাগে কেটেব! কত পরিবর্তন হয় মানুষের! এই তো সেদিনের কথা, এখনও সব ছবিগুলো যেন জ্বল্জ্বল করছে তার চোখের সামনে। কোথায় গেল সেই আকুলতা, কোথায় হারিয়ে গেল সে প্রাণচাঞ্চল্য!

মেমসাব! হামিদের গলা। জলের উপর প্রতিবিম্বটা হঠাৎ কে যেন নাড়া দিলে।

কি হয়েছে? হামিদের উপর এখনও বিরক্ত হয়ে আছে কেট্।

কোন্ হোল্ডঅলটা বার করব?

বড়টা, এবার আমি শুদ্ধ সাহেবের সঙ্গে যাব।

কতদিন বাইরে থাকবেন হুজুর? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে হামিদ।

তা কি করে বলব। অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলে কেট্।

সত্যই তা বলা যায় না। যাওয়া-আসার পথের বাঁকে আচম্বিতে কে ধরে ফেলবে তা কি বলা যায়!

হুগলী জেলার একটি গ্রামে স্বামী স্বরূপানন্দ পাঁচ বৎসর পূর্বে যে আশ্রমটি খুলেছিলেন, এখন সেটির অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। শ্রীশ্রীহরিহরানন্দ আশ্রম এবং স্বরূপানন্দ স্বামীকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। লম্বা দোহারা চেহারা, রংটা পোড়া তামাটে ধরনের, দেহের কয়েক জায়গায় পুরনো ক্ষতের দাগ, কপালের কাছে একটা চিহ্ন, দেহটা যেন বেশ মজবুত ধরনের—মাংসপেশীগুলো সতেজ এবং দৃশ্যমান। স্বামিজী এবং নোহান্তদের মালপো ও রাবড়ী-সেবাজনিত সাধারণতঃ যে রকম নাদুসনুদুস্ এবং তেল-চুকচুকে চেহারা হয়, সে ধরনের চেহারা স্বামী স্বরূপানন্দের নয়। উচ্চারণের ভঙ্গী এবং কথায় বেশ খানিকটা হিন্দুস্থানী ভাব আছে। স্বামিজী বহুদিন হিমালয়ের গুহায় কালাতিপাত করেছেন, সুতরাং ভাষা বা দেহ কোনটাই অক্ষত থাকার কথা নয়।

আশ্রমের পূর্বেকার গোলপাতার ঘর যেটি ছিল, উপস্থিত সেটাতে পাকা গাঁথুনি এবং টালি-বাঁধানো ছাদ করা গেছে। ভক্তসমাগমও যথেষ্ট বেড়েছে, মন্দিরে ভোগ, আরতি, পূজা, হোম প্রায়ই লেগে আছে। বাজারের ভোলা মাড়োয়ারী, বেনেপাড়ার গোবিন্দ সাহা, গাঙ্গুলী পাড়ার সিধু গাঙ্গুলী প্রভৃতি অনেকেই আশ্রমের বিশিষ্ট ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক। মধুর হরিনামের সঙ্গে ভক্তেরা অনেক জিনিসেরই রসাস্বাদ করতে পারেন—রসকলি-আঁকা অনেক কচিমুখের সন্ধানও এখানে পাওয়া যায়, সেকথা পৃষ্ঠপোষকেরা এবং অন্যান্যরা, ভক্তেরা জানেন, তা ছাড়া বিভিন্ন রকমের প্রসাদের কল্যাণে মুখ বদলানোর সুবিধাই বা কম কি? অনেক রকমের রুগীরও আমদানী হচ্ছে। গনি মিঞার বড় তরফের নাতি মণ্টু, কায়েতদের বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকেই যে স্বামিজীর কৃপায় নবজীবন লাভ করেছে, সেকথা দশখানা গ্রামের লোক হলফ করে বলতে পারে।

স্বামী স্বরূপানন্দ অনেক বিবেচনা করার পর এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তাঁর দূরদর্শিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার মত এখনও পর্যন্ত কোন কারণ ঘটেনি।

স্বামিজীর পূর্ব ইতিহাস অজ্ঞাত। সংসার-আশ্রমের কথা কেউ জানে না, জানা উচিতও নয়। ভক্তেরা বলেন, স্বামিজীর বয়স নাকি হ'ল তু'শ দশ বৎসর, প্রথম দর্শনে পাপী লোকের ৪০।৪৫ বছর বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

মাধু! স্বামিজীর কণ্ঠস্বর।

প্রভু! উত্তর দিলে মেয়েটি? সামনাসামনি আসনে তুজনে আসীন।

বুঝলে? স্বামিজীর মুখে লাবণ্যের হাসি। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবীর ফাঁকে তাঁর লোমশ বুকের এক অংশ দেখা যাচ্ছে।

এই হ'ল প্রেম। গুরুতে কৃষ্ণ আরোপ করতে হবে, মনে মনে বিশ্বাস আনতে হবে—আমিই সেই। কথকনৃত্যের মুদ্রায় স্বামিজী মুখের কাছে হাত তুটি বাঁশী ধরার ভঙ্গী করে চোখ বন্ধ করলেন। এ অভিজ্ঞতা মাধবীর জীবনে নতুন। সামনে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ, ধূপধুনার পবিত্র গন্ধ, অর্ধ-নিমীলিত চোখে স্বামিজীর উপস্থিতি, তুপুরের নিস্তব্ধতা সব মিলিয়ে মাধবীকে নিস্তেজ করে দিলে।

কি গো, মাধবী সখী! চিবুকে হাত দিয়ে মাধুকে আদর করলেন প্রভু।

শিউরে উঠল মাধবী—একি, সকলেই এক নাকি? তা হলে আরামবাগের দত্তদের সেজবাবু কি দোষ করলে? কলকাতার সেনসাহেবের বাড়ী ছেড়েই বা এল কেন? মায়ের কথা হঠাৎ মনে পড়ল মাধবীর।

কতদিন আগেকার কথা—আরামবাগে বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ী তারা থাকত —তার মা রান্না করত আর সে চুপ করে বসে থাকত, বাইরের দাওয়াতে। কখন মায়ের কাজ শেষ হবে, কখন্ মা তাকে ডাকবে উন্মুখ হয়ে তারই অপেক্ষায় বসে থাকত।

ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করত, আর চোখ দিয়ে জল পড়ত টপটপ করে। তখন তার কতই বা বয়স, বোধ হয় দশ-এগার হবে। দাদাবাবু কিন্তু তাকে খুব ভালবাসত। ব্রজ দাদাবাবুকে মনে পড়ল তার। লম্বা-চওড়া চেহারা, কালো রং, কিন্তু ভারি ভাল লোক। কতদিন তাকে খাবার কিনতে পয়সা দিয়েছেন, কতদিন তার জন্য গিন্নীমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, গিন্নীমা ভারী খিটখিটে ছিল—ছেলে অত ভালমানুষ, মা কিন্তু ঠিক উল্টো। যেদিন মায়ের কলেরা হ'ল সেদিনটার কথাও বেশ মনে আছে। তখন রাত

তিনটে হবে। ব্রজ দাদাবাবু কত চেষ্টা করেছিলেন, ডাক্তার ডাকা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—মা মারা গেল, তখন অবশ্য সে বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে।

তার পর ধাক্কা খেতে খেতে, ভাসতে ভাসতে কত জায়গায় না গিয়ে ঠেকল! আরামবাগের দত্তদের বাড়ীর কথা মনে হলে এখনও তার গা শিউরে ওঠে। প্রথম থেকেই সে লক্ষ্য করেছিল সেজবাবুর রকম সকম ভাল নয়—না হয় তোমরা বড়লোক, না হয় তোমাদের বাড়ি দাসীবৃত্তি করতে এসেছি, তা বলে কি আমার লজ্জা-ঘেন্না থাকতে নেই। কত রকম ভাবে যে তাকে সামনে, পিছনে, নিজে অপর লোক দিয়ে বারবার লোভ আর ভয় দেখান হয়েছে, সেকথা এখনও সে ভোলে নি।

কিন্তু আরামবাগের সেজবাবুর চাইতে কলকাতার সেনসাহেব আরও মারাত্মক, আরও ভয়ানক। সেনসাহেবের স্ত্রী খাটের ওপর দিনরাত্রি শুয়ে থাকত। বুকের কি যেন অসুখ, বড় বড় ডাক্তার আসত-যেত। নার্স, ঝি তাকে দেখা-শোনা করত, আর সেনসাহেবের ছেলের ভার ছিল তার ওপর। সাত বছরের ছেলে, কিন্তু তাকে যেন হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ত। ঐটুকুন ছেলে, গায়ের জোর কি, আর তেমনি দুরন্ত। সামাল সামাল করে তার সারাটা দিন কাটত, কিন্তু ছেলেটা তার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে যেত না, রাতেও তাকে না হলে তার চলত না। কোলের কাছে, মাথাটা বুকের মধ্যে দিয়ে তবে ঘুমত। বেশ ছিল, সব ভুলে গিয়েছিল, দুঃখের জ্বালা বুকের মধ্যে, অপমানের বেদনা, সব ঐ দুষ্টু ছেলেটা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার যে পোড়াকপাল! যাকে আঁকড়াতে চায়, যে কুটোটা ধরে ভাসতে চায়, সেইটাই অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারাজীবন হয়তো সে সেনসাহেবের বাড়ীতেই কাটিয়ে দিতে পারত, তা তো হ'ল না, সেনসাহেব নিজেই যে বাদ সাধলেন! সেনসাহেব লাল রঙের লম্বা লম্বা ডোরাকাটা পায়জামা পরত। দাঁতগুলো বেশীর ভাগই বাঁধানো। বেশ ফর্সা দোহারা চেহারা। ঘাড় আর কানের উপরের চুলগুলো সাদা। বাপের মত তাকে ভক্তি করত, ভয় করত মাধবী। শেষকালে কিনা সেনসাহেবও! আরামবাগের সেজবাবুকে তবু চেনা যেত কিন্তু সেনসাহেবকে চেনবার উপায় ছিল না। মুখোস পরে একটা রক্তলোভী বাঘ যেন তাকে

আড়াল থেকে প্রতিক্ষণ লক্ষ্য করত। সেদিন সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকারে ড্রয়িংরুমে যখন তাকে আচমকা জড়িয়ে ধরেছিল, তখন সে কিছুই বুঝতে পারে নি, ভাবতেই পারে নি যে, সেনসাহেব নিজেই তাকে অলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে। দাড়িগোঁফ-চাঁচা তোবড়ানো মুখটা যখন তার মুখের ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসছিল তখন মাধবীর হুঁশ হয়েছিল! বেশ মনে আছে সেনসাহেবের তখনকার মুখের চেহারাটা। ঠোঁটের একদিকটা উঠে গিয়ে বাঁধানো দাঁতের একটা অংশ বেরিয়ে রয়েছে, হিংস্র জন্তুর লোভ আর নিষ্ঠুরতা মেশানো একটা বীভৎস ছবি। এখন মনে পড়লে শিউরে উঠে মাধবী। অন্য কোন উপায় ছিল না মাধবীর, প্রাণপণে সে সেনসাহেবের থুৎনী ধরে উলটে ফেলে দিয়েছিল। মার্বেলের মেঝেতে সটান লম্বা হয়ে সেনসাহেব পড়েছিল, আর দু'পাটি বাঁধান দাঁত মুখ থেকে খুলে ছিটকে বারান্দায় গিয়ে পড়েছিল। প্রথমে ভয় হয়েছিল মাধবীর—লোকটা মরে গেল নাকি? তারপর বুঝেছিল, অপ্রত্যাশিত আঘাতে সেনসাহেব হতভম্ব হয়েছিল মাত্র, মারাত্মক কিছু নয়। সামান্য একজন দাসী যে কৃতার্থ না হয়ে এভাবে সক্রিয় প্রতিবাদ করবে, এ ধারণা হয়তো তার ছিল না! তারপর আর এক মুহূর্তও দেরী করেনি, ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে আবার অজনা পথে নেমে পড়ল সে।

ছেলেটা কার হাতে খায় কে জানে? কার বুকে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে, দুষ্টু দামাল ছেলেটার কথা আর কেউ কি বুঝতে পারবে? অন্যায় আবদার করবে, হয়তো রাগ করে খাবে না—মাধবীর চোখ জলে ভরে উঠল।

স্বামিজী কিন্তু এত অল্পে বিচলিত হন না। অনেক রকম অভিজ্ঞতাই তাঁর আছে। তা ছাড়া স্ত্রীলোকের চোখের জল এর আগে বহুবার দেখেছেন, আর এ রকম অবস্থায় সকলেই প্রথমে একটু মিইয়ে পড়ে, পরে আবার ঠিক হয়ে যায়। কলকাতা, বরানগর, কামারহাটিতে সব জায়গায়ই তিনি এই ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছেন।

মাধু, তুমি ভুল বুঝছ, আর তা ছাড়া তোমার এখনও সময় হয় নি। উদাসীন ভাবে বললেন স্বামিজী।

সময় হয় নি?

না।

কিসের ?

ইষ্টলাভের। সময় না হলে আমি যতই চেষ্টা করি না কেন—হবে না! এ বড কঠিন জিনিস—সাধনা চাই। বোঝবার দরকার নেই কিছু, শুধু আমার আজ্ঞা পালন করবে, গুরুবাক্য বেদবাক্য, বুঝলে মাধু?—বেদবাক্য।

কিন্তু আরামবাগের সেজবাবু, কলকাতার সেনসাহেব ?

হাসলেন স্বামিজী—অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের হাসি, কিসে আর কিসে, তারা আর আমি? বাঁ হাতের অনামিকা দিয়ে তিনি নিজের বক্ষ স্পর্শ করলেন, চোখ বন্ধ করে মৃদু মৃদু দুলতে লাগলেন, নিজের সুখের জন্য তারা তোমায় চেয়েছিল মাধু। তোমার দেহের উপর তাদের লোভ ছিল—কিন্তু আমি? আমি কে? একটু চুপ করলেন স্বামিজী—মূর্খ বালিকার অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন। ধীর-মধুর কণ্ঠে আবার বললেন:

মাধু, আমি সেই, তাকিয়ে দেখ আমি সেই। যাঁর জন্য মানুষ সব ছেড়ে দিতে পারে, যাঁর দর্শনের জন্য পৃথিবীর সব চাইতে দামী জিনিসও উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না—আমিই সেই। বাঁশী ধরার মুদ্রাটি আবার নকল করলেন স্বামিজী।

কিন্তু আমি কি করব? আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলে মাধুরী।

আমার আদেশ পালন করবে, তা হলেই সব হবে। আশ্বাস দেন স্বামিজী।

বাবাজী! সিধু গাঙ্গুলীর গলা।

ইস্, বুড়োটা আর সময় পেল না! বিরক্ত হলেন স্বামিজী, প্রত্যেক ব্যাপারে আহাম্মক লোকটা একটা-না-একটা ব্যাঘাত ঘটাবেই। কিন্তু উপায় নেই, সিধু গাঙ্গুলীকে হাতে রাখা দরকার। ভোলা মাড়োয়ারীর টাকার কিছুটা না পেলে তো মুশকিল, আর তা ছাড়া আশেপাশে নতুন নতুন লোকের মুখ দেখা যাচ্ছে—বেশ সন্দেহের কথা। নাঃ, অত সহজে ভয় পান না স্বামিজী, তবে সাবধানের মার নেই। স্বামিজী বেরিয়ে এলেন।

বাবাজী কি ধ্যানে বসেছিলেন নাকি? সিধু গাঙ্গুলীর ধূর্ত খ্যাঁকশিয়ালের মত মুখটায় চাপা হাসি ফুটে উঠল।

না; এই নতুন শিষ্যাকে উপদেশ দিচ্ছিলাম। স্বামিজী লক্ষ্য করলেন বৃদ্ধ সিধু গাঙ্গুলী নানারকম ভাবে চেষ্টা করছে ঘরের ভেতরটা দেখবার জন্য।

চল ওদিকে। স্বামিজী সিধু গাঙ্গুলীকে নিয়ে অদূরে নিমগাছের তলায় দাঁড়ালেন।

কি ব্যাপার?

ব্যাপার সুবিধের নয়।

কেন?

আপনি ঠিকই বলেছিলেন, লোকটা এ গ্রামের নয়।

তাই নাকি? চিন্তিত হলেন স্বামিজী।

তবে একটা খবর পেয়েছি।

কি?

বোধ হয় পুলিসের লোক?

এ্যাঁ, সে কি? স্বামিজী ভয় পেয়েছেন বলে মনে হ'ল।

অবশ্য সঠিক এখনও জানা যায় নি। সিধু গাঙ্গুলী স্বামিজীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করলে।

ওঃ, তাই বল। স্বস্তিব নিশ্বাস ফেললেন স্বামিজী, আচ্ছা ওদিককার কি হ'ল?

কোনদিককার স্বামিজী? বোসেদের বৌটাব কথা বলছেন? আড়চোখে খ্যাকশিয়াল স্বামিজীর দিকে তাকিয়ে রইল।

না হে না, আমি ভোলা মাড়োয়াবীর কথা বলছি।

ওটি একটি রাম ঘুঘু—সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সিধু, দোষটা তোমার।

আমার?

হ্যাঁ।

কেন, মহারাজ? ভোলা মাড়োয়ারীকে আমি তো অনেকবার বলেছি, তবে ওর তেমন গা দেখছি না। যতই বলি ততই এড়িয়ে যায়, বলে, "ও ঝুট বাত।" আর তা ছাড়া নোট ডবলের কথা আজকাল বড় জানাজানি হয়ে গেছে। কাগজে প্রায় লেখে কিনা।

তা হলে তোমারই লোকসান।

কথাটা ঠিক বুঝলাম না তো প্রভু!

ওটা আমি তোমার জন্যই করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। নিমগাছের

মগ ডালটার দিকে তাকিয়ে স্বামিজী আলতোভাবে কথাটা শেষ করলেন।

আমার জন্যে? বলেন কি প্রভু?

হ্যাঁ, তোমার জন্যেই—

সবটাই? খ্যাঁকশিয়ালের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল।

হ্যাঁ, সবটাই। নির্লিপ্ত গলায় স্বামিজী উত্তর দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সিধু গাঙ্গুলী। খ্যাঁকশিয়ালের মুখের ধূর্ততার ছাপের সঙ্গে লোভাতুর দৃষ্টিটা একসঙ্গে মিলে গেল।

আমি ভুল বুঝেছিলাম প্রভু, আমায় ক্ষমা করবেন। ভক্তিতে সিধু গাঙ্গুলী স্বামিজীর পায়ের তলায় লুটিয়ে প্রণাম করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

স্বামিজীর দৃষ্টিটা নিমগাছের মগডাল থেকে নেমে অপসৃয়মান সিধু গাঙ্গুলীর শুষ্ক দেহের উপর পড়ল—স্বামিজীর কপালের তীর্যক ক্ষতচিহ্নটা অকস্মাৎ বেগুনী রং ধারণ করল।

মাধবী আর যুদ্ধ করেনি—করার উপায়ও ছিল না! কত দিন এড়িয়ে যাবে? ধারাল নখ আর দাঁত নিয়ে কুকুরগুলো মাংসের আশায় ওঁৎ পেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটাকে পাশ কাটালে আর একটা, তার পর আর একটা, তার চেয়ে শেষ হয়ে যাক। অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হতে পারবে সে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া কি অত সহজ নাকি? আরামবাগে দত্তবাবুদের বাড়ী, কলকাতার সেনসাহেবের বাড়ী এবং আরও অনেক জায়গাতে নিশ্চিন্ত হতে সে বহুবারই চেয়েছে।

সে যাই হোক, ভোলা মাড়োয়ারী তার পরদিনই এসে ধর্ণা দিলে। লোভ সব মানুষেরই থাকে, ভোলা মাড়োয়ারীরও ছিল। সিধু গাঙ্গুলীর ধূর্ততা আর মাড়োয়ারীর ব্যবসা-বুদ্ধি দুটোই ভোঁতা হয়ে গেল লোভের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। আশ্রমে এসে ভোলা মাড়োয়ারী খবর পেল ঠাকুর ধ্যানে বসেছেন, দেখা হবে না। এর পূর্বে ভোলা মাড়োয়ারী যতবার স্বামিজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে এসেছিল কোনবার নিরাশ হয় নি। অসময়ে স্বামিজীর ধ্যানমগ্ন অবস্থা তার চাঞ্চল্য বাড়িয়ে দিলে।

কেন দেখা হবে না? কি মুশকিল, প্রত্যেকবার দেখা হয়, এবার দেখা না হবার কারণ কি? আশ্রমে ভোলা মাড়োয়ারীর দান তো কিছু কম নেই।

আমার নাম করে গিয়ে বল, তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। দূত আবার ফিরে এল, না দেখা হবে না। ভোলা মাড়োয়ারী প্রায় মূর্চ্ছা যায় আর কি? যদি না দেখা হয় তা হলে? শ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে এল।

স্বামী স্বরূপানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে কোনদিকে তাকালেন না, উঠান পার হয়ে নিমগাছের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। চকিতে ভোলা মাড়োয়ারী এসে তাঁর পায়ের উপর পড়ল। বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন স্বামিজী।

কে? ভোলা!

হ্যাঁ মহারাজ, হামাকে দয়া করুন। আর্তস্বরে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল ভোলা।

কেন? হ'ল কি, অসুখ-বিসুখ নাকি? শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন স্বামিজী।

না মহারাজ, হামাকে দয়া করুন।

ওঠ ওঠ, পা ছাড়—কি মুশকিল! কি হয়েছে খুলে বল, অত অধীর হচ্ছ কেন?

পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভোলা মাড়োয়ারী। তার পরে হাত জোড় করে বললে, মহারাজ, হামার টাকার বহুত দরকার। গিয় সাল সাতসট্ট হাজার রুপিয়া খালি পাটে লোকসান গেছে। এবার ভি তিরিশ হাজার তিসিতে যাবে।

গোবিন্দ, গোবিন্দ! সবই তাঁর ইচ্ছে।

হাঁ মহারাজ, ও বাত ত সহি আছে, লেকিন আপনি যদি কিরপা কবেন।

আমি, আমি কি করব? সামান্য মানুষ আমি, আমার ক্ষমতা কোথায়?

না মহারাজ, আপনার ক্ষমতা বহুত আছে, ও খবর হামি জানে।

ভোলা মাড়োয়ারী যাকে নির্ঘাৎ ফাঁদ বলে তাতেই ধরা পড়বার জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এর নাম হ'ল বিজ্ঞাপন—বিংশ শতাব্দীর সব অঘটনের মূলে রয়েছে এই বিজ্ঞাপনের কৃতিত্ব। স্বামিজী কিন্তু সবই জানেন। ভোলা মাড়োয়ারীর আগমনটা বস্তুতপক্ষে তিনি অনুমান করেছিলেন. এখন শুধু একটু খেলিয়ে নিতে ইচ্ছে হ'ল তাঁর। বঁড়শিটা বেশ ভালভাবেই গাঁথা দরকার—লেজের ঝাপটা দিয়ে পালিয়ে না যায়। মৎস্যকুলের মধ্যে ভোলা মাড়োয়ারীকে রক্তচক্ষু রোহিত বলা যায়।

স্বামিজী আবার নিমগাছের মগডালের দিকে তাকালেন।

ক্ষমতা! বললেন তিনি, কীটাণুকীট, দাসানুদাস আমি—আমার আবার ক্ষমতা! যাও ভোলা, ধীরে সুস্থে বাড়ী গিয়ে ঠাণ্ডা হও, আজেবাজে কথা ভেবো না। গোবিন্দ, গোবিন্দ! কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তিনি, ভোলা মাড়োয়ারী নাছোড়বান্দা। স্বামিজীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল আবার।

আঃ কি বিপদ! বিরক্ত হলেন যেন স্বামিজী।

হামাকে কিরূপা করুন মহারাজ। ডুকরে কেঁদে উঠল ভোলা।

আচ্ছা, আচ্ছা, ওঠ। এস এদিকে, ঠাণ্ডা হয়ে বস এখানে। দাওয়াতে বসলেন নিজে, সম্ভ্রমে ভোলা অদূরে দাঁড়িয়ে রইল।

বল কি হয়েছে, শুনি। স্বামিজীর গলার স্বর নির্লিপ্ত।

হামারা কিছু রুপিয়া চাই মহারাজ!

টাকা?

হাঁ।

কিন্তু আমি ত সাধু-সন্ন্যাসী লোক, আমি টাকা পাব কোথায়?

আপনি ইচ্ছা করলেই হয়।

কি বাজে বকছো ভোলা, তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।

হাঁ মহারাজ, হামি জানি টাকা আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন—আপনি যোগী মহাপুরুষ আছেন।

হুঁঃ। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন স্বামিজী নিমগাছের দিকে।

তুমি জানলে কি করে? সে ত অনেকদিন আগেকার কথা। শোন তবে—বদরিকা আশ্রমে নিরঞ্জন শর্মা তীর্থ করতে গেছল। পথে হঠাৎ আমার খুব শরীর খারাপ হ'ল, প্রায় চলৎশক্তিরহিত। তখন ওরা স্বামিস্ত্রী দুজনে খুব সেবা করলে আমার। ভাল হয়ে তীর্থদর্শনও করতে পারলাম। তখন আমি খুশী হয়ে তাদের কাছে যা টাকা-গয়না ছিল মন্ত্রপূত জল দিয়ে ডবল করে দিয়েছিলাম বটে। কিন্তু এ খবর তুমি জানলে কি করে?

হাঁ মহারাজ, হামি জানে, আপনি কিরূপা করুন, সিদ্ধ-যোগী আপনি।

অন্যায় ভোলা, এ অন্যায়! তুমি বলছ কি! এ বিভূতি অভ্যাস করলে আমার যে মহাপাতক হবে। না না, এ অসম্ভব।

উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। স্বামিজীর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান অতলস্পর্শী, এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেলে মূল্য কমে যাবে, এমনকি সন্দেহ পর্যন্তও হতে পারে।

মহারাজ, হামি আপনার বেটা, আমাকে কিরূপা করুন। ভোলা মাড়োয়ারীর সেই এক কথা, দুর্জয় লোভের হুতাশনে স্বামিজীর মনস্তাত্ত্বিক প্যাচ ঘৃত সংযোগ করল। স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন স্বামিজী —দৃষ্টিটা এখনও নিম গাছের দিকে। মানসচক্ষে ভোলা মাড়োয়ারীর ভবিষ্যৎটা দেখে নিলেন যেন।

লোভ ভাল নয় ভোলা, বিপদ হতে পারে।

না মহারাজ, লোভ নয়, বহুত জরুরী দরকার। আর বিপদ কি হবে? আপনি নিজে আছেন, আমার ভয় কি?

বেশ, তা হ'লে সামনের অমাবস্যার দিন কিছু এনো। অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন তিনি।

কত আনব মহারাজ? ভোলা মাড়োয়ারীর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল।

এই দু'এক শ'। তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন স্বামিজী।

না মহারাজ, হামার কাছে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার রূপিয়া আছে।

অত কি হবে? স্মিতহাস্যে মুখ উজ্জ্বল হ'ল স্বামিজীর।

আর পাঁচশ' ভরি সোনা ভি—

বেশ তাই এনো। অগ্রাহ্যভরে উত্তর দিলেন তিনি, হাঁ, আর গোটাকতক জিনিস চাই।

হুকুম করুন মহারাজ।

দুটো কালো হাঁড়ি, সাতটা কড়ি, তিনটে রুপোর টাকা, একখান মেটে সিঁদুর, আর লালপাড় শাড়ী একখানা।

আচ্ছা মহারাজ। ভক্তিভরে প্রণাম করে হৃষ্টচিত্তে চলে গেল ভোলা মাড়োয়ারী।

নাঃ আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে নিতে হবে, বেশী দেরী করলে সব দিক দিয়েই বিপদ, নিজের জালে নিজে জড়িয়ে না পড়ি। মাধুকে করায়ত্ত করতে দেরী হবে না, আর একটু খেলিয়েই তোলা যাবে। বাকি রইল ভোলা মাড়োয়ারীর টাকা আর ঐ খ্যাকশিয়ালটা।

এবারে পশ্চিম দিকে লম্বা পাড়ি দিতে হবে, টাকা কিছু যোগাড় হচ্ছে যখন তখন আর ভাবনা কি ? মনে মনে সব ভেবে নিলেন স্বামিজী। বরানগরের ব্যাপারটা নিয়ে পুলিস অনেকদিন তার পিছু নিয়েছে—সেকথা স্বামিজীর অগোচর নেই। জন্তু বিশেষের মত স্বামিজীর ঘ্রাণশক্তি প্রবল। বিপদের সঙ্কেত তিনি অদ্ভুত উপায়ে জানতে পারেন। সেইজন্য একবার নয়, বহুবার তিনি পিছলে পালিয়ে আসতে পেরেছেন।

নির্দিষ্ট দিনে এবং ঠিক সময়ে ভোলা মাড়োয়ারী একটা স্যুটকেস নিয়ে এল। তার কিছু আগেই সিধু গাঙ্গুলী এসে গেছে। নিমগাছের পাশের ঘরটায় তাকে সঙ্গোপনে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। দরজাটা বন্ধ করে একটু ফাঁক দিয়ে খ্যাঁকশিয়াল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উঠোনের অপরদিকের ঘর এবং মন্দিরের দিকে। মাধবী কয়েকবার এই রাস্তায় যাতায়াত করল।

না! স্বামিজীর পছন্দ আছে, কোথা থেকে যে যোগাড় করে কে জানে! একবার টাকাটা হস্তগত হোক, তারপর সব আস্তে আস্তে মুঠোর ভেতর এসে যাবে। ভণ্ডটা শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁকি দেবে না ত ? না, ফাঁকি আর দেবে কি করে ? নিজেই যখন সে হাজির রয়েছে।

মাধবী একটা রেকাবী আর একটা গেলাস নিয়ে এদিকে আসছে। চলার লোভনীয় ভঙ্গিটা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করছে সিধু গাঙ্গুলী—আঃ যেন একটা ছবি। স্বামিজীর পছন্দের তারিফ করতে হয়। উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা দ্রুতগতিতে চলতে লাগল।

মাধবী ঘরে ঢুকল—

এটা খেয়ে নিন ? মাধবীর মুখে সূক্ষ্ম হাসির ছোঁয়াচ রয়েছে যেন।

কি এটা ? খ্যাঁকশিয়ালের লোভাতুর দৃষ্টিটা মাধবীর উপর নিবদ্ধ। সে যেন চোখ দু'টো দিয়েই মাধবীর দেহ-সৌষ্ঠবটা আস্বাদ করার চেষ্টা করছে।

গোবিন্দজীর প্রসাদ। মাধবীর দৃষ্টিতে কৌতুক মেশান।

আর ওটা ? খ্যাঁকশিয়াল মাধবীকে আটকে রাখতে চায়, যতক্ষণ পারে।

এটা ঠাকুরের চানজল, বললে মাধবী। অপর পক্ষের অবস্থাটা মাধবী বেশ অনুভব করতে পারছে।

আঃ, তুমি একটু বসবে না ? উত্তেজনায় সিধু গাঙ্গুলীর সর্বশরীর কাঁপছে।

আপনি আগে খেয়ে নিন, তার পর বাসনগুলো রেখে আসছি। মাধবীর

কথা বলার ভঙ্গীটা মনোরম। স্বামিজীর শিক্ষার গুণ আছে। এ ক'দিনেই মাধবীর বেশ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। সিধু গাঙ্গুলী প্রসাদ ও চানজল নিঃশেষ করলে।

আসছি। ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলে দ্রুতপদে মাধবী উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল। কাপড়ের কোঁচা দিয়ে খ্যাকশিয়াল মুখটা মুছে নিলে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা নিঃসরণ হচ্ছে তার।

সিধু গাঙ্গুলী অনেক দেখেছে কিন্তু এমনটি আর চোখে পড়ে নি। মাধবী এখনও আসছে না কেন? দরজার ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সে। মাথাটা যেন হঠাৎ ঘুরে উঠল তার। পায়ের তলায় মেঝেটা যেন দুলে উঠল, ধীরে ধীরে যেন চোখের উপর অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বজ্রমুষ্টিতে তার শ্বাসনালী যেন কে টিপে ধরেছে। চীৎকার করতে চেষ্টা করলে সিধু গাঙ্গুলী, গলা দিয়ে কিন্তু কোন আওয়াজ বার হ'ল না!

চানজলের মাহাত্ম্যে ও-ঘরে ভোলা মাড়োয়ারী আর এ-ঘরে সিধু গাঙ্গুলী অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে দুটো ঘরে তালা বন্ধ করে স্বামী স্বরূপানন্দ ব্যাগ এবং মাধবীকে সঙ্গে করে দ্রুত মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রথমেই হাওড়া ষ্টেশনে যেতে হবে।

অনেক খুঁজে এবং ভেবে-চিন্তে রবীন উত্তরপাড়ায় একটা বাসা নিয়েছিল। কলকাতায় সব জিনিসেই যেন আগুন লেগেছে। একটা ঘরের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। কিছু কম করার কথা বললে বাড়ীর মালিকের দৃষ্টিটা এত স্পষ্ট হয় যে, কিছু বলার দরকার হয় না। নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে লিলিপুট-অধিবাসী বামনের মত হয়ে তার পাশে নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সুতরাং রবীন কলকাতার দিকে চেষ্টা না করে আশপাশে বাসা খোঁজার চেষ্টা করেছিল। তার মত সামান্য একজন চাকুরে বাড়ী ভাড়ার জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে খাবে কি?

আর শুধু তো সে নিজে নয়! মীরা আছে, মিণ্টু আছে, তাদের জন্যই তো ভাবনা। মামা তাঁর কাজ করে সরে পড়েছেন—এখন সামলা তুই! এ যুগে এত অল্প বয়সে মামা যে কেন বিয়ে দিলেন তাঁর, তা সে বুঝতে পারে না। অবশ্য বিয়ের সময় অমতও সে কিছু করে নি। মামার মতে বিয়ে করা তার

পক্ষে নাকি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এখন মনে হয় কিছুদিন পরে করলেই চলত। স্ত্রী হিসাবে মীরা সত্যিই আদর্শ। ওদিক দিয়ে অভিযোগ করার মত তার কিছু নেই, বরঞ্চ অল্প আয়ে মীরা তার ছোট্ট সংসারটিকে এই কয়েক বৎসরেই বেশ ভালোভাবেই চালিয়েছে। মেয়েটা হয়েছে এক নম্বরের দুষ্টু। এই পাঁচ বছরের মধ্যে এমন পাকা পাকা কথা শিখেছে যে, শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বাবু! মিণ্টু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

উঃ। রবীন হিসাব মেলাচ্ছে, খাতায় লিখে রাখছে কোথায় কোথায় গিয়েছিল। দেশাই লেবরেটারীজ-এর মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ সে। ডাক্তারবাবুদের সঙ্গেই তার কাজ। প্রত্যহ এক-একটি এলাকায় বিভিন্ন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাকে দেখা করতে হয়। দেশাই ল্যাবরেটারীজ-এর ওষুধ যে সর্বগুণসমন্বিত এ বিষয়ে ডাক্তারবাবুদের কাছে সে অনর্গল বলে যেতে পারে—"ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড স্যার, আপনি একবার হস্‌পিটালের রিপোর্টটা দেখুন। দেশী-বিদেশী প্রত্যেক ঔষুধের তুলনায় এর এফেক্টটা লক্ষ্য করুন। হিমোগ্লোবিন পারসেন্‌টেজটা দেখেছেন? এ্যাবসলিউটলি কনভেন্‌সিং, আর দামটাও বিবেচনা করুন স্যার। আমাদের গরীবের দেশে বেশী পয়সা ক'জন খরচা করতে পারে বলুন!"

বাবু!

সবারই ধৈর্যের সীমা আছে, আর মিণ্টুও মানুষ তো?

হুঁঃ। কি বলছ বল? পেনটা পাশে রেখে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলে রবীন। 'চারমিনার'—দামও সস্তা তামাকটা খাঁটি। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট সন্তর্পণে বার করে রবীন কয়েকমুহূর্ত সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে রইল। এক দিকটা ধীরে ধীরে দেশলাইয়ের ওপর ঠুকে আলতোভাবে ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। সিগারেট খাওয়ার সময় শুধু নয়, অন্য যে কোন কাজ করবার সময়ও রবীন সেটাকে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করে। ভঙ্গীগুলো তার সবল, কিন্তু শিল্পীর ছোঁয়াচ থাকে তাতে। 'চারমিনার' সিগারেটের নীলচে ধোঁয়াটা তার নাসারন্ধ্রের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

বাবু!

হ্যাঁ, বল ?

বলছি, তুমি অত লম্বা কেন বাবু ?

লম্বা ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, লম্বা। তাই তো, চিন্তিত হ'ল রবীন, তার দীর্ঘতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেউ তো স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করেছে বলে তো তার মনে পড়ে না।

আমি কিন্তু জানি, মিণ্টু তার অভিমতটা জানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়।

কেন বল তো ?

তুমি যে সাহেব, তাই অত লম্বা। কঠিন হেঁয়ালীর উত্তরটা অতি সহজেই মিণ্টু প্রকাশ করলে।

কে বললে ?

কেন, মা আবার কে ?

কি বলেছে বল তো ? তার সম্বন্ধে মীরার মতামতের দাম আছে বৈকি !

মা সেদিন বলেছে, আমি কি তোমার বাবুর মত সাহেব ?

এর পর রবীনের দীর্ঘাকৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় কারণ খোঁজার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে না। কথাটা কোন প্রসঙ্গে মীরা অবতারণা করেছে তা সে জানে না, তবে মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ হিসাবে তাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতে হয়। দৈনিক নিয়মিত ক্ষৌরকর্ম করা, ধোপ-দুরস্ত স্যুট পরা, রং-মেলানো টাই বাঁধা, এসব তার চাকরীর পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ বলা যায়।

অনেক কষ্টে এই চাকরীটা যোগাড় করা গিয়েছে। খবরের কাগজ দেখে দরখাস্তের পর দরখাস্ত লিখে যে পরিমাণ কাগজ কেনা হয়েছে তাতে টিটাগড় পেপার মিলস্-এর লভ্যাংশ অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল বলে রবীনের মনে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন এম-এল-এ-দের বাড়ীতে নিয়মিত ধর্ণা দেওয়া, তাঁদেব স্তবগানে মুক্তকণ্ঠে যোগদান করা সত্ত্বেও সরকারী বেকার-নীতি তার পক্ষে অনমনীয় হয়েই রইল, অবশ্য দিল্লীর কোন একটি সরকারী অফিসে একটি ইণ্টারভিউ যোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু নিজ ব্যয়ে দিল্লী পরিভ্রমণের মত অবস্থা না থাকায় রবীন রাজধানীর দিকে আর অগ্রসর হতে পারল না। সেই কারণে দেশাই-লেবরেটারীজ-এর মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজ খালি আছে এই সংবাদ পেয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসে নানুভাই দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গেই যখন চাকরিটা হয়ে

গেল তখন ধরাধামে স্বর্গরাজ অবতীর্ণ হয়েছে বলে রবীনের কাছে মনে হ'ল বৈকি।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজ ডাক্তারবাবুদের নিয়ে, সুতরাং রবীন কালবিলম্বিত না করে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সুরু করে দিলে। ডাক্তারদের সম্বন্ধে রবীনের ধারণা অন্যরকমের ছিল। স্বল্পবাক, স্থির ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এ্যাণ্টিসেপটিক লোসান, ডেটল ও কার্বলিক সাবানের গন্ধমিশ্রিত অবাস্তব পরিবেশকে সে সর্বদা দূরে রাখাব চেষ্টাই কা এসেছে, কিন্তু কিছুদিন মেশবার পর রবীনের মনে হ'ল ওদের সম্বন্ধে ধারণাটা তাঁর নির্ভুল হয় নি। সম্পর্ক এবং সম্বন্ধ নিকট হলে যে কোন বিষয়েই মতামত পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা সে লক্ষ্য করেছে। এ পর্যন্ত অনেক ডাক্তারের সঙ্গে তাব পরিচয় হয়েছে এবং কয়েকজনের সঙ্গে তার বেশ হৃদ্যতাও হয়েছে, তা থেকে এটুকু সে বুঝেছে যে ডাক্তারেরা আর যাই হোক ভয়াবহ কিন্তু নয়, সুতরাং এই প্রীতির সম্পর্কটা কাজে লাগিয়ে অনেক জায়গায় দেশাই ল্যাবরেটরীর ওষুধ চালু করতে সে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অন্য ধরনের ডাক্তারও আছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তাকে কারণে অকারণে ওষুধ সম্বন্ধে নানা উপদেশ বর্ষণ করেছেন এবং অসাধারণ জ্ঞানসুলভ ভঙ্গীতে দোষ-ত্রুটির কথাও উল্লেখ করতে ছাড়েন নি। এঁদের হাতে প্রচুর অবসর সময় আছে বলে রবীনের মনে হয়েছে, সে কারণে তাঁরা যে স্বতঃই একটু ছিদ্রান্বেষী হয়ে পড়বেন এ আর আশ্চর্য কি।

যাই হোক, কিছুদিন কাজ করার পর রবীনের মনে হ'ল পূর্বের স্বর্গরাজ্যটা যেন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দেশাই ল্যাবরেটরীজের ওষুধ সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুদের বিরুদ্ধ সমালোচনা কিংবা তাচ্ছিল্য প্রকাশ তাকে নিরুৎসাহ করতে পারে নি কিন্তু আপিসের মন্তব্যে অনেক সময় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবার মত হয়েছে। তাদের অক্ষমতা এবং অকর্মণ্যতার জন্যই যে যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধের কাটতি হচ্ছে না, একথা তাকে প্রায়ই শুনতে হয়েছে।

বাবু! মিণ্টু আবার বাবাকে ডাকলে। ডাকটা ঠিক রবীনের কানে পৌছল না। রবীন ভাবছে, একটা ভাল চাকরী পেলে সে যেন বেঁচে যায়। সব দিক দিয়ে যেন সামলানো দায় হয়ে পড়েছে। একদিকে নজর দিলে অন্য দিকে ফাঁকা পড়ে যায়, শতচ্ছিন্ন কাপড়ে জোড়াতালি দেওয়ার মত

হাস্যকর প্রচেষ্টা। পরিশ্রম করতে রবীন কোনদিনই কাতর নয়। কিন্তু সব সময় পরিশ্রম করলেও ফল আশানুরূপ হয় না। ডেলী প্যাসেঞ্জারীর বিড়ম্বনা সে সহ্য করতে পারে কিন্তু ৮-৪৫এর ট্রেন ধরে ১০টার মধ্যে ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌছানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। দেশী কোম্পানী হলেও দেশাই ল্যাবরেটরীজের কর্তৃপক্ষ নিয়মানুবর্তিতাকে কর্মচারীদের বেতন অপেক্ষা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেন।

বাবু! কালা হয়ে গেছে বোধ হয় বাবুটা। ভাবছে মিণ্টু। এর পর মিণ্টুর বিরক্ত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বাবু! আবার ডাকলে মিণ্টু, এবার স্বরটা একটু উচ্চগ্রামে!

উ! সাড়া দিলে রবীন, 'চারমিনার' সিগারেটে শেষ টানটুকু দিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস নিয়ে শেষে বললে—হ্যাঁ, কি বলছ বল।

বলছি যে, তুমি মাকে মীরা বল কেন?

তোমার মায়ের নাম মীরা বলে।

তবে মা তোমায় ওগো বলে ডাকে কেন?

শিশু-মনস্তত্ত্বের কথা রবীন কোনোদিন ভেবে দেখে নি। মাসিক পত্রিকায় ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ চোখে পড়লে সভয়ে সেগুলো এড়িয়ে যায়, কারণ পড়তে চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনের অবস্থাও যে শঙ্কাজনক হয়ে ওঠে, তা সে অনুভব করেছে।

তুমি ইঞ্জিন চালাতে পার? হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালে মিণ্টু, অবশ্য এইটাই তার বিশেষত্ব।

না। ঘাড় নাড়লে রবীন, অক্ষমতা স্বীকার করতে লজ্জা পেলে না সে।

সেকি? আশ্চর্য হয়ে যায় মিণ্টু, তুমি তা হলে একটা বোকা ছেলে। ঐ দেখ, রোজ ঐ লোকটা ইঞ্জিন চালায়।

তাই নাকি? টেবিলে রক্ষিত ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে রবীন, সময় আর বেশী নেই, এইবার তাকে উঠতে হবে।

হ্যাঁ গো, রোজ ও ইঞ্জিন চালায়।

জানালা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে রবীন। লোকটাকে সেও আগে কয়েকবার দেখেছে। মাথায় রুমাল বেঁধে নীল রঙের প্যাণ্ট পরে হাতে এলুমিনিয়মের ডিবেটা ঝুলিয়ে রোজ এই সময়ে লোকটা ষ্টেশনের দিকে যায়।

তুমি কি করে জানলে, লোকটা ইঞ্জিন চালায় ? প্রশ্ন করলে রবীন।

ও যে আমায় নিজে বলেছে। বাবুর অল্পবুদ্ধিতে মিণ্টু রীতিমত অবাক হয়ে যায়। আরও কিছু তার বলবার ছিল, কিন্তু মীরা সেই সময় ঘরে ঢুকল।

কি ? বাপ-বেটি কি পরামর্শ হচ্ছে ? মীরার আঁচলটা কোমরে জড়ানো। রান্নাঘর থেকে সবেমাত্র এসেছে বলে মনে হয়, আগুনের উত্তাপে গৌরবর্ণ মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

জান মা ! বাবু আবার সিগারেট খেয়েছে।

মূল্যবান গোপন তথ্যটা প্রথম সুযোগেই মিণ্টু প্রকাশ করে দিল। আড়-চোখে রবীন মিণ্টুর দিকে একবার দেখে নিল। কন্যার প্রতিভা সম্বন্ধে তার আর কোন সন্দেহ রইল না।

আবার খেয়েছ ? শাসনের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করে মীরা।

না না, ইয়ে। বলার মত কিছু খুঁজে পায় না রবীন।

হ্যাঁ মা ! জোর গলায় সাক্ষ্য দেয় মিণ্টু।

মেয়ের সামনে মিথ্যে কথা বলা যায় না, তা হলে ও তাই শিখবে।

এক প্রস্থ উপদেশ বর্ষণ করলে মীরা—

হ্যাঁ, মানে একটা। কোন দিক দিয়েই নিষ্কৃতি নেই রবীনের।

তাই বলি, ঘরে এমন মড়াপোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে কেন।

মীরা নাসিকার অগ্রভাগ কয়েকবার কুঞ্চিত করলে,—তুমি বসে আছ কেন, ওঠ, চান করতে হবে না ?

যাচ্ছি। স্বরে বিশেষ উৎসাহ নেই রবীনের।

আসবার সময় তিন গজ কোরা মার্কিন আনবে—বালিশের ওয়াড়গুলোর দফা একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

আচ্ছা। সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে রবীন।

মীরার সময়াভাব সুতরাং চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মিণ্টু তখনও আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মায়ের সঙ্গে চলে যাওয়ার ইচ্ছে তার ছিল কিন্তু···

তুমি কেন মাকে বলে দিলে যে আমি সিগারেট খেয়েছি ? অনুযোগের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল রবীন।

বারে, খুব টেনে উত্তর দিলে মিণ্টু, মা যে আমায় বলে দিয়েছে।

কি বলেছে ?

তুমি ক'টা সিগারেট খাও, দেবুকাকার সঙ্গে সিনেমার গল্প কর কিনা, এই সব মাকে বলে দিতে বলেছে যে—যুৎসই উত্তর দিয়ে মিণ্টুর মুখে হাসি ফুটেছে, রবীনও হেসে উঠল।

মীরা একটা জিনিস কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, সেটা হচ্ছে রবীনের সিনেমা যাওয়া। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে গেল অবশ্য আপত্তি নেই, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা গেলেই বিপদ। মীরাকে লুকিয়ে অনেক দিনই রবীন সিনেমা দেখেছে সেকথা ঠিক, কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে ধরাও পড়ে গেল।

সেদিন আপিস থেকে ফিরতে রবীনের দেরী হ'ল। তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল মীরা, দুর্ভাবনাও বেশ হচ্ছিল। তাই রবীন ফিরতেই তার ক্লান্তমলিন মুখের দিকে তাকিয়ে মীরা প্রশ্ন করল, ফিরতে এত দেরী হ'ল যে?

আর বল কেন, ফ্যাক্টরী যাও, গুদোমে যাও, সেখানে থেকে ষ্টেশনে মাল পৌছেচে কিনা খবর নাও, নানা ঝঞ্ঝাট। বিরক্ত ও ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিয়ে চেয়ারের উপর শরীরটা এলিয়ে দিলে রবীন।

ব্যস্ত হয়ে উঠল মীরা, সমবেদনায় ভরে গেল তার মনটা। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রবীনের মাথাতে একবার হাতের তলাটা রাখলে। মীরার আদর করার ভঙ্গীটা একটু অন্য ধরনের। রবীনকে কাছে পেলে তার মাথাটা নিজের কাছে টেনে নেয়, আঙুলের ডগা দিয়ে রবীনের সমস্ত মুখে আলতো ভাবে ধীরে ধীরে বোলায়। চুলের ভেতর আঙুলগুলো মন্থরগতিতে চালনা করে। মীরার ভালবাসার এটা একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশভঙ্গী। রবীন একবার মীরাকে এ বিষয়ে প্রশ্নও করেছিল।

আচ্ছা মীরা, তুমি আমাকে এভাবে আদর কর কেন?

কি ভাবে?

ওই যে, আমার মাথাটা টেনে নাও—

তা নিলেই বা, তোমার খারাপ লাগে?

না তা নয়, তবে যেন মনে হয়—

বুঝেছি। বাধা দেয় মীরা, তোমার মনে হয় যেন একটা ছোট ছেলেকে আদর করছি, না?

হ্যাঁ, হাসল রবীন—তোমায় আমি ঠিক বোঝাতে পারছিলাম না।

থাক্ আর বুঝিয়ে দরকার নেই। অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মীরা

ভালবাসার বিশ্লেষণ করতে দেখলে মীরার রাগ হয়। মার্কেটে শাড়ী কেনার কথা মনে পড়ে যায় মীরার—কাদের তৈরী, কত নম্বরের সুতো, পাড়ের মাপটা মাফিকসই নয়। দুটো জিনিস কি এক নাকি? বিরক্তি লাগে তার, ভালবাসার মনগড়া গল্প শুনতে। অতিশয্যের কৃত্রিমতায় মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে তার। এক রসোত্তীর্ণ কোন শিল্পবস্তু নাকি যে তাকে বার বার তারিফ করতে হবে, আর প্রশংসা করতে হবে উচ্চকণ্ঠে।

নাও ওঠ তো, বললে মীরা, কোট-প্যাণ্ট ছাড়. মুখ যে একেবারে কালো হয়ে গেছে। যাও, হাতে মুখে একটু জল দাও গে, আমি ততক্ষণে এক কাপ চা করে আনি। এই মনোযোগ, এই স্নেহসিঞ্চিত স্পর্শ রবীনের ভাল লাগে, তাকে নিয়ে বিশেষ কেউ ব্যস্ত হয়ে উঠুক এটা রবীন মনেপ্রাণে চায়। অধিকারের প্রশ্ন এটা নয়, চাইলেও হয়তো পাওয়া যায় না, কিন্তু অযাচিত ভালবাসা এই উষ্ণতা তাকে স্পর্শ করে—কোমল, সূক্ষ্ম রেশমের মত তার সর্বাঙ্গে যেন সেটা জড়িয়ে থাকে।

বাথরুমে রবীন ঢুকল, জলের শব্দের সঙ্গে রবীনের গানের গুন্ গুন্ ধ্বনি শোনা গেল। মীরা চা নিয়ে এসেছে। চেয়ারের ওপর কোট আর প্যাণ্ট ফেলে রেখে গেছে রবীন। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে কোট-প্যাণ্ট তুলে নিলে মীরা। রবীন চিরদিনই এইরকম অগোছালো,—কোন জিনিস তার ঠিক নেই। প্রত্যেকটি বিষয়ে মীরাকে নজর রাখতে হয়। হাতে কোটটা তুলে নজর করল মীরা—হ্যাঁ, বেশ ময়লা হয়ে গেছে, কলারে স্পষ্ট একটা ময়লা লাইন রয়েছে। প্যাণ্টটা প্রায় পায়জামার মত হয়ে এসেছে, ক্রীজগুলো অদৃশ্য-প্রায়। মোড়ের অজান্তা ডাইং ক্লিনিং-এ এগুলোকে পাঠিয়ে দিতে হবে কাল। পকেটে যদি কিছু থাকে একবার দেখে নেওয়া দরকার। কোটের পকেটে হাত ঢোকালে মীরা। ডুবুরির মত মীরার আঙুলগুলো পকেটের গহ্বর থেকে কয়েকটা জিনিস উদ্ধার করলে। প্রথমে একটা ট্রামের টিকিট, পরে একটা ওষুধের হ্যাণ্ডবিল, মীরা পড়ে নিল এটা। লেখা আছে—আপনার কি মাথা ঘোরে, উঠিয়া দাঁড়াইলে কি চোখে অন্ধকার দেখেন, কাজে কি আপনি মনঃসংযোগ করিতে পারেন না? লক্ষ্য করিবেন, নিশ্চয় ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে আপনার। ডাক্তারের কাছে যাইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের প্রস্তুত বিশ্ব-বিখ্যাত টনিক লিভভিটস্ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। মন্ত্রবৎ কাজ করিবে।

এক শিশি ২।০ আনা, এক সঙ্গে তিন শিশি লইলে ৬৲ টাকা মাত্র। ১১২নং গুলু ওস্তাগর লেন। একেবারে ছেলেমানুষ, ভাবলে মীরা। স্মিতহাস্থে কাগজটা হাতের তালুতে গোল করে পাকিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিলে সে। আবার পকেটের ভেতরে হাত ঢোকালে, একটা রুমাল, এগুলো কি ? কুচো সুপুরি ও লবঙ্গ, বাঃ এই তো চারমিনার সিগারেটও রয়েছে। ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল মীরার। আর একটা ছোট ভাঁজ-করা রঙীন কাগজ, একি ? মেট্রো সিনেমার টিকিট দুটো —তারিখ দেখে নিল মীরা, হ্যাঁ, আজকেরই বটে, সিনেমা যাওয়া হয়েছিল, তাই এত দেরী হয়েছে। হাতে টিকিট দুটো নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। সমস্ত শরীরে যেন অকস্মাৎ একটা দুর্দমনীয় অবসাদ নেমে এল তার। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, রবীনের শঠতার কথা ভেবে। প্রতারণার ছোট-বড় নেই, আজ সে সামান্য জিনিস নিয়ে প্রতারণা করছে, কাল সে বড় জিনিস নিয়ে ঠকাতে দ্বিধা করবে না নিশ্চয়। শোবার ঘরে মীরা গিয়ে আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল খাটের ওপর। অন্ধকার যেন ব্যথার বন্ধু। নিজের মনকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল মীরার। তীব্র বেদনার আঘাতে যেন ভেঙ্গে পড়ল সে। কয়েক মুহূর্ত আগে রবীনের জন্য মনে যে সমবেদনা আর সহানুভূতি এসেছিল, সে জায়গায় এল প্রচণ্ড দুঃখ আর অভিমান। বাথরুম থেকে এখনও জলের ধারার শব্দ আর রবীনের গানের সুর ভেসে আসছে। রবীনের বেশ ভাল লাগছে। শীতের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ তার লোমকূপ আর মাংসপেশীগুলোকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে, একটা মৃদু অস্পষ্ট যন্ত্রণার আমেজের মধ্যে রয়েছে আনন্দের ইঙ্গিত। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এল রবীন। নজর পড়ল টেবিলে রক্ষিত ধূমায়িত চায়ের কাপটার ওপর।

মীরা! ডাকল রবীন। মীরার সাড়া নেই।

মীরা! আবার ডাকল রবীন ; অপেক্ষাকৃত জোর গলায়।

চায়ের কাপটা তুলে নিলে সে, দেরী হয়ে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে, আর ঠাণ্ডা চা খেলে মীরা খুব রাগ করে। দরজার কাছে মিণ্টু এসে দাঁড়িয়েছে, মুখটা যেন খুব গম্ভীর। রবীনের সংসারের ব্যারোমিটার সে, ঝড় আর মেঘের পূর্বাভাষ—তার মুখেই প্রথম প্রকাশ পায়।

কি হ'ল মিণ্টু, চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন, মা কোথায় ?

মায়ের পেট ব্যথা করছে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের ভঙ্গীটা নকল করল মিণ্টু।

পেট ব্যথা করছে ?

হ্যাঁ, তাই ত কাঁদছে। বললে মিণ্টু, কয়েক দিন আগে তাকেও কাঁদতে হয়েছিল ঐ একই কারণে। ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল রবীন। দ্রুত শোবার ঘরে চলে গেল সে। সত্যিই মীরা শুয়ে রয়েছে খাটের ওপর। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও তার শরীরে অসুস্থতার কোন চিহ্নই তো দেখা যায় নি।

কি হয়েছে মীরা ? রবীনের কণ্ঠস্বরে রীতিমত উদ্বেগ।

কিছু নয়। মুখ ফিরিয়ে নিলে মীরা।

মীরার পাশে গিয়ে বসল রবীন, তার সুডৌল পিঠের ওপর হাতের তালুটা রেখে আবার প্রশ্ন করল, অসময়ে শুয়ে কেন ? কি হয়েছে বল ? রবীনের হাতের উত্তাপটা মীরার পিঠ স্পর্শ করছে, অতি পরিচিত ছোঁয়াচটা।

মনটা দুলে উঠল মীরার, তবু জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কৈ, কিছু নয় তো।

লক্ষ্মীটি, বল কি হয়েছে।

বললাম তো কিছু নয়। মীরার স্বরে বিরক্তির আভাস রয়েছে।

ব্যাকুল স্বরে রবীন আবার সেই একই প্রশ্ন করল। মীরার উত্তরেও কোন তফাত নেই।

মীরার দুর্জয় অভিমানটা এখনও ওর মনের নির্মলতাকে কর্দমাক্ত আর ঘোলা করে রেখেছে, থিতিয়ে উঠতে সময় লাগবে। রবীনের সান্নিধ্য আর তাঁর স্নেহ-কোমল স্বর আবর্তটায় ভাঁটা আনছে যেন। রবীনের প্রশ্ন আর মীরার উত্তর আরও কয়েকবার চলল। রবীনের বক্তব্য বিষয়টি যেমন সীমাবদ্ধ, মীরার উত্তরও তাই। বাবুর পেছনে মিণ্টু এসে দাঁড়িয়েছিল। সেলুলয়েডের ভাঙা পুতুলটা নিয়ে সে মেঝেয় বসে রয়েছে। অপরপক্ষকে জানতে দেওয়া উচিত নয় তার আগমনের কারণটা। প্রতিপক্ষ যদি পুতুল খেলাটাই তার আসার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয় তাহলে সব জিনিসটাই বেশ ভালভাবে সে দেখতে এবং শুনতে পারবে। মীরা রবীনের দিকে তাকিয়ে বললে, তবে কেন বললে আপিসের কাজে আটকে গিয়েছিলে ?

আপিসের কাজেও যাই নি কি ? যুক্তি দেওয়ার একটা বিফল চেষ্টা করে রবীন।

দেরী হওয়ার কারণটা কি আপিস ? ভ্রূ কুঞ্চিত করলে মীরা।

না, তা অবশ্য নয়। টেনে টেনে উত্তর দিলে রবীন। স্বীকার করে নিলে অনেক দ্বন্দ্বেরই অবসান ঘটে সেকথা সে জানে। আত্মসমর্পণের পর আর কোন কথা ওঠা উচিত নয়।

মীরা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রবীনের মুখের দিকে। ভ্রূর কুঞ্চিত রেখাগুলো এখন অদৃশ্যপ্রায়। সিক্ত চোখের দৃষ্টি যেন কোমল হয়ে এসেছে। বর্ষণের পর স্নিগ্ধ অরুণাভাসের ইঙ্গিত।

কার সঙ্গে যাওয়া হয়েছিল ? মীরার স্বরটা এবার নিখাদের।

আর বল কেন। উত্তর দিলে রবীন, জড়তাটা কেটে গিয়েছে। তার এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। আপিস থেকে বেরুচ্ছি এমন সময় ধীরেন ভড় পাকড়াও করলে। বলে, চল, সিনেমায় টিকিট কাটা আছে, যত তাকে বোঝাই, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার প্রয়োজন আছে, ততই সে নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে।—অগত্যা যেতেই হ'ল, কি আর করি বল! তালু দুটো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে রবীন তার অসহায়তার বর্ণনা শেষ করলে।

লোকটাকে দেখলেই আমার খারাপ লাগে, দেখলেই মনে হয় অত্যন্ত অসভ্য আর বেয়াদব, ধীরেন ভড় সম্বন্ধে মন্তব্য করলে মীরা।

ফিল্‌ম ডাইরেক্‌টার কিনা তাই সব সময়ে চোখ খুলে রাখতে হয়; তবে ধীরেন ভড়ের ওপর তোমার রাগ কেন আমি জানি। রহস্যঘন দৃষ্টিতে রবীন মীরার দিকে তাকায়।

কেন বল তো ?

সেই যে একবার ধীরেন ভড় বলেছিল তোমায় ফিল্‌মে নামবার জন্যে, বোধ হয় সেই জন্য।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি ফিল্‌মে নামতে যাব কেন ?

সুন্দরী বলে। আড়চোখে মীরার দিকে তাকিয়ে প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করতে গিয়ে রবীন ধরা পড়ে গেল। হেসে উঠল মীরা।

মিণ্টু উঠে দাঁড়িয়েছে, যেটুকু তার দেখার বা শোনার দরকার ছিল সেটুকু নির্বিঘ্নে দেখা হয়েছে। অবশ্য এ দৃশ্য তার কাছে নূতন নয়, প্রায় সে এটা দেখে থাকে। পুতুলটাকে মেঝের ওপর অনাদৃত অবস্থায় ফেলে রেখে মিণ্টু দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মিণ্টু! ডাকলে রবীন, মিণ্টুকে হঠাৎ সে দেখতে পেয়েছে, মুখটা তার যেন থমথমে। ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল মিণ্টু, স্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে।

এদিকে এস। আদরের ভঙ্গীতে আবার ডাকল রবীন।

গম্ভীর মুখে ঘাড় হেঁট করে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিণ্টু। রবীনের স্নেহ-মাখানো কণ্ঠস্বরে তার মনের কোন পরিবর্তন হ'ল না। শুধু একবার মিষ্টি করে ডাকলেই তো সে যাবে না।

এস মিণ্টু, লক্ষ্মী সোনা! ডাকলে মীরা, মিণ্টুর অভিমানটা ওর চোখে আগেই ধরা পড়েছে। সজল চোখে মিণ্টু ওদের একবার চকিতে দেখে নিলে। ওরা কেন মিণ্টুর দিকে তাকালে না একবার। বাবুটা ভারি দুষ্টু, তাই জন্য তো মাকে সিগারেট খাওয়ার কথা বলে দিতে হয়।

মিণ্টুকে কোলে নিয়ে খাটে গিয়ে আবার বসল রবীন। দুজনে আদরে ডুবিয়ে দিলে মিণ্টুকে। ওটা আগে করলেই হ'ত, ভাবছে মিণ্টু, সে যে অতক্ষণ একলা চুপ করে মেঝেয় বসে রইল সেটা ওরা লক্ষ্যই করল না কেন? তাকে বাদ দিয়ে ওরা দু'জনে ও রকম করে কেন? সবই তার দোষ না কি? বারে…

বাবু! মিণ্টুর ডাক রবীনের চিন্তাস্রোতে বাধা দিলে। ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর পড়ল আবার, কাঁটাটা তার অন্যমনস্কতার সুযোগে যেন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল রবীন।

মীরার হাতের চাঞ্চল্য এখন আরও বেড়ে গিয়েছে। রবীনের আপিস যাবার সময় যত ঘনিয়ে আসে মীরার হাত তত দ্রুতলয়ে চলতে থাকে নিখুঁত শিল্পীর ভঙ্গীতে। দু'জন দু'জনকে যেন টক্কর দিতে চায়; প্রতিযোগিতায় কেউ হটতে চায় না।

মীরা আর মিণ্টু জানালার ধারে এসে দাঁড়াল এবার।

পথে নেমে রবীন তাকালে জানালার দিকে। এটা ওদের প্রতিদিনের অভ্যাস!

বাই বাই, টা টা। হাত তুলে বললে মিণ্টু, সম্প্রতি একথাটা ও নূতন শিখেছে।

মুখের কোণে হাসি দেখা দিল রবীনের, কালো গগলসের ওপর সূর্যের

কিরণটা ঝলসে উঠল। মীরার এই সময়টা বেশ লাগে। দূর থেকে রবীনকে দেখে মীরার মনে হয় যেন ও কত সুন্দর। নববধূর মত লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে তখন সে।

দ্রুতলয়ের ছন্দটা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় রবীনের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শিথিলতা নেমে আসে মীরার সুন্দর বঙ্কিম দেহরেখার মাঝে। ঋজু ভঙ্গীটায় অবসাদের ছোঁয়াচ লাগে যেন। এই সময়টা মীরার খারাপ লাগে। সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলোতে মন বসাবার চেষ্টা করে। একবার ভাঁড়ারঘরে, একবার বা রান্নাঘরে, নয় তো সেলাই নিয়ে বসে। মিণ্টু মায়ের পায়ে পায়ে ঘোরে, তারও ছোট্ট মনটা যেন কুঁকড়ে যায়।

সম্প্রতি পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে মীরার আলাপ হয়েছে। রামধন মুস্তফী পাশের বাড়ীর মালিক। পাটের ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রেণু তারই মেয়ে। রেণুর বয়স মীরার চেয়ে কম কিন্তু বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়ই বলা চলে। রেণু গানের ভক্ত, আধুনিক সঙ্গীত-জগতে গায়কগায়িকাদের গান তো বটেই, এমন কি তাদের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা পর্যন্ত রেণুর অজানা নেই। এদিক থেকে রেণুর জ্ঞান প্রায় গবেষক শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলা চলে। রেণুর এখনও বিয়ে হয় নি, নানা জায়গা থেকে কথা আসছে। সেই নিয়ে ওরা দু'জনে প্রায়ই হাসাহাসি করে। একসময়ে মীরাও সঙ্গীতচর্চা করেছে, এখন অবশ্য অভ্যাস না থাকায় অসুবিধে হয়, তা হলেও তার সুমিষ্ট গলার কদর এখনও অনেকেই করে। সেইজন্য রেণুর সঙ্গে মীরার আলাপটা বেশ ভাল-ভাবেই হয়েছে। রবীন আপিস যাওয়ার পরই মীরা খাওয়া-দাওয়া সেরে রেণুদের বাড়ী যায়। নানারকম আলোচনা ও সঙ্গীতচর্চায় দিনটা একরকম কেটে যায়।

সেদিন দোতলার বারান্দা থেকে রেণু চীৎকার করে ডাকলে, মীরাদি!

কি হ'ল রেণু? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে মীরা।

টেলিফোন।

কার?

আপনার—আবার কার? চোখ ঘুরিয়ে বললে রেণু।

কে করছে বলত? মীরা ভয় পেয়েছে। হঠাৎ টেলিফোন করছে কেন? হৃৎপিণ্ডটা অকস্মাৎ দ্রুতগতিতে চলতে সুরু করে দিল তার।

রবীনবাবুর। আশ্বাস দেয় রেণু।

ভাবছে মীরা—নিজে যখন টেলিফোন করছে, তখন ভালই আছে নিশ্চয়ই। ফিরতে দেরী হবে হয় তো তাই দয়া করে খবরটা দেওয়া হচ্ছে। বোধ হয় সিনেমা কিংবা আপিস-ফেরত কোন বন্ধুর বাড়ী নির্ভাজ আড্ডা। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে মীরা শাড়ীটা গুছিয়ে প'রে নিলে।

মা, আমি যাব। মিণ্টু ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছে, ঝড়ের আগের কুটোর মত। মীরার মুখের উত্তেজনার ছাপটা মিণ্টুর মুখেও প্রতিফলিত হয়েছে। মুস্তফীদের বাড়ী গিয়ে উঠল মীরা আর মিণ্টু। দোতলার সিঁড়িটা উঠতেই মীরা যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। হৃৎপিণ্ডটা সবেগে বক্ষপিঞ্জরে যেন আছাড় খাচ্ছে। মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে তার। কপালের ঘামের আর্দ্রতায় কয়েকটা চুল আটকে রয়েছে, মুখটা হাসি হাসি, কিন্তু মনে আশঙ্কা আর ভয় রয়েছে প্রচুর।

হ্যালো! কানে রিসিভারটা দিয়ে বললে মীরা, হ্যাঁ আমি—রান্নাঘরে ছিলাম—কি? তোমাকে যেতে হবে? কেন?—আজই? কেন অন্যদিন গেলে হয় না?—মালিক গেলই বা—সঙ্গে দেশাই ফিল্‌ম্‌ আর দেশাই ল্যাব-রেটরীজের লোক নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু বুঝলাম, আগে থেকে সেটা জানাবে তো?—হ্যাঁ মিণ্টু এখানেই আছে।

এই নাও মিণ্টু, বাবু তোমার সঙ্গে কথা বলবে। সাগ্রহে মিণ্টু রিসিভারটা কানে দিলে। ছোট্ট মুখের উপর রিসিভারটা বেমানান দেখাল।

হ্যাঁ আমি—না দুষ্টুমি করি নি ত।—তুমি আজ আসবে না? কেন বাবু?—রেলে চড়ে যাবে?—বা! কি মজা! আমাকে নিয়ে চল না? ফেরবার পথে পুতুল আনবে! বাঃ, কি মজা!—হ্যাঁ মাকে দিচ্ছি। বিরক্তিভরে মাকে টেলিফোন দিয়ে দিল। মা-বাবা দু'জনের ওপরই রাগ হল তার। এত তাড়াতাড়ি তাকে টেলিফোনটা দিতে হল কেন; আর একটু বাবুর সঙ্গে কথা বললে কি হত? অভিমানে ঠোঁট দুটো ফুলে উঠল মিণ্টুর। বাবা পুতুল আনবে, ভাবছে মিণ্টু, দম দিলে নাচে, বাঃ! পুতুলের কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি টেলিফোন দেওয়ার দুঃখটা ভুলে গেল সে। ফোলানো ঠোঁটে মিষ্টি হাসি দেখা দিল আবার।

না, আমার আর অসুবিধে কি? বলছে মীরা, কিন্তু তোমার জামা-

কাপড় কিছু নিলে না ত ?—সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে, আমি চিনি ? কে বল তো ?—ওঃ ! ফিলিম অ্যাকট্রেস শ্রীলেখা ?—সময়টা কাটবে ভাল। —না, অত সামান্যতে আমার হিংসে হয় না—হ্যাঁ—না, কি ? যাঃ !

মীরার মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে। টেলিফোনের ওধার থেকে রবীন তাকে ভালবাসা জানাচ্ছে। তার অদর্শনে কত কষ্ট হবে রবীনের সেই কথা আর ফিরে এসে···। টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিল মীরা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিণ্টু।

একদৃষ্টে মায়ের লজ্জারক্তিম মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছে মিণ্টু, মায়ের ভাববৈচিত্র্যের কারণটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তার। রেণু বারান্দার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে, শোনার ইচ্ছে তারও ছিল, কিন্তু অশোভন হবে বলে সে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মীরা টেলিফোনটা রেখে দিতেই রেণু এগিয়ে এসে বললে, কি মীরাদি, সিনেমা নাকি ?

না ভাই, উনি বাইরে যাচ্ছেন আপিসের কাজে।

বাইরে ?

হ্যাঁ, পশ্চিমের দিকে। কোম্পানীর মালিকও যাচ্ছে, তাই সঙ্গে যেতে হচ্ছে।

মালিককে চেনেন নাকি ?

দূর বোকা মেয়ে, আমি চিনব কি করে ? তবে নাম শুনেছি।

কি নাম বলুন তো ?

নানুভাই দেশাই।

দেশাই ফিলম্ যার ?

হ্যাঁ, সঙ্গে ডাইরেক্টর, অ্যাকটর, অ্যাকট্রেস সব যাচ্ছে। কোথায় যেন স্যুটিং হবে।

আপনিও গেলেই পারতেন।

হ্যাঁ, কোম্পানীটা তোমার হলে সে সুবিধে পাওয়া যেত হয় তো।

কবে ফিরবেন ?

বললেন তো এক সপ্তাহ, তার পর কি হয়।

ইস মুশকিল তো। ভ্রূভঙ্গী করলে রেণু।

কেন, মুশকিল আবার কিসের ?

একলা থাকতে হবে—আবার কি? রেণুর কথায় হাসল মীরা। প্রচ্ছন্ন আঁধারের মধ্যে হাসির স্নিগ্ধ রশ্মিটা দেখা গেল, কয়েক পা এগিয়ে গেল সে।

কোথায় যাচ্ছেন মীরাদি। বললে রেণু, এত তাড়া কিসের, সেই গানটা তুলেছি, শুনে যান।

তাই তো, ভাবছে মীরা, আর তো তাড়া নেই। রবীন যে ওবেলা আসবে না। তা হোক, এখন তার কিছু ভাল লাগছে না, কারোর সঙ্গলাভে এখন তার উৎসাহ নেই। এই কি গান শোনার মত সময় নাকি! এখন সে একটু নিরিবিলি থাকতে চায়। আশ্চর্য, বল. নেই কওয়া নেই, অমনি যেতে হবে, এ কি মগের মুলুক নাকি!

না ভাই চলি, অন্য সময়ে তোমার গান শুনব। বললে মীরা।

কেন, কোন কাজ আছে নাকি! নাছোড়বান্দা রেণু।

হ্যাঁ, রান্নাঘরের কাজ বাকি আছে, তা ছাড়া মিণ্টুর দুধটাও জ্বাল দেওয়া হয়নি। অজুহাত দেখিয়ে বাড়ী ফিরে গেল মীরা। ঘরে বসে ভাবছে মীরা। এতক্ষণে ভাববার মত মনের অবস্থা আর পরিবেশ ফিরে পেয়েছে সে। অকস্মাৎ খবরটা পেয়ে সে যেন হতচকিত হয়ে পড়েছিল। আশঙ্কা, লজ্জা আর ভয়ের স্মৃতি এখনও তাকে পীড়া দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ট্রেনে পাড়ি দিতে হবে রবীনকে, কবে ফিরবে কে জানে! ট্রেন সম্বন্ধে মীরার একটা অমূলক শঙ্কা আছে। শুধু ট্রেন নয়, যে-কোন চলমান যানকেই সে ভয় করে। তার কারণ গাড়ীতে উঠলেই তার শরীর খারাপ লাগে। মাথাটা ঘোরে, পেটের মধ্যে যেন গুলিয়ে ওঠে আর বুকের মধ্যে অজানা একটা শূন্যতা অনুভব করে, এমনকি বমনোদ্রেকও হয়। মনে আছে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ওটা একটা স্নায়বিক অসুখ, ওকে নাকি ট্রাভলিং সিকনেস্ বলে। তার খারাপ লাগছে, ট্রেনের কথা মনে পড়তেই সেই ধোঁয়া-ধুলো-কর্ণ-বধিরকারী তীক্ষ্ণ-কর্কশ শব্দগুলো আর গতিবেগটা যেন তার স্নায়ুর ওপর তীব্র আঘাত করল। উঠে দাঁড়াল মীরা। এ চিন্তা থেকে তার নিজেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। রান্নাঘরের দরজাটা খুলল মীরা। মিণ্টুও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মা, বললে মিণ্টু, জান মা, বাবু বলেছে আসবার সময় পুতুলটা আনবে?

তাই নাকি? এখনও অন্যমনস্ক রয়েছে মীরা।

হ্যাঁ, দম দিলে সেটা নাচবে। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মিণ্টুর ছোট্ট মুখটা। জান মা, বাবুটা খুব ভাল, মন্তব্য করলে সে। মীরার মনটা যেন অকস্মাৎ থেমে গেছে, স্যাঁতসেঁতে, ঢিলে নির্জীব হয়ে গিয়েছে একটা ভিজে কাঁথার মত। এর আগে অনেক বারই রবীনকে ছেড়ে তাকে থাকতে হয়েছে, কিন্তু কোন বারই অবসাদে তাকে এভাবে ভেঙে পড়তে হয় নি।

হঠাৎ মীরার নজর পড়ল রান্নাঘরের উনুনের দিকে। উনুনটা জ্বলছে, লাল গনগনে আগুন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মীরা সেইদিকে—সুন্দর অথচ ভয়াবহ একটা আকর্ষণ যেন লুকিয়ে আছে ওই রক্তবর্ণ আগুনের মধ্যে। অকস্মাৎ মীরার মনে হ'ল আগুনটা যেন অস্বাভাবিক রকমের লাল, এত লাল কেন? ঠিক সিঁদুরের মত জ্বলন্ত কয়লা থেকে শিখাগুলো লক্‌লক্ করে জ্বলছে। ধূসরবর্ণ ছাইয়ের একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়েছে কোন কোন জায়গায়। পাশের দেওয়াল আগুনের লালচে আভাটাকে যেন শোষণ করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ মনে হ'ল মীরার উত্তাপটা যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে তার দিকে। হিংস্র ক্ষুধিত নেকড়ের মত সন্তর্পণে নিঃশব্দে চলনটা অনুভব করতে পারছে মীরা—লোভাতুর রক্তবর্ণের ঘোলাটে চোখ দিয়ে যেন শিকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে।

নানুভাই দেশাই সহজে ব্যয় করে না, বিনা কারণে তার কাছ থেকে এক পয়সা বার করা দস্তুরমত দুরূহ ব্যাপার। সুনীল রায়কে অবশ্য তার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু শ্রীলেখা ওরফে হাসনুকে যে তার একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং সুনীল রায়কেও সঙ্গে নিতে বাধ্য হ'ল নানুভাই। নানুভাই-এর ব্যবসা অনেকদিনের, কয়লা, পাট, লোহা, চিনি ছাড়া সম্প্রতি ওষুধ ও ফিলম্ ব্যবসায়ের কাজেও সে হাত দিয়েছে। ফিলম্ সম্বন্ধে নানুভাই-এর অভিজ্ঞতা কিছু ছিল না। আর অভিজ্ঞতার এমন দরকারই বা কি, চোখ খোলা রাখলে আর চালাতে জানলে সব ব্যবসাই চলে, একথা নানুভাই বিশ্বাস করে। তাছাড়া ফিলম্ ব্যবসাতে

সুবিধে প্রচুর আছে তা সে ভালভাবেই বুঝেছে। এই ব্যবসাতে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে অনেকগুলো লোভনীয় জিনিস মেলে। লোকের সঙ্গে আলাপ জমাবার, মেলামেশা করার এমন প্ল্যাটফর্ম আর নেই বললেও চলে। শুভমহরৎ থেকে শুরু করে স্যুটিং পর্যন্ত কোন একটা উপলক্ষ করে হোমরা-চোমরাদের অনেককেই পাকড়ানো চলে। নানুভাই লক্ষ্য করেছে বর্তমান যুগে একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু বা বিষয় যদি থাকে সেটি হ'ল ফিলম্। লোকেরা যেন এর প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে, আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই যেন "রক এ্যাণ্ড রোল নৃত্যে" যোগদান করেছে, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের ঝোঁকই যেন একটু বেশী বলে মনে হয়, বিগত যৌবনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টাই বোধ হয় তাঁরা করে থাকেন।

দেশাই ষ্টুডিওতে আমন্ত্রণ তাঁদের কাছে খুবই লোভনীয়—তাঁদের আনন্দ দেওয়ার সব ব্যবস্থাই নানুভাই করেন, পরিবর্তে লোহার পারমিট, কয়লার কণ্ট্রাক্টগুলো স্বল্পায়াসেই এসে পড়ে, খুব কষ্ট করতে হয় না। অপরপক্ষে কর্মক্লান্ত দিনগুলির পর একটু চিত্তবিনোদনের সুযোগ পাওয়া যায়, সেটাই বা কম কি ?

ব্যয় করতে নানুভাই দেশাই সব সময়ই প্রস্তুত। তবে তার লাভ চাই। যা দেবে তার চেয়ে বেশী চাই। যারা কোম্পানীতে কাজ করে তারা জানে, সুতরাং সবাই সব সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর অকস্মাৎ আপ্যায়নের ক্ষেত্রটা বেশ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় নানুভাইয়ের। ব্রিটিশ যুগে কিন্তু প্রতিদান ছিল। আর যাই হোক, কাজগুলি ঘড়ির কাঁটার মতো হয়ে যেত, ঠকে যেতে হত না। আপিসের মধ্যে ছিল শৃঙ্খলাবোধ আর পরিচ্ছন্নতা! আর এখন? নিয়মকানুন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, বিশৃঙ্খলার মেলা বসেছে যেন। প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে, কে কত ভাবে নিয়ম আর শৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে! যে কোন আপিসের মধ্যে গিয়ে একবার তাকালেই পার্থক্যটা রূঢ়ভাবে চোখে পড়ে। আপিসের দেওয়াল থেকে শুরু করে মেঝে অবধি সব স্থানেই পানের পিক, পোড়া বিড়ি-সিগারেটের দগ্ধাংশ, শালপাতা সবই পাওয়া যায়। টেবিল, চেয়ার, র‍্যাক সর্বত্রই ধূলিধূসরিত। দরজায় কিন্তু অনেক সময় পর্দা দেওয়া থাকে। নারকেল দড়িতে বাঁধা রং-ওঠা শতছিন্ন

পর্দাগুলো আপিসের সৌন্দর্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করে বোধ হয়। আপিসের ভিতর দিবারাত্র যে কলরোল লেগে রয়েছে, তাতে কাজের কথা ছাড়া অন্য সব রকমের আলোচনাই শোনা যায়।

যেমন—ওধার থেকে চীৎকার করলেন একজন, কি দাদা কি রকম হ'ল ?

এদিকের দাদা উত্তর দিলেন, রকমটা আবার কি ?

কি রকম ভাটাভট্ চারটে গোল ইষ্টবেঙ্গলকে ঠুকে দিলে ?

আর রাখো রাখো, পরের মুখে আর ঝাল খাইও না, তোমার মোহন-বাগানের কতই তো মুরোদ দেখলাম।

কিংবা আর একজন হয়ত বললেন, কি হে বিমল, কাজ করতে আর ভাল লাগছে না ?

কেন ? ভালমানুষের মত মুখে জিজ্ঞাসা করে বিমল।

আবার কেন—ইন্‌স্‌পিরেসান অনুপস্থিত, কাজ করতে কি আর ভাল লাগে !

কি যে বলেন। মৃদু আপত্তি জানায় বিমল।

অমিতার কি হয়েছে বল তো ?

তা আমি কি করে জানব ? সলজ্জ বিনীত ভাবে উত্তর দেয় সে।

তুমি জানবে না তো কি ওপাড়ার মতিখুড়ো জানবে ? সমবেত কণ্ঠের অট্টহাসি শোনা যায়।

এসবে আপত্তি ছিল না নানুভাইয়ের, কিন্তু কাজের কথা উত্থাপন করলেই কেরানীবাবু থেকে অফিসার পর্যন্ত অর্ধনিমীলিত চক্ষে দার্শনিক দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। দশবার প্রশ্ন করেও কথার উত্তর পাওয়া যায় না। পরে অবশ্য যথারীতি দাওয়াই দিলে মুখ বেশ দরাজ ভাবেই খুলে যায়, চক্ষুলজ্জার কোন বালাই নেই, দুষ্কৃতির জন্যে অনুতাপ নেই, অকর্মণ্যতার বা অমর্যাদার কোন গ্লানি ওদের স্পর্শই করে না। নিজের সহকর্মী থেকে সুরু করে দেশের সকলেই যে অপদার্থ সেকথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে ওরা বোধ হয় আত্মপ্রশংসার ব্যর্থ চেষ্টা বারম্বার করে।

ওদের লোভ পরস্ত্রীর সঙ্গলাভ থেকে সুরু করে লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ পর্যন্ত। পরের ছিদ্র অন্বেষণ সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান অতলস্পর্শী। ঊর্ধ্বতন

অফিসারের কাছে সহকর্মীর নামে চুকলী কাটাই ওদের ধর্ম। পাড়ার সার্বজনীন পূজার নিমন্ত্রণ-পত্রে কার্যকরী সমিতির টিকিটে নিজের নাম ছাপা হলে ওরা কৃতার্থ হয়। টিউবার-কিউলোসিস কিংবা 'রেডক্রশ ডে'তে কয়েক আনা পয়সা দিয়ে বক্ষে পতাকা শোভিত করে নিজেকে ওরা দানবীর ভাবে! এসব গুণ নানুভাই ওদের মধ্যে খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করেছে। এক দিক দিয়ে নানুভাই খুশী হয়েছে। বাঙালীর ভেতর কেরানীর সংখ্যা অর্ধশিক্ষার মতই যে প্রচুর, সেকথা সে জানে। মেরুদণ্ডহীন এই জাতটার দিকে তাকিয়ে নানুভাই যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

যখন কোম্পানীতে লোক নেওয়া হয় তখন বিশেষ ভাবে খোঁজ নিয়ে তবে তাকে চাকরী দেওয়া হয়। দেশাই ফিল্মস্-এর জন্যে পরিচালকের দরকার হওয়াতে অনেক অনুসন্ধান করার পর তবে ধীরেন ভড়কে বহাল করা হয়েছে। ধীরেন ভড় ফিল্ম লাইনে অনেক দিন আছে, পরিচালক হিসেবে নাম যত না থাক, এই ব্যাপারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। তার চেয়ে বড় একটা গুণ আছে সেটা হল ফিল্ম সংক্রান্ত সব লোকের সঙ্গে আলাপ। কাকে ধরলে কোন্ কাজ সহজে হাসিল হয়, কোন্ কান টানলে কোন্ মাথা এগিয়ে আসে তা সে বিলক্ষণ জানে। এর আগেও সে কয়েকটা কোম্পানীতে কাজ করেছে কিন্তু বাঁধা মাইনে একটা চাই তো, সে হিসেবে দেশাই ফিল্মের কাজটা মন্দ নয়।

ধীরেন ভড়রা কলকাতায় অনেকদিন এসেছে—প্রায় বন কেটে বাস বলা চলে, পূর্বে অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তাদের নিজের বাড়ী ছিল উত্তর কলকাতায়। সেখান থেকে বহুদিন আগে বাস উঠে গিয়েছে। উপস্থিত সে খিদিরপুরে বনবাস করে। বহু পুরানো একতলা বাড়ী। রোদ বা হাওয়ার চিহ্ন নেই। নোনাধরা দেওয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে আর বাড়ীর আবহাওয়া গুমোট। ধীরেন ভড়ের পারিবারিক জীবনের পক্ষে পরিবেশটা খুব মানানসই হয়েছে।

ধীরেন ভড়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুটি কন্যা রেখে মারা গেছেন, তার পর অপর্ণাকে বাঁকুড়া থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসে ধীরেন ভড়। সে এক মজার ব্যাপার, মেয়েরা হঠাৎ একদিন দেখলে বাবা নতুন মা নিয়ে বাড়ী ফিরছে। বড় মেয়ে সবিতার বয়স বছর সতের আর নমিতার তের। অপর্ণা

পল্লীগ্রামের মেয়ে, কলকাতার হালচাল জানা ছিল না, প্রথম প্রথম তাই বেশ অসুবিধা হত, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে দু'মেয়েকে আপন করে নিল। তার পর সম্প্রতি নিজেরও একটি ছেলে হয়েছে, তার নাম টুকুন। ছেলে-মেয়েদের থেকে ধীরেন ভড়ও যেন স্বতন্ত্র। স্ত্রী হিসেবে অপর্ণাকে ভালই বলা চলে, তবে দোষের মধ্যে ঝগড়া করতে ভালবাসে। ধীরেন ভড়ের সে গুণ আছে, সুতরাং জমে ভাল।

সেদিন ধীরেন ভড়ের আপিস থেকে ফিরতে একটু দেরীই হল। ধীরেন ভড়ের প্রত্যাশায় সকলেই অপেক্ষা করে। ফিরলে উত্তেজনার অভাবে গোটা বাড়ীটা যেন মিইয়ে থাকে, সবিতা, নমিতা, অপর্ণা এমনকি প্রতিবেশীরা পর্যন্ত অধীর আগ্রহে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। সেদিনও সকলে অপেক্ষা করছিল।

ওই যে আসছে। জানলা দিয়ে দেখে সবিতা মাকে ধীরেন ভড়ের আসার সংবাদটা দিলে।

আজ কি বার রে ? জিজ্ঞেস করলে অপর্ণা।

শনিবার। ছোট্ট করে উত্তর দিলে সবিতা।

হুঁ, তা হলে তো আসতে একটু দেরী হবেই, রেস আছে কিনা। ধীরেন ভড়ের অনেক গুণ।

আজ মাইনে পাবার দিন না ? উসকে দিলে সবিতা।

কবে যে মাইনে পায় আর কবে যে পায় না তা এই দশ বছরেও বুঝলাম না মা। স্বয়ংক্রিয় মনকে একটু তাতিয়ে নিলে অপর্ণা।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল।

সবি আবার কোথায় গেলি ?

নমিকে দরজাটা খুলে দিতে বললাম।

টুকুনকে নিয়ে ও-ঘরে শুইয়ে দে।

সবিতা টুকুনকে নিয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দিলে।

যুদ্ধক্ষেত্র উপযুক্ত পরিমাণে উন্মুক্ত রাখতে হবে। প্রতিযোগীদের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। অসুবিধা হলে লড়াই ভাল জমবে না। সবিতা, নমিতা পাশের ছোট বারান্দায় আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। তীব্র প্রতি-যোগিতামূলক খেলার পূর্বের অপেক্ষমান দর্শকের মত।

উঃ, যা শীত! বলতে বলতে ধীরেন ভড় ঢুক্‌ল ঘরের ভেতর।

টাকা কই? ঠাণ্ডা গলায় অপর্ণা প্রশ্ন করল।

কিসের টাকা? ধীরেন ভড় বাতাসে যুদ্ধের গন্ধ পেয়েছে।

আহা ন্যাকা, টাকা কিসের? মুখের কাছে হাত নেড়ে অপর্ণা ভেংচি কাটলে—মাইনের টাকা কোথায়?

আজ মাইনে হয় নি। ধীরে-সুস্থে জামা'টা খুলে ধীরেন ভড় আলনায় রাখলে। সবি, একটু চা করত মা। প্রসঙ্গের মোড় ফেরাতে প্রয়াস পায় ধীরেন ভড়, আবহাওয়াটা হাল্কা করতে চায় সে। স্নায়ুযুদ্ধের শেষ হলেই মঙ্গল, ঠাণ্ডা যুদ্ধ গরমে পরিণত হতে দেরী হয় না—এ অভিজ্ঞতা তার আছে।

ল্যাকটোজেন কৈ? আবার আক্রমণ।

টাকা পেলে আনব। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় ধীরেন ভড়। কৈ রে চায়েব জল চাপালি? চাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।

ততদিন কি তোমার ঐ টেকো মাথাটা খাবে ছেলে?

কেন গরুর দুধ দিলেই তো পার। যেন যুদ্ধমান বলীবর্দ সিং ও ক্ষুর দিয়ে ধুলো ওড়াচ্ছে।

তাতেও পয়সা লাগে, অমনি হয় না, বুঝলে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, পয়সা লাগে জানি। এবার চীৎকার করে উঠল ধীরেন ভড়—সে পয়সা আসে কোত্থেকে? তোমার বাবার জমিদারী থেকে?

আমার বাবার জমিদারী থাকলে কি আর তোমার মত অখাদ্য বুড়োর হাতে পড়তাম।

অনেক বরাত ভাল তাই—

হ্যাঁ, তা আর বলতে! এক পাক ঘুরে গেল অপর্ণা—পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, আহা কি আমার বরাত রে!

বাপের বাড়ীতে কি জুটত? সোনার থালায় পরমান্ন?

না, মোটা ভাত মোটা কাপড়, পরমান্ন নয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় অপর্ণা—কিন্তু সেখানে ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন আর বাইরে কোঁচার পত্তন নেই। অমন বার-ফট্টাই নেই। পরিবারকে, ছেলেকে খেতে না দিয়ে তারা বাইরে বুড়ো বয়সে ধ্যাতাং ধ্যাতাং করে নাচে না, বুঝলে? ধীরেন ভড়ের নাকের

গোড়ায় অপর্ণা সজোরে হাতটা এগিয়ে আনলে। মাথাটা যদি ঠিক সময়ে না সরিয়ে নিত ধীরেন ভড় তা হলে হাতটা নাকের ওপর রীতিমত জোরেই এসে পড়ত।

ভিখিরীর আস্পর্ধা দেখ, নাকটা অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে তাতে একবার হাত বুলিয়ে নিলে ধীরেন ভড়।

ওরে আমার রাজরাজেশ্বর রে! দু'হাত কোমরে দিয়ে আবার এক পাক ঘুরে গেল অপর্ণা, 'ভাত-কাপড়ের মুরোদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই', ঘরে যার অতবড় সোমত্ত মেয়ে সে কিনা বায়স্কোপের মেয়েছেলেদের নিয়ে ঢলাঢলি করে—ছিঃ ছিঃ, ধিক্ ধিক্!

খবরদার ছোটলোক মেয়েছেলে, মুখ সামলে। এক লাথিতে মুখ ভেঙে দোব? সোজাসুজি আক্রমণ সুরু হল এবার।

মার না মার, দেখি কত বড় সাহস, কত বড় বুকের পাটা, একবার দেখি? বড্ড প্রাণে লেগেছে, না? রোজ রাত্রে মদ গিলে এসে এইরকম ফুটুনি করবে। আ মরণ! 'সভায় গিয়ে পায় না ঠাঁই, ঘরে এসে বৌ কিলাই'। বুড়ো ঘাটের মড়া, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। বাহার দেখ না, কোট-প্যান্টুল প'রে ছোকরা সেজে বায়স্কোপের মেয়েছেলে-দের সঙ্গে ফুর্তি হচ্ছে।

ফুর্তি করলে কি এতদিন বেঁচে থাকতিস, না তোদের চিহ্ন থাকত?

সাত জন্মের পোড়াকপাল, তাই তোমার হাতে পড়েছি।

বেশ কিছুক্ষণ চলল, আশপাশের সকলেই হাতের কাজ ফেলে উন্মুখ হয়ে রস গ্রহণ করতে লাগল। অলক্ষ্যে থেকে সবিতা, নমিতাও নিত্য-নৈমিত্তিক উত্তেজনায় অংশ গ্রহণ করলে। গায়ে কোটটা চাপিয়ে ধীরেন ভড় বেরিয়ে গেল। কিন্তু মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। মোড়ের ভুবন সাহার মুদীর দোকানের সামনে ছোট টুলটায় গিয়ে বসল সে।

এই যে ধীরেনবাবু? ভুবন সাহা রোজই তার দেখা পায়। পাড়ার লোকেরা সকলেই জানে এই ঝগড়ার কথা। প্রতিবেশীদের এই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে; সুতরাং ও বিষয়ে আর কেউ প্রশ্নও করে না।

এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট দাও। গম্ভীর ভাবে বললে ধীরেন ভড়।

এই নিন। ভুবন সাহা এগিয়ে দিলে সিগারেটের প্যাকেটটা।

হ্যাঁ, তোমার বাকী টাকাটা এবার দিয়ে দোব। প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে ধীরেন ভড় বললে।

কত বাকী আছে বল তো? নিজেই কথাটা পাড়লে সে।

৬২ টাকা ১২ আনা।

এই একই প্রশ্ন এবং উত্তর প্রায়ই হয় জিনিস কেনার সময়, ধীরেন ভড় এ প্রশ্নটি করে, তাতে ব্যবসায়ী হিসেবে ভুবন সাহার উৎসাহ বাড়া উচিত আর দরকারী জিনিসটা পেতেও দেরী হয় না।

জান ভুবন, এবার বাইরে যাচ্ছি। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয় ধীরেন ভড়।

বাইরে?

হ্যাঁ। এবার স্যুটিং হবে পশ্চিমে—এবার যা বই হবে না! তোমায় পাস দোব। দু'হাত কচলালে ধীরেন ভড়।

পাস চারটে চাই বাবু।

চারটে?

হ্যাঁ, মগরাহাট থেকে আমার এক শালী এসেছে কিনা। সলজ্জ ভাবে জানালে ভুবন সাহা।

দোব দোব, তবে সে তো এখন দেরী আছে, দাঁড়াও বইটা আগে শেষ হোক তবে তো।

আচ্ছা, তবে ভুলে যাবেন না যেন।

না না, ভুলব কেন।

আর কিছু টাকা যদি।

দোব দোব, সে কি তোমায় বলে দিতে হবে ভুবন।

তার বিবেচনার ওপর অনাস্থার জন্যে যেন ক্ষুব্ধ হ'ল ধীরেন ভড়।

ধীরেন ভড় বেরিয়ে যাবার পরই অপর্ণা পাশের ঘরে গেল। সবিতা, নমিতা অপেক্ষা করছে তখন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্যে।

টুকুনকে দুধ খাইয়েছিস? অপর্ণার গলার স্বর স্বাভাবিক, কিছুই যেন হয় নি।

হ্যাঁ।

চায়ের জল ?

চাপিয়েছি।

চাটা করে ফেল্, হালুয়া আর পরটা দু'খানা রেকাবে দে, এখুনি এসে পড়বে।

জলখাবার এবং চা সাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরেন ভড় এসে পড়ল। অপর্ণার সব জানা আছে, এমন কি ঝগড়া করে বেরিয়ে যাবার কতক্ষণের মধ্যে সে ফিরে আসবে নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারে। রাত্রে ধীরেন ভড় একটু দেরীতেই ঘুমায়। তার একটা কারণ অপর্ণার ক্রমাগত কথা বলা।

বাড়ীওয়ালার মেয়ে এসেছিল। বললে অপর্ণা।

কেন, টাকা চাইতে ?

না না, ভাড়া তো দেওয়া আছে, খালি চার মাসের যা বাকী। এখন অপর্ণা যেন অন্য মানুষ।

তবে ?

আমাশার মাদুলী নিতে এসেছিল।

দিয়েছ ?

হ্যাঁ, সাদা আমাশা, সাদা সূতো দিয়ে বাঁধতে বলে দিয়েছি।

বেশ, পিঠটা একটু চুলকে দাও তো—না ওখানে নয়—আর একটু নীচে··· উঃ—

কি হ'ল ?

আস্তে, একেবারে ছিঁড়ে দিলে যে।

নখগুলো বেড়েছে, কাল কাটতে হবে। বললে অপর্ণা—হ্যাঁ, ভাল কথা—সবিতার শাড়ী চাই—কি ঘুমুচ্ছ নাকি ?

না, শুনেছি, আনব। ঘুম আসছে ধীরেন ভড়ের।

হ্যাঁ গো !

—উঁ।

আচ্ছা, তুমি যে আমার ব্রোঞ্জের ওপর চুড়ি করে দিয়েছিলে তার দাম কত ?

কেন, আরও চাই ? মনে মনে বিরক্ত হল ধীরেন ভড়।

না না, আমার নয়—সবি-নমির জন্যে। বড় হয়েছে তো, প্লাষ্টিকের চুড়ি-গুলো পরে আর কতদিন কাটায় বল, দেখতেও খারাপ লাগে।

আচ্ছা।

মানে একসঙ্গে বলছি না, এই ধর একবার সবির দু'গাছা দিলে, আবার তার পরের বার নমির দিলে, এই রকম আর কি।

বেশ। ধীরেন ভড়ের স্বরে উৎসাহের চিহ্ন নেই।

অপর্ণা সেটা অনুভব করে বললে, আমি এখুনি বলছি না, যখন তোমার হাতে টাকা জমবে তখন।

টাকা আর জমেছে ! দীর্ঘশ্বাস ফেললে ধীরেন ভড়।

কেন জমবে না, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন ? দেখ ঠিক টাকা আসবে।

ভয় কি আর সাধে পাই অপর্ণা, মেয়ে দুটো বড় হয়েছে, তার ওপর আবার বাচ্ছা ছেলেটা। এদিকে ক্রমশঃ বুড়ো হয়ে পড়ছি, কি যে করি ! হতাশায় যেন ভেঙে পড়ল ধীরেন ভড়।

বাজে বকো না বাবু। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অপর্ণা—বুড়ো আবার কি, এই তো কালনার পিসেমশাই, তাঁর বয়স কত জান ?

কত ?

একাত্তর, ছোট ছেলের বয়স মাত্র আট, বুঝলে ? উনি একেবারে বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছেন !

অপর্ণার অভিমতে ধীরেন ভড়ের মনটা হালকা হল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম অভিমানও এসে পড়ল। সে বললে, কেন, এই তো বিকেলেই তুমি নিজে আমায় বললে—

কি বলেছি ?

বুড়ো, টেকো, ঘাটের মড়া, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—কত কি বললে।

কৈ, কখন আবার বললাম, যেন আকাশ থেকে পড়ল অপর্ণা।

হ্যাঁ বলেছ, রাগের মাথায় যা বল, পরে কি আর সেটা মনে থাকে তোমার ?

বলেছি তো বলেছি, বেশ করেছি। ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল অপর্ণা। তার পর বললে; ভীষণ ঝগড়াটে তুমি।

কে আমি? ধীরেন ভড় আপত্তির স্বরে জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, তুমি নয় তো আবার কে? কয়েক মিনিট চুপচাপ। অপর্ণাই আবার কথা সুরু করলে। রাত্রে যতক্ষণ না তার ঘুম আসে, ততক্ষণ সে বকবক করবেই আর ধীরেন ভড়ের আগেই সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়, অন্যথায় শেষ পর্যন্ত ঘুম আসা শক্ত হয়ে পড়ে! কারণটা অন্য কিছু নয়, ধীরেন ভড়ের অমানুষিক আর ভয়াবহ নাসিকা গর্জন। শব্দটা ঠিক কি ধরনের সেটা বোঝান শক্ত, তবে মাইক সহযোগে আধুনিক সঙ্গীতের সঙ্গে ভাঙা ষ্টেটবাসের আওয়াজ মেলালে অনুরূপ গর্জনের খানিকটা তুলনা মেলে। আওয়াজটা প্রায় অপর্ণার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিপদ হয় মাঝে মাঝে মেয়ে দুটোর, প্রায়ই উঠে পড়ে। সেদিন রাত্রে নমু উঠে পড়ে ডাকল, মা!

কি রে?

ঘুম হচ্ছে না।

কেন?

ঐ যে আওয়াজ।

অন্ধকারে হাসল অপর্ণা। বললে, তুই এক কাজ কর।

কি?

ঐ ঝিঁঝিঁ পোকাটা ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

ঐটে একমনে শোন দিকিনি তা হলেই ঘুম আসবে। ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজটায় মনসংযোগ করলে যে নাসিকা গর্জনটা আর শোনা যায় না এটা অপর্ণা নিজেই আবিষ্কার করেছে। মাথা ব্যথায় সাধারণতঃ কপালে মলমজাতীয় ওষুধ ঘষে দেওয়ার ফলে ওপরের ত্বকে জ্বালা করতে থাকে, তখন ভেতরের যন্ত্রণাদায়ক ব্যথাটা আর অনুভব করা যায় না, মনটা স্বতঃই এই নূতন জ্বালার দিকেই বদ্ধ থাকে। অপর্ণার আবিষ্কারটা অনেকটা সেই রকম। যাই হোক, অপর্ণাই নিজে আবার কথা বললে, শুনছ?

হ্যাঁ, বল।

বলছি কি কালীঘাটে কি যাওয়া হবে না? নমির অসুখের সময় মানত

করেছিলাম, বুক চিরে রক্ত দোব, টুকুনের বেলাতেও রুপোর জিভ দেব বলেছিলাম—কতদিন হয়ে গেল। একদিন নিয়ে চল না গো, কত আর খরচ বাপু।

খরচের জন্যে নয় গো, সময় কোথায়!

খুব সময় আছে, একটু চেষ্টা করলেই হয়। চল না একদিন।

হ্যাঁ যাব, কিন্তু মুশকিল হয়েছে।

মুশকিল আবার কি?

আর বল কেন। অনুযোগের ভঙ্গীতে বলতে থাকে ফিল্ম ডাইরেক্টার ধীরেন ভড়—এদিকে আবার এক হাঙ্গামায় পড়েছি।

হাঙ্গামা মানে?

বাইরে স্যুটিংএ যেতে হবে বোধ হয়।

কেন, তুমি তো বলেছিলে তার তিন মাস দেরী আছে।

আর বল কেন, ঐ সুনীল রায়ের জন্যে।

ওঃ, সেই সাহেবের মত লোকটা?

হ্যাঁ।

কেন, সে কি করলে?

আর কি করলে—ডুবিয়ে দিয়েছে একেবারে—হাসনুর সঙ্গে জমে গেছে আবার কি। হাসলে ধীরেন ভড়।

হাসনু কে?

নতুন বইতে নর্তকী সাজবে ইন্দ্রের সভায়।

কেমন দেখতে?

দেখতে ভালই। হালকা ভাবে উত্তর দিলে ধীরেন ভড়। স্ত্রীর সাক্ষাতে অন্য রূপসীর রূপ নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখান যুক্তিযুক্ত নয়।

হ্যাঁ গো!

কি?

আচ্ছা, ও তো মুসলমান, ইন্দ্রের সভায় যাবে কি করে?

আরে কি বিপদ, ও তো আর সত্যি সত্যি ইন্দ্রসভা নয়, সিনেমার ইন্দ্রসভা। অপ্রস্তুত হ'ল অপর্ণা, যত সে ভাবে বোকা হবে না ততই ঠকে যায়।

তা ওদের ভাবসাব হয়েছে ভালই তো বাপু, বিপদ আবার কি?

ভাবে যে একেবারে জমে গিয়েছে, স্যাটিং-এ আসতেই চায় না, বাড়ী থেকেই বার হয় না।

বল কী ?

আর শুধু কি তাই—টেলিফোন করলেও টেলিফোন ধরবে না।

আমার কিন্তু বেশ লাগে।

কি ?

ঐ যে কেমন দুজনে ভালবাসে, একজন আর একজনকে ছেড়ে যেতে চায় না, বেশ বাপু, না ?

হ্যাঁ, তা ভালই। আমতা আমতা করে বলে ধীরেন ভড়। ঘরে সারাদিন সুনীল রায়ের মত থাকলে সে মরে যাবে।

কিন্তু ঘর থেকে বার করার জন্যেই তো বাইরের স্যাটিংগুলো করা হচ্ছে।

তাই নাকি ?

আর তা ছাড়া সুনীল রায়ের বৌ আছে। সুনীল রায়ের ওপর হঠাৎ যেন বিতৃষ্ণা এল ধীরেন ভড়ের।

এঁ্যা, বিয়ে হয়ে গেছে ? আশ্চর্য হল অপর্ণা।

হ্যাঁ।

বিয়ে হয়ে গেছে তবু এই কাণ্ড, ছিঃ ছিঃ—

আর বল কেন।

তুমি বাপু সিনেমার কাজ ছেড়ে দাও। একটু চুপ করে থেকে অপর্ণা বললে।

কেন বল তো ?

ওরা সব ডাইনী, যাদু জানে! ধীরেন ভড় হেসে উঠল—অপ্রস্তুত হল অপর্ণা, তার মনের কোণে এখনও এই টেকো বুড়ো লোকটাকে হারাবার ভয় নিশ্চয়ই রয়েছে। সব মেয়েরই হয়তো থাকে, কিন্তু অপর্ণার মত হঠাৎ দুম করে কথাটা সবাই বলে না—হাজার হোক গাঁয়ের মেয়ে তো।

এর পর দিনকতক কোন রকমে চলল, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটল না। স্যাঁতসেঁতে প্রাণহীন চারটে দেওয়াল-ঘেরা খাঁচার মধ্যে ধীরেন ভড় আর অপর্ণা—সবি, নমি, আর টুকুন নিজের নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

কিন্তু সেদিন আবার বিপদ ঘনিয়ে এল, যেদিন ধীরেন ভড় ব্যস্তভাবে বাড়ীতে এসে প্রথমেই বিদেশে যাওয়ার কথা বললে।

কাল যেতে হবে।

কাল ?

হ্যাঁ।

আর কোন কথা নয়, অপর্ণা সারাটা দিন গুম হয়ে রইল, ভেতরে ভেতরে যেন জ্বলে যাচ্ছে সে। ধীরেন ভড় পুরনো বড় ট্রাঙ্কটা খালি করে নিলে, একটা হোল্ডঅল অনেক দিন আগে কার কাছ থেকে যেন চেয়ে নিয়েছিল, সেটা আর মালিককে এ যাবৎ ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি। মাচা থেকে নামান হল সেটা। পোকায় শতছিদ্র করে দিয়েছে—চামড়ার দুটো ষ্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। ধীরেন ভড় নিরুৎসাহ হল না—একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ছেঁড়া হোল্ডঅলটার দিকে। দৃশ্য পরিকল্পনা পূর্বে ভেবে নেওয়া অভ্যাস আছে আর হুঁ, একেবারে নিরাশ হবার মত নয়, দেখা যাক। অনেক ভাঙা আর অচল জিনিসকেই সে চালিয়েছে ষ্টুডিওতে। কাঠের খুঁটির ওপর ছেঁড়া কাপড় টাঙিয়ে অনেক দুর্গম পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে সে। পেয়ারাগাছে কাগজের ফুল গুঁজে অনেক নন্দন-কানন রচনা করেছে। খেঁদি-পেঁচি মেয়েদের মেকআপ আর জুৎসই এ্যাঙ্গেলে ছবি তুলে বহু দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করেছে সে। জোড়াতালি দেওয়া তার ব্যবসার অঙ্গ বলা চলে। সুতরাং ধীরেন ভড় নিরাশ হ'ল না, ছেঁড়া হোল্ডঅলটা উল্টেপাল্টে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সে। পোকায় কেটেছে বটে তবে ছিদ্রগুলো বড় নয়, খুব ছোট ছোট মিহি-ধরনের। কয়েক জায়গায় অবশ্য ছিদ্রগুলো একসঙ্গে মিলে গিয়ে বড় গর্তের সৃষ্টি করেছে। ধীরেন ভড় স্বভাবতঃই ছিদ্রান্বেষী, কিন্তু এক্ষেত্রে তার সংখ্যার প্রাচুর্য লক্ষ্য করে উৎসাহের বদলে নিরাশ হল সে।

সবি! ডাকলে ধীরেন ভড়—একবার এদিকে আয় তো—এটা একটু সেলাই করে দে।

যাই! উত্তর দিলে সবিতা।

সবি? সঙ্গে সঙ্গে ডাকলে অপর্ণা, পাশের ঘর থেকে—কোথায় যাচ্ছিস?

বাবা ডাকছেন—কি যেন সেলাই করতে হবে।

এখনও ঘরে কাজ পড়ে আছে, ও সব বাজে কাজ করতে হবে না ; যাবি না ওদিকে—অন্য লোক দিয়ে সেলাই করিয়ে নিতে বল—সাতটা দাসীবাঁদী রেখেছে যেন, মরণ আর কি !

ধীরেন ভড় আর বেশী ঘাঁটালো না, চেপে গেল, নিজেই মোটা চশমা পরে ছুঁচস্যুতো নিয়ে ছেঁড়া হোল্ডঅলটা সেলাই করতে বসে গেল। কি দরকার বাবা ঘাঁটিয়ে। একবার সুরু করলেই তো চিত্তির। ছাদে কাক-চিল বসতে পারবে না। পাড়ার লোকসুদ্ধ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তার চেয়ে নিজে করে নেওয়াই ভাল। ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। কিন্তু—অত সহজে কি ঝঞ্ঝাট মেটে ? রাতটা অবশ্য কোন রকমে কাটল, কিন্তু তার পরের দিন—ধীরেন ভড়ের যাত্রার দিন আবার শুরু হল। গয়লা এসেছিল ; পাওনা টাকাটার কথা রোজের মত একবার মনে করিয়ে দিল।

টাকা পাবে না। রুক্ষস্বরে উত্তর দিলে অপর্ণা।

আজ্ঞে ? অবাক হল গয়লা, অন্য রকম জবাব সে বরাবর শুনে এসেছে। দুদিন পরে নিও কিংবা পরের সপ্তাহে দোব—এই ধরনের। এ আবার কি ? থতমত খেয়ে ঢোক গিললে বেচারী।

ওই তো বললাম—টাকা পাবে না। আর একবার বললে অপর্ণা।

কেন মা ?—দুধে জল তো সব গোয়ালাই দিয়ে থাকে—শাস্ত্রসম্মত এবং পরিমাণমত জলই সে দিয়েছে, ভাবছে গয়লা, তবে বলা যায় না—ছেলেটা হয়ত—বোকা, ভীষণ বোকা ওটা, গরুর সঙ্গে থেকে থেকে বুদ্ধিও ঐ রকমই হয়েছে।

বাবু বাইরে যাচ্ছেন। নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিলে অপর্ণা।

ওঃ। যাক তা হলে তার ব্যবসা সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নয়।—কোথায় যাবেন ? জিজ্ঞাসা করল গয়লা।

ফুর্তি করতে যাবেন ?

এ্যাঁ ! গরুর কাজ করে তবে কি সেও বোকা হয়ে যাচ্ছে নাকি ? মায়ের কথাটা ঠিক বোঝা গেল না তো—

হ্যাঁ, বায়োস্কোপের মেয়েছেলে।

পাশের ঘর থেকে ধীরেন ভড় সত্বর চলে এল। আর দেরী করা সঙ্গত হবে না। গয়লাকে বললে, যা তুই, পরে টাকা পাবি !

আজ্ঞে! বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! বাবু তো কোনদিন তাকে টাকার কথা বলেন না। ফুর্তি করতে যাবেন বাবু। সে আবার কি? সব কথাগুলো হেঁয়ালীর মত লাগল তার। একসঙ্গে অনেক ভাবনার বোঝা নিয়ে চলে গেল গয়লা।

পৌরুষে রীতিমত আঘাত লেগেছে ধীরেন ভড়ের। গয়লার সামনে এ রকম স্পষ্ট ভাষায় তাকে অপমান করতে পারে অপর্ণা একথা তার পক্ষে ভাবা শক্ত। আর সবচেয়ে বড় কথা হল বিনা কারণে। যদি কারণ থাকত তা হলেও বা হ'ত। কিন্তু—রাগে ধীরেন ভড়ের মাথার ভেতর যেন জ্বালা ধরে গেল। একদৃষ্টে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, দেখ বাইরের লোকের কাছে ইতরোমি করো না।

ঢাকে কাঠি পড়ল—

ওরে আমার ভদ্রলোক রে! লড়াই সুরু হল আবার নবোদ্যমে। সবিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি, ডালের কড়াটা নামিয়ে। নমিতা টুকুনকে ঘুম পাড়াচ্ছিল, সেও তাকে কাঁধে তুলে দ্রুত এগিয়ে এল, এ সুযোগ ওরা সহজে ছাড়ে না।

আহা, মরে যাই মরে যাই, কত ভদ্দর রে! সত্যি কথা যেই বলেছি অমনি একেবারে ছটফট করে মরছে। মুখভঙ্গী করে বললে অপর্ণা।

মিথ্যে কথা! ধীরেন ভড় চীৎকার করে উঠল, সারা দিনরাত তাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হবে। হয়তো বিশ্রাম করবার বা খাবার সময় পর্যন্ত পাবে কিনা সন্দেহ, আর তাকে বলে কিনা ফুর্তি করতে যাচ্ছে—তা আবার গয়লার কাছে। রাগে ধীরেন ভড়ের মুখ দিয়ে কোন কথাই যেন বার হল না।

মিথ্যে কথা? জেরা করলে অপর্ণা।

আলবৎ।

সঙ্গে মেয়েছেলে যাচ্ছে না? সেই হাসনু না কে?

হ্যাঁ, তারা গেলই বা।

হুঁ হুঁ, তবে তবে—দেখ দেখ সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির, দেখ। ওদের নিয়ে কি হবে কি, তীর্থ করবে, না রামায়ণ গান শুনবে?

বাজে কথা বলো না। ধীরেন ভড় গলার স্বর নরম করে নিলে। বাইরে যাচ্ছি—বিদেশে। কবে ফিরব তার ঠিক নেই, আর এই সময় ঝগড়া সুরু করলে? একটু ভয় করে না?

কেন ভয়টা কিসের ? আমি কি কারোর ধার করে খেয়েছি, যে আমার খারাপ হবে ?—না কারোর সর্বনাশ করেছি যে আমার সর্বনাশ হবে ?

সারাদিন কেটে গেল তোড়জোড়ের মধ্যে, বিছানা বাঁধা, কাপড়-জামা গোছান, খাবার তৈরী, পান সাজা—সব নিখুঁত ভাবে অপর্ণা আর সবিতা করে দিলে। পাঁচটার পর একটা ট্যাক্সি আনা হল, বেরুবার মুখে সবিতা নমিতা এসে ধীরেন ভড়কে প্রণাম করল, হঠাৎ অপর্ণাও কোথা থেকে এসে টিপ করে তাকে একটা প্রণাম করে চকিতে চলে গেল।

অপর্ণার প্রণাম করার ভঙ্গী দেখে ধীরেন ভড় আর মেয়েরা হেসে উঠল।

রাত্রের রান্না অপর্ণা আজ করবে না। হঠাৎ যেন সে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত বাড়ীটা যেন শূন্য হয়ে গেল। এ রকম তো তার কখনও মনে হয় নি ! সাতটা না বাজতেই শুয়ে পড়ল সকলে। এক পাশে সবিতা, কোলের কাছে টুকুন আর টুকুনের পাশে নমিতা। ক্লান্তি আর অবসাদে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে সকলে। রাত সাড়ে ন'টার সময় হঠাৎ টুকুন চীৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠল—অপর্ণা উঠে পড়ল—বুকটা তার ধড়াস করে উঠেছে। কান্না আর থামছে না ছেলেটার, এ রকম তো আগে কখনও কাঁদে নি। অপর্ণা বুকে জড়িয়ে ধরল টুকুনকে। সবিতার গায়ে একটা হাত রাখলে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে, সবিতার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে !

কি রে, তুই কাঁদছিস কেন ? অপর্ণা জিজ্ঞেস করলে।

শুষ্ক গলায় উত্তর দিলে সবিতা, কেমন যেন ভয় করছে মা।

ভয় কিসের বোকা মেয়ে, আমি তো রয়েছি।

নমিতা পাশ ফিরে শুলো। অপর্ণা চেয়ে আছে অপর দিকের দেওয়ালে টাঙানো সাড়ে ছ'আনা দামের কালীর ছবিটার দিকে—মাথার কাছে কাঁচের উপর সিঁদুরের টিপ, পায়ে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া। স্নান করার পর রোজই অপর্ণা এই ছবিটিতে সিঁদুর-চন্দন দেয়। একটা ধূপ জ্বালিয়ে ছবিটার চতুর্দিকে আরতির ভঙ্গীতে ঘোরায়। তার ধুলা-মলিন সংসারের এই একটি শান্ত পরিবেশ—তার স্বপ্ন ও সাধনার বেদীমূলে দিনের পর দিন সরল মনে সে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে। নিজের জন্য কিছু চায়নি সে—আকাঙ্ক্ষা তার বড় নয়। সে শুধু চেয়েছে এই অপোগণ্ড সন্তানগুলো যেন সুখে থাকে। অপদার্থ স্বামীটার যেন কোন ক্ষতি না হয়—আর তো

সে কিছুই চায় না। পটের দিকে তাকাল অপর্ণা। লোলজিহ্বা, খর্পরধারিণীও যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে—অপর্ণা ভয় পেল—শরীরটা যেন হিম হয়ে গেল তার। মনে মনে অশিক্ষিতা পল্লীগ্রামের মেয়েটি শুধু বললে, আমি তো কিছুই করি নি মা।

সুহাসিনী দেবী কলকাতায় এসেছেন। নৃপেশ, পরেশ তাঁর দুটি বোনপোকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। অবশ্য তাঁর স্নেহের মর্যাদা এ পর্যন্ত কেউ দিয়েছে বলে তো মনে হয় না তাঁর। মালদহ ছেড়ে কলকাতা আসবার ইচ্ছা তাঁর কোন দিনই ছিল না, তবুও তাঁকে আসতে হল। আর ভাল লাগছিল না তাঁর। সমস্ত জীবনটাই যেন তাঁর একটা বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। এক মুহূর্তও নিশ্বাস ফেলার অবকাশ তিনি পেলেন না। জীবনে অনেক আঘাত তিনি পেয়েছেন, নির্মম, নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক সে আঘাতগুলো। তাঁকে যেন শতছিদ্র করে দিয়েছে। অভাব তাঁর কিছুই ছিল না। ভরা সংসার, এতটুকুও ফাঁক ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ী, সুন্দর স্বামী, ধনদৌলত কিছুরই অভাব ছিল না। একমাত্র ছেলে ননী যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে তখন সুহাসিনী দেবীর স্বামী মারা গেলেন। দুর্ভাগ্যের সুরু সেখান থেকেই। সৌভাগ্যসৌধের ভিতটা তখনই নড়ে উঠেছিল। তার পর ধীরে ধীরে একটার পর একটা ইঁট খসতে আরম্ভ করেছে, নোনা ধরেছে দেওয়ালে দেওয়ালে। ফাটলের মধ্যে বাসা বেঁধেছে বট-অশ্বত্থের ধ্বংসের শিকড়। এখন সুদিনের ষড়ৈশ্বর্যশালী ইমারতের ভগ্নাবশেষ-টুকু পড়ে আছে শুধু কঙ্কালের মত। সুহাসিনী দেবী সেই স্মৃতিটাকে নিজের শুষ্ক পাঁজরার মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। সেটার তীক্ষ্ণ দংশনের ফলে তিনি আজও জর্জরিত হচ্ছেন বটে, কিন্তু তাকে দূরে সরাতে পারছেন না কোনমতে, সেইজন্যই তিনি কলকাতায় এসেছেন। তাঁর আর মালদহ ভাল লাগছে না।

সব যেন এখন স্বপ্নের মত মনে হয় তাঁর কাছে। স্বামী মারা যাবার পর ননীকে তিনি মানুষ করেছিলেন। কত দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যে দিনগুলো কেটেছিল, এখন সে সব খুঁটিনাটি তাঁর মনেও পড়ে না। ওকালতি পাস করার পর ননীর বিয়েও দিলেন। তাঁর ছোট বোন মৃণালিনীই সম্বন্ধ ঠিক করে দিয়েছিলেন। সুন্দরী মেয়ে রেবাকে তিনি পুত্রবধূ করে ঘরে এনেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে ভাল চোখে দেখতেও পারেন নি বা ভাল মনে গ্রহণও করতে

পারেন নি। অনেকেই তাঁর দোষ দেয় একথা তিনি জানেন। পরের মন্তব্যে অবশ্য তিনি কোনদিন কান দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কলকাতার মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা তাঁর ভাল ছিল না। রেবা সুন্দরী ছিল সত্যি, কিন্তু সুহাসিনী দেবীর মতে যেভাবে হিন্দুদের মেয়েদের চলাফেরা উচিত তা তার জানাই ছিল না। কলকাতার মেয়েদের হাবভাব, চালচলন তাঁর কাছে ভাল ঠেকে না। বারব্রত, পূজা-অর্চনা, সংসারের শুচিতা—এসব কলকাতার মেয়েরা জানে না বলেই সুহাসিনী দেবীর বিশ্বাস। তারা শুধু জানে রং মিলিয়ে জামাকাপড় পরতে, হাতমুখে রং মাখতে আর বাহার দিয়ে ঘুরে বেড়াতে। প্যাঁচ মেরে শাড়ী পরে, মাথার চুলটা ঘাড়ের কাচে পুঁটুলি পাকিয়ে রেখে দিয়ে ওরা ভাবে ওদের বোধ হয় খুব সুন্দর দেখায়। খোঁপার আবার কত বাহার, কত রকমের নাম! বাস্কেট্, রোল, কয়েল—সাতজন্মে সুহাসিনী দেবী এমন নামও শোনেন নি। তবু যদি চুল থাকত! কালো রঙের সুতো দিয়ে নকল চুল তৈরী করে এরা। এদের সবই ভুয়ো আর নকল। অন্তঃসারশূন্য এই মেয়েগুলোর দেমাক দেখে হাসি পায় সুহাসিনী দেবীর। আর তাঁদের সময়ে চুল ছিল কি রকম? মেয়েদের যেমন চুল হওয়া উচিত, কালো কোঁকড়ান, ঘন, আর লম্বা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। সুহাসিনী দেবীর মনে আছে, বিয়ের পর তাঁর স্বামী একদিন বলেছিলেন, বাইরের দরজা যখন বন্ধ থাকবে, তখন বারান্দা থেকে চুলটা নামিয়ে দিও তাই ধরে ওপরে উঠব। সে রকম চুলের কল্পনাও আজকালকার মেয়েরা করতে পারে না। অনেকে বলে, তিনি নাকি বৌকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর একমাত্র আদরের সন্তান ননীর স্ত্রী, তাকে তিনি নাকি পছন্দ করতেন না। তবে রেবা চেষ্টা করলে তাঁর মনের মত হতে পারত, রেবা যে সে চেষ্টা বিন্দুমাত্র করে নি সে বিষয়ে সুহাসনী দেবী নিঃসন্দেহ। অনেকে আবার তাঁকে শুচিবাইগ্রস্ত বলেও অপবাদ দেয়। এটাও অত্যন্ত মিথ্যা কথা। অনর্থক একটা দুর্নাম দিলেই হল! তা বলে হিন্দুর ঘরের বিধবা হয়ে আচারভ্রষ্টা হবেন নাকি তিনি? জল খরচা অবশ্য তিনি একটু বেশীই করেন। কারণ কলকাতার মেয়েদের মত জলাতঙ্ক তাঁর নেই। ওদের কাছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানে হল, ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরা আর মুখে এক ধ্যাবড়া রং মাখা। "ওপরে চিকন্-চাকন্ ভেতরে খড়ের গাদন"। না বাবা! তা তিনি পারবেন না, লোকে যে যাই

বলুক না কেন, অশোভন তিনি সহ্য করতে পারেন না। মাঝে মাঝে অবশ্য বৌকে দু'একটা কথা বলেছেন, একথা তিনি অস্বীকার করেন না, তবে সংসার করতে গেলে, ভাল শিক্ষা দিতে গেলে, মনের মত গড়ে তুলতে হলে, নিজের পুত্রবধূকে যদি দু'একটা কথা শুনিয়ে থাকেন তা হলে এমন কি দোষ করেছেন তিনি ?

অবশ্য সে নিয়ে ননীর কাছ থেকে তাঁকে কোনদিন কিছু শুনতে হয় নি, ননী তাঁর বড় বাধ্য ছেলে, বড় ভাল। কিন্তু সেও তো রইল না, তিন দিনের জ্বরে ননী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। সব ঐ অলক্ষ্মীর কাণ্ড! যেদিন থেকে ও ঘরে এসেছে সেদিন থেকেই আগুন জ্বলেছে। তুষের মত ধিকি ধিকি করে আগুন জ্বলতে সুরু হয়েছিল, তার প্রমাণ তিনি অনেক পেয়েছেন। তা না হলে জলজ্যান্ত ছেলেটা ধড়ফড় করে মরে যায় ? মনে মনে অনেক প্যাঁচও ছিল, তা না হলে স্বামী মারা যাবার এক বছরের মধ্যেই নার্স হয়ে সে বাইরে চলে যায় ? সংসারে যে তার মন ছিল না এ সুহাসিনী দেবী অনেক দিন আগেই জানতেন।

পৃথিবীতে মানুষ নেই, ভালবাসার মূল্য নেই, তা না হলে মালদহের স্বামীর ভিটে ছেড়ে তাঁকে তীর্থ করার জন্য বোনপোর বাড়ীতে আসতে হবে কেন ? সবই অদৃষ্ট !

হ্যাঁ, তা তো বটেই, বললে নৃপেশ, মাসীমার দুঃখের কাহিনী সে একমনেই শুনলে—তা হলে দেশে কে দেখাশুনো করবে ?

সে হবে এখন, তুই বাবা আমায় একটু তীর্থে যাবার ব্যবস্থা করে দে।

আমি তো যেতে পারব না মাসীমা, দেখি পরেশকে বলে।

পরেশকে বলবি ?

হ্যাঁ।

পরেশ কি আমার সঙ্গে তীর্থে যাবে ? অবিশ্বাসের স্বরে বললেন তিনি। পরেশকে সুহাসিনী দেবী ঠিক চিনতে পারেন না, তার কথাবার্তা অদ্ভুত হেঁয়ালীর মত মনে হয় তাঁর কাছে। মনে আছে, একবার সে মালদহে গিয়ে সব জমিগুলো চাষীদের বিলিয়ে দিতে বলেছিল। ছেলের একবার কথা শোন। চিরকাল তারা ভাগ দখল করে এসেছে, চাষীরা চাষ করে এসেছে, ন্যায্য ভাগ নিয়েছে—এ আবার কি কথা। সেই পরেশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তীর্থে যাবেন ?

কথাগুলো চিন্তা করে নিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, তুই কি বিয়ে করবি না, ঠিক করেছিস ? এবার অন্য প্রসঙ্গে গেলেন সুহাসিনী দেবী।

হ্যাঁ মাসীমা, বিয়ে করব না ঠিক করেছি।

তবে কি করবি ?

যা করছি, ডাক্তারী।

ডাক্তারী করলে কি কেউ বিয়ে করে না ?

কেন করবে না ?

তবে তুই করিস না কেন ?

সময় নেই বলে।

সময় নেই ?

না।

আজেবাজে কাজ করবার সময় আছে আর বিয়ে করবার সময় সেই ?

কি বলছ মাসীমা, আজেবাজে কাজ ? বিস্ময়ের ভঙ্গী করে হাসল নৃপেশ। মানুষের জীবন দান করছি যে।

হ্যাঁ, তা হলে আর ভাবনা ছিল না, ডাক্তাররা যদি জীবন দিতে পারত তা হলে আর ভাবনা কি ?

মনে পড়ে গেল তাঁর ননীর অসুখের সময় অনেক চেষ্টাই করেছিলেন তিনি। সিভিল সার্জন থেকে চার-পাচজন অন্য ডাক্তার, রেলের সেনসাহেবকে পর্যন্ত আনিয়েছিলেন। কত ওষুধ আর ইন্‌জেকসন যে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা নেই। শেষে মেরুদণ্ডটাশুদ্ধ ছেঁদা করেছিল তারা। মেনিন্‌জাইটিস হয়েছিল ননীর। চেষ্টার কি ত্রুটি হয়েছিল ? কিন্তু বাঁচান গেল না কেন ? হুঁঃ! ডাক্তাররা জীবন দান করবে! অবজ্ঞা ফুটে উঠল সুহাসিনী দেবীর মুখে। বললেন, আমার পোড়া কপাল, তা না হলে আর এমন হয়, সব উবে যায় ? ভেবেছিলাম তোদের ছেলে পিলে হবে, সংসার হবে, তোদের নিয়ে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেব। এমন বরাত বৌটাসুদ্ধ নিমকহারামী করলে! অস্ফুট স্বরে শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করলেন সুহাসিনী দেবী।

কেন, বৌদি কি খারাপ করেছে ? প্রতিবাদ করল নৃপেশ।

বলিস কি নৃপেশ ? ঘরের বউ নার্স হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে, আর তুই বলছিস খারাপ কি করেছে! আশ্চর্য হলেন তিনি।

সংসারে থাকতে হলে একটা কিছু সম্বল চাই তো।

মেয়েদের সবচাইতে বড় সম্বল হল তার স্বামীর সংসার। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন সুহাসিনী।

তা ঠিক, কিন্তু যদি স্বামী না থাকে, অন্যপরিজনের দয়ার ওপর যদি তাকে নির্ভর করতে হয়?

দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে কেন? তার জায়গা তো নিজে করে নেবে।

তুমি কি পারলে মাসীমা?

কে বললে পারি না? উত্তেজিত হলেন সুহাসিনী দেবী।

না মাসীমা, পার নি, তা হলে বৌদিও চলে যেত না, আর তুমিও আজ তীর্থে বেরোতে না।

বৌ চলে গেল তার স্বভাবের জন্যে, তার জন্যে কি আমি দায়ী? অনেকেই তো স্বামী হারায়, তাই বলে তারা কি ঘর-দোর ছেড়ে নার্স হয়ে চলে যায় নাকি?

না, যায় না। সেইজন্যেই ত বলছি, বৌদি যদি কারোর ওপর নির্ভর করতে পারত, তা হলে হয় তো নার্স হয়ে কাজ করতে যেতে হত না। আর গেলই বা মাসীমা, আজকাল তো কত মেয়ে এভাবে সংসার প্রতিপালন করছে, এতে আর অসম্মানের কি আছে?

সম্মান-অসম্মানের তুই কি বুঝবি, ছেলেমানুষ? সংসার প্রতিপালন করবে পুরুষমানুষ, মেয়েদের কাজ ঘরের ভেতর, আর তা ছাড়া সে ক'টা সংসার প্রতিপালন করছে বল তো?

কেন, তোমায় টাকা পাঠায় না?

আমি ওর টাকা নেবো কেন? বারচারেক টাকা পাঠিয়েছিল, চিঠিও লিখেছিল, কিন্তু টাকাও ছুঁই নি, চিঠিও পড়ি নি। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি বল? ক্ষুব্ধস্বরে উত্তর দিলেন সুহাসিনী দেবী।

হ্যাঁ জানি, তুমি সম্বন্ধ রাখনি বটে, কিন্তু বৌদি এখনও সম্বন্ধ রেখেছে, আর সম্মান রেখেছে।

তাই নাকি? কি রকম?

এখনও প্রত্যেক মাসে আমাকে আর পরেশকে চিঠি লেখে।

থাক বাছা, আমায় আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি, তোমরা যা ভাল বোঝ কর।

আহত স্বরে উত্তর দিলেন তিনি। রেবার পক্ষে বলার জন্যে যে অনেক লোক আছে তা তিনি বেশ ভাল জানেন।

আচ্ছা মাসীমা, তুমি কি রোজই গঙ্গাস্নান করতে যাবে? প্রসঙ্গটা পালটায় নৃপেশ।

হ্যাঁ বাবা।

তা হলে গাড়ীটা নিয়ে যেও, আমি ড্রাইভারকে বলে দেব।

তোর অসুবিধে হবে না তো? মাসীমা খুশী হয়ে বললেন।

না না, অসুবিধে আবার কি?

আর অসুবিধে হলেও উপায় নেই। মামারা গিয়েছেন, মাসীমাও দুঃখ পেয়েছেন। শুচিবাইগ্রস্ত জীবনে যদি একটু শান্তি পান তা হলে তার আপত্তি কি?

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ীর সকলে অস্থির হয়ে উঠল—সিঁড়িতে, ড্রাইংরুমে কার্পেট পাতা ছিল, সেগুলো তুলে ফেলা হল। মেঝে, দেওয়াল দু'বেলা ধোয়া সুরু হল আব সে কি যে-সে ধোয়া! রামু, যোগী সব হিমসিম খেয়ে গেল।

ওখানটা ধোয়া হয় নি তো? তদ্বির সুরু করলেন সুহাসিনী দেবী।

সে কি মা! এইমাত্র ধুয়েছি তো। রামু অবাক হয়ে গেল।

কি যে বল বাছা তার ঠিক নেই, ধোয়া হয়েছে তো জল লেগে কই?

এই তো ভিজে রয়েছে।

থাক থাক, তুমি আর ঝাঁটহাতটা দেওয়ালে দিও না। চীৎকার করে উঠলেন সুহাসিনী দেবী, নাও ঐ থামটায় জল ঢাল তো।

ওখানে যে বাবুর যন্ত্রপাতি আছে না। ভয়ে ভয়ে রামু বললে।

তা হোক, ঐ জন্যেই তো পরিষ্কার করা দরকার। কত রকমের রুগী ঘাঁটাঘাঁটি করে, নাও ঢাল।

সব জলে থৈ থৈ করছে—প্রায় সাঁতার দেবার মত অবস্থা, এতেও সুহাসিনী দেবী খুশী নন, ঠিক তাঁর মনের মত ধোয়া এখনও হয় নি।

সেদিন হন্তদন্ত হয়ে নৃপেশের ঘরে ঢুকে পরেশ বললে, দেখেছ দাদা?

হাতে পরেশের একগাদা বই, সেগুলো থেকে টপটপ করে জল ঝরছে।

মাসীমা কি কাণ্ড করেছেন দেখ, সোভিয়েট থেকে সবেমাত্র এসেছে, আমি এখনও পর্যন্ত পড়ি নি।

আমার অবস্থাও তাই। উত্তর দিলে নৃপেশ।

কেন?

যন্ত্রপাতি, ব্যাগ থেকে আরম্ভ করে জামাকাপড় সবই ধোলাই হয়ে গিয়েছে। গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল সে।

তুমি হাসছ দাদা? ক্ষুব্ধ হল পরেশ।

কি করবে বল?

কিছু বলবে না?

বললে আরও বেড়ে যাবে।

সে কি?

হ্যাঁ, মানসিক ব্যাধির নিয়মই তাই।

তা হলে? পরেশ দস্তুরমত ঘাবড়ে গিয়েছে।

সহ্য করে থাকতে হবে।

অসম্ভব! একটু চুপ করে বললে পরেশ, এখন বুঝেছি বৌদি কেন নার্স হয়েছে।

তুমি কি ভেবেছিলে, বৌদি শখ করে নার্স হয়েছে?

প্রথমে একটু বিরক্ত হয়েছিলাম বৈকি, হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, নার্স হতে যাচ্ছে।

হঠাৎ নয় পরেশ, আমরা একদিনেই উত্যক্ত হয়ে উঠেছি, আর বৌদি ননীদা মারা যাবার দু'বছর বাদে নার্স হয়েছিল—এই দু'বছর তাকে এর চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করতে হয়েছিল।

এর কি কোন চিকিৎসা নেই?

আছে, আবার নেইও।

তার মানে?

তার মানে—সাইকোঅ্যানালিসিস্ এবং আনুষঙ্গিক যা চিকিৎসা আছে, আমাদের বাঙালীর ঘরে, তা করা অনেক সময়ে হয়ে ওঠে না। আর তা ছাড়া অসুখ যখন এটা, তখন সেই ভাবেই আমাদের জিনিসটা নিতে হবে।

রোগীর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে এবং সব অত্যাচারই সহ্য করতে হবে।

কথাটা কিন্তু মনঃপূত হল না পরেশের। বললে, তা হলে এক কাজ করা যাক।

কি ?

মাসীমাকে তীর্থে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

তাই কর। হাসল নৃপেশ, চাপ না পড়লে বেশীর ভাগ মানুষই কর্তব্য এড়িয়ে যেতে চায়।

আর এগুলোর কি হবে ? ভিজে বইগুলো তুলে দেখালে পরেশ।

এক পক্ষে ভালই হয়েছে। আস্তে আস্তে বললে নৃপেশ।

ভাল হয়েছে ? আশ্চর্য হ'ল পরেশ। বললে, কি রকম ?

হ্যাঁ, উষ্ণতা একটু কমে যাবে। বললে নৃপেশ।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিয়ে পরেশ কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হাসল নৃপেশ—ছোকরা বড় অল্পেতে রেগে যায়, হিউমার জ্ঞান কম। হঠাৎ মনে পড়ল ইলার কথা। হিউমার জ্ঞান ইলারও ছিল না। মেডিক্যাল কলেজে যখন নৃপেশের ফিফথ ইয়ার তখন ইলার সঙ্গে তার পরিচয়। কান দেখাতে এসেছিল ইলা। ই-এন-টি-তে প্রফেসার ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কি অসুখ হয়েছে, সেই সম্বন্ধে বেশ লম্বা একটি বক্তৃতাও দিলেন। কান টেনে যন্ত্র দিয়ে, আলো ফেলে, নাকের ভেতর একটা নল দিয়ে, জিভটা বের করে নানা রকম কায়দায় ইলাকে পরীক্ষা করলেন মেজর মিত্র। প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল ইলার। সেই সকাল আটটায় সে এসেছে, আর বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে, তার ওপর কান ধরে, নাক টেনে যথেচ্ছাচার, এর পর কার ভাল লাগে ! ইলা এগিয়ে যেতেই প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে নৃপেশ বললে, এই নিন, ভিটামিনটা খাবেন।

ওঃ !

আর এটা আর একটা ভিটামিনের ইঞ্জেকশন, এই লোসানটা কানে দেবেন, সকালে একবার আর রাত্রে একবার।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল ইলার। ভেবেছিল, সকাল সকাল হয়ে গেলে চলে যাবে ! বাড়ী গিয়ে খেয়ে এগারটায় ক্লাস করতে পারবে, আর নিতান্তই

যদি বেশী হয় তা হলে একেবারে ক্লাস করে দেড়টায় বাড়ী ফিরবে। কিন্তু ক্লাসও হ'ল না, বাড়ী ফিরতেও দেরী হয়ে গেল। তার ওপর ভিটামিন একটা খাবার, একটা ইনজেকসান।

অসুখটা কি? জানতে চাইলে ইলা।

কানের অসুখ। না তাকিয়েই উত্তর দিলে নৃপেশ।

হ্যাঁ, তা জানি।

ও নামটা জানতে চান?

হ্যাঁ।

ওটা ইটিস মিডিয়া, বুঝলেন কিছু?

না! ওর মানে কি?

মানে জানতে হলে ডাক্তারী পড়তে হবে, তবে বোঝা যাবে—যা বলছি তাই করুন তো। নৃপেশের গলার স্বরটা শ্রুতিমধুর নয়।

মানুষ যে এত অসভ্য হতে পারে এ ধারণা ইলার ছিল না, কাগজটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল।

আর শুনুন! থমকে দাঁড়াল ইলা।

আমায় বলছেন?

হ্যাঁ।

কি বলুন।

বলছি দুধ খাবেন।

দুধ?

হ্যাঁ দুধ, তা না হলে কান সারবে না।

ওঃ! রাগে কান দুটো লাল হয়ে গেল ইলার।

কিছুদিন পরেই আবার ইলার সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে দেখা। চানাচুর কিনছিল সে, গেটের পাশে যে লোকটা চানাচুর বিক্রী করে তার কাছ থেকে। মুখ তুলতেই ইলা দেখতে পেল নৃপেশ দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারল—ইলার কৌতূহল হল, মনের অবস্থা ঠিক সেদিনের মত নেই। এই লোকটার কথা ক'দিন ধরেই ও ভেবেছে—ভদ্রতার মুখোস নেই, ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে না—মেয়েদের দেখলেই নুয়ে পড়ে না। কিন্তু খেয়ালী বলে মনে হয়।

দুজনেই হাসল।

কানটা কমেছে। ইলাই প্রথম কথা বললে।

ইনজেকসান নিয়েছিলেন? নৃপেশ আরও এগিয়ে এল।

হ্যাঁ। চানাচুরের প্যাকেটটা হাতে ধরা আছে ইলার।

দুধের বদলে চানাচুর? নৃপেশ তাকালে তার হাতের দিকে। বললে, তা হলে যে কান কালা হয়ে যাবে। কিছু বলার আগেই ইলার হাত থেকে চানাচুরের প্যাকেটটা তুলে নিল নৃপেশ।

বাঃ, বেশ খেতে তো? মুখে গোটাকতক দিয়ে বললে নৃপেশ, আপনিও নিন।

ইলা হাত পেতে নিলে। দেওয়াটা যেন নৃপেশের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে! কিন্তু ইলার খুব ভাল লাগল, ওরই জিনিস নৃপেশ ওকেই দিচ্ছে। কি রকম একটা নূতন স্বাদ পেল যেন। লোকটার কিন্তু কোন আড়ষ্টভাব নেই, কোন সঙ্কোচ নেই তা সে লক্ষ্য করল।

আমি কিন্তু ডাক্তার নই। বললে নৃপেশ।

ডাক্তার নন? আশ্চর্য হ'ল ইলা।

না, এইবার ফাইনাল দেব।

ওঃ!

আমার নাম নৃপেশ মুখার্জি। নিজের পরিচয় দিলে নৃপেশ।

আমার নাম···

জানি। বাধা দিলে নৃপেশ, ইলা মৈত্র, না?

হ্যাঁ।

এত রোগা কেন? হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল নৃপেশ, অসুখ করেছিল কিছু?

কৈ না তো! কি অদ্ভুত প্রশ্ন, লোকটার কি মাথা খারাপ—দৈহিক প্রশ্ন ছাড়া অন্য কথা লোকটা বোধ হয় জানে না। ভাবল ইলা।

তবে!

না, এমনি।

এই সব আজেবাজে জিনিস খেলে কি আর শরীর ভাল থাকে।—আচ্ছা চলি, আমার বাস এসে গেছে। চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল নৃপেশ! হাতে চানাচুরের প্যাকেটটা।

ইলা কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আপন মনে বলে উঠল, লোকটা নির্ঘাৎ পাগল।

একথাটা আরও একবার শুনেছিল নৃপেশ, বলেছিল আর একটি মেয়ে—প্রতিমা ঘোষাল। মেডিক্যাল কলেজে একসঙ্গে পড়ত ওরা। সুন্দরী হিসেবে প্রতিমার নাম ছিল, কলেজের ছাত্র থেকে স্থরু করে দু'একজন অধ্যাপকও তার সঙ্গে দরকারে-অদরকারে আলাপ করার চেষ্টা করতেন। সে দিক দিয়ে প্রতিমাও খুব সচেতন ছিল। তার সঙ্গে আলাপ করা যে-কোন পুরুষমানুষের পক্ষেই যে স্বাভাবিক, তা সে নিজেই অনুভব করে। সুতরাং নৃপেশ মুখার্জির তাচ্ছিল্য তাকে আহত না করলেও স্পর্শ করেছিল একথা বলা চলে। তা না হলে প্রতিমা ঘোষালের মত মেয়ে যেচে আলাপ করতে নিশ্চয়ই আসত না।

সেদিন প্যাথলজি ক্লাসের পর প্রতিমা নৃপেশকে বললে, আপনার নোটটা একটু দেবেন ?

একবার আড়চোখে তাকালে নৃপেশ, তার পরে বললে, কেন বলুন তো ?

ক্লাসে সবটা লিখতে পারি নি তাই। সুন্দর ভঙ্গী করল প্রতিমা ঘোষাল।

একটু না লিখলেও আশ্চর্য হতাম না।

কেন ?

পড়তে তো আসেন নি, এসেছেন শাড়ী আর গয়নার বিজ্ঞাপন দিতে।

তার মানে! বিগলিত ভাবের বদলে যুদ্ধং দেহি ভাবের প্রকাশে প্রতিমা হতচকিত হয়ে পড়েছিল।

মানে অত্যন্ত সহজ। উত্তর দিলে নৃপেশ।

আপনার কি সাধারণ কার্টসি জ্ঞানটুকুও নেই ? প্রতিমা যেন রাগে কাঁপছে।

আছে, কিন্তু সকলের সামনে তো আর মুক্তো ছড়ানো যায় না। সে যাই হোক, সুধীর, রমেন, তপন সকলেই তো রয়েছে, অথচ আমার কাছে হঠাৎ নোট চাইতে এলেন কেন, এ্যাডমায়রার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান নাকি ?

সেদিন প্রতিমা ঘোষাল কোন জবাব না দিয়েই চলে গিয়েছিল, কারণ জবাব দেবার মত অবস্থা তার ছিল না। এ নিয়ে ক্লাসে বেশ সোরগোলও পড়ে গিয়েছিল। রীতিমত দুটো দলের সৃষ্টি হয়ে ঘোরতর তর্ক আর উন্মাদনার স্রোত বয়ে চলল বেশ ক'দিন। প্রতিমা ঘোষালও অত সহজে ছাড়বার মেয়ে

নয়। দু'একটা সুযোগও পাওয়া গেল বটে, কিন্তু নৃপেশকে ঠিক বাগে পাওয়া গেল না, পাশ কাটিয়ে পাঁকাল মাছের মত পালিয়ে গেল সে। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার উত্তেজনায় জিনিসটা ধামাচাপা পড়ে গেল।

সেবার সীট্ পড়ল দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসের টপ ফ্লোরে। হল তো নয়, যেন একটা ফুটবল খেলার মাঠ। ছেলে-মেয়ে-গার্ড-বেয়ারাতে একেবারে জনাকীর্ণ। গম-গম করছে চতুর্দিক, সবুজ রঙের ছোট ডেস্ক, পিছনে তার একটা করে টুল। হলের মধ্যে সারি সারি পাতা রয়েছে সেগুলো। যথাসময়ে সেই চিরপরিচিত ঘণ্টাটা তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারে বেজে উঠল ঢং-ঢং। 'সাইলেন্স প্লীজ'—কয়েক জন গার্ড চীৎকার করে উঠল। প্রিসাইডিং অফিসার বসে রয়েছেন অদূরে ডায়াসের ওপর। খাতা দেওয়া সুরু হয়ে গিয়েছে—ত্রস্তপদে গার্ডেরা লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে খাতা বণ্টন করতে করতে—নিমন্ত্রণ বাড়িতে অভ্যাগতদের পাতে লুচি দেওয়ার মত। সেখানে ভোক্তার দল পূরণ করতে যায়, এখানে করে উদ্গীরণ। পরীক্ষার্থীরা কলম-পেনসিল বার করে রেখেছে, কেউ বা টেবিলের তলায় মোটা ব্লটিং পেপার দিয়ে সেটার স্থৈর্য আনার ব্যবস্থা করছে। গুঞ্জনধ্বনিটা ধীরে ধীরে কমে আসছে, মৌমাছি ফুলের ওপর বসেছে যেন। প্রশ্নপত্র বিতরণ সুরু হয়ে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই, দু'একজন হাসার চেষ্টা করলে, কিন্তু সেটা ঠিক হাসির মত বলে মনে হ'ল না। নৃপেশ খাতাটা ভাঁজ করে নিলে। হঠাৎ নজর পড়ল ডান দিকে। প্রতিমা ঘোষালের সীট্ ঠিক তার পাশেই পড়েছে। প্রতিমাও তাকে দেখেছে, তাই ঠোঁটের কোণে রয়েছে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের হাসির রেশটুকু। মুখ ফিরিয়ে নিলে প্রতিমা ঘোষাল—কানে চুণীর ফুলটা ঝক্-ঝক্ করে উঠল। মসীকৃষ্ণ চুলের ফাঁকে সুডৌল গ্রীবাভঙ্গীটি মনোরম ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। আশেপাশের ছেলেরা কয়েক মুহূর্ত শেষবারের মত দেখে নিল প্রতিমাকে। পরীক্ষার ভয়টা ছবির মাধুর্যকে যেন ঢেকে দিয়েছে। নৃপেশ প্রশ্নপত্র পেল। পাবার ঠিক আগের মুহূর্তটা একটু অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক, হৃদ্-পিণ্ডটা বক্ষপঞ্জরের মধ্যে দ্রুতগতিতে চলতে সুরু করে। কানের পাশে অকস্মাৎ জ্বালা করতে থাকে, লাল হয়ে ওঠে কান দুটো হাতের তালু দুটো অকারণে ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্নপত্র পাবার পর খুশীই হল সে, কারণ সবগুলিই তার ভাল ভাবে জানা আছে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাইরের কয়েকটা জার্নাল

নৃপেশ রীতিমত পড়ে। ল্যানসেট্ এবং ব্রিটিশ ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্নালের নিয়মিত পাঠক সে। প্রত্যেক প্রশ্নটা ভাল ভাবে মনে মনে ছক্ করে নিলে, তার পর নৃপেশ লিখতে সুরু করল ঝড়ের বেগে। নির্ভুল অঙ্কের মত, প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে স্পষ্ট আর সুবিন্যাস ভঙ্গতে গড়ে উঠতে লাগল উত্তরের ইমারত। শিল্পীর নিখুঁত তুলির স্পর্শে যেন ফুটে উঠতে লাগল মনোরম একটি ছবি।

মৃদু গুঞ্জনধ্বনি হঠাৎ কানে এল নৃপেশের। একবার তাকিয়ে দেখল সে, প্রতিমা জল খাচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জন গার্ড মোটা বেঁটে ধরনের, টুথ ব্রাসের মত খোঁচা গোঁফ। সগৌরবে সার্টের ওপর ব্যাজটা সেফটিপিনে দোদুল্যমান।

আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ? আস্তে আস্তে গার্ড জিজ্ঞাসা করলে প্রতিমাকে।

আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল নৃপেশ। প্রতিমা ঘোষালকে ঠিক সুস্থ বলে মনে হল না। গার্ড ডায়াসের দিকে এগিয়ে গেল।

লিখতে পারছি না কিছুই। প্রতিমা কান্নার সুরে নিকটস্থ একজন এ্যাড-মায়রার তপনকে বললে।

চেষ্টা করুন, সৎ উপদেশ দিয়ে তপন লিখে চলল। অযথা সময় নষ্ট করা চলবে না। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা', নিজেকে না বাঁচলে অন্য কেউ বাঁচাবে না, তা সে বিলক্ষণ জানে। আর প্রতিমার বিষয়ে তার এমন কোন দায়িত্ব নেই। অবশ্য প্রতিমার সঙ্গসুখ কয়েকবার সে লাভ করেছে, কিন্তু সেটা এমনকিছু গুরুতর ব্যাপার নয়, সহপাঠিনীর সঙ্গে নিজের খরচে সিনেমা বা রেস্তরাঁয় গেলে যে তার সম্বন্ধে পরীক্ষার হলেও পাস করবার দায়িত্ব নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং তপন দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের কাজ করে যেতে লাগল, প্রতিমা ঘোষাল অস্থির হয়ে পড়ল। এই একটা মাত্র পরিস্থিতি যেখানে সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মনে করার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার সব শক্তিও ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমা হাপুস নয়নে কাঁদতে সুরু করে দিলে। দিগভ্রান্তের মত, এলোমেলো ঝড়ের মত মনের অবস্থা হল তার। প্রতিমার চিন্তা করার ধৈর্য আর অবশিষ্ট নেই যেন।

নৃপেশবাবু ! ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে ডাকল প্রতিমা ঘোষাল। ডুবন্ত লোকে কুটো অবলম্বন করেও বাঁচতে চায়। অবাক হয়ে তাকাল নৃপেশ।

আমায় বলছেন ?

হ্যাঁ, আমি যে কিছু লিখতে পারছি না। ফিসফিস করে বললে প্রতিমা।

সে কি ? বিস্মিত হ'ল নৃপেশ, আর হাতে সময়ও তো বেশী নেই। আচ্ছা, আমি খাতা খুলে রাখছি, আপনি লিখুন। প্রতিমা একটু সরে এল। নৃপেশ খাতাটা খুলে রাখল তার চোখের সামনে। প্রতিমা একমনে টুকে নিচ্ছে তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা।

হয়েছে ? প্রশ্ন করল নৃপেশ। আরও একটা প্রশ্ন লিখতে বাকী রয়েছে তার।

হ্যাঁ, আর একটু। প্রতিমার স্বরে মিনতি।

নো টকিং প্লীজ। বেঁটে গার্ডটা পরিক্রমা শেষ করে এগিয়ে এল সেই দিকে, তার পরে নৃপেশের দিকে তাকিয়ে বললে, কথা বলছেন কেন ?

কৈ, এমন আর কি !

হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি।

ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, কুশল-সংবাদ নিচ্ছিলাম।

আই ওয়ার্ন ইউ। একটা আঙুল তুলে শাসনের ভঙ্গীতে চাপা গলায় কথাটা উচ্চারণ করে বেঁটে গার্ডটা এগিয়ে গেল ডায়াসের দিকে।

নিন, ছবিটা এঁকে ফেলুন। বললে নৃপেশ।

ছবিটা নিজের খাতায় এঁকে নিলে প্রতিমা। মুখটা এবার তার বেশ হাসি হাসি। ঢং ঢং করে আবার ঝঙ্কার দিয়ে ঘণ্টাটা বেজে উঠল। স্টপ রাইটিং প্লীজ ! গার্ডেরা সমস্বরে চীৎকার করল। বাইরে বেরিয়ে নৃপেশ দেখল প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে এগিয়ে এল সে হাসি মুখে। কৃতজ্ঞতাবোধ সকলেরই আছে, প্রতিমারও ছিল। কিন্তু কিছু বলার পূর্বেই নৃপেশ বললে, কাল আমার সীট্‌টা বদলে ফেলছি।

সে কি ? আকাশ থেকে পড়ল প্রতিমা।

হ্যাঁ, প্রিসাইডিং অফিসারের পারমিসানও নিয়েছি। কথাটা বলে নৃপেশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। প্রতিমা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের অজ্ঞাতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলে, লোকটা পাগল।

হাঁ রে নৃপেশ ! তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। মাসীমা এসেছেন কাজের ফাঁকে।

কি বল? মাসীমার দিকে তাকাল নৃপেশ।

তুই কি পরেশের জন্যে মেয়ে দেখেছিস?

হ্যাঁ, সে কথা তো তোমায় চিঠিতে জানিয়েছি।

সে চিঠি আমি পাই নি—আজকাল ডাকঘরের যা গণ্ডগোল হয়েছে। হ্যাঁ, ভাল কথা, মেয়ে দেখতে কি রকম?

ভালই।

ওরা আমার শ্বশুড়বাড়ীর সম্পর্কে জ্ঞাতি। আরামবাগের বাঁড়ুজ্যে। লোক কেমন বল তো?

ভালই।

ব্রজেশ্বর পুলিসে কাজ করে, তা হোক, লোক কিন্তু খুব ভাল, জানিস এককালে ওরা বেশ বড়লোক ছিল। আরামবাগে ওদের সকলেই চেনে, খুব নামডাক।

আরামবাগের জনসাধারণের বাঁড়ুজ্যেদের সম্বন্ধে মতামত জানবার জন্য নৃপেশ খুব উৎসুক নয়।

পরেশকে কিছু বলেছ নাকি মাসীমা?

বলতে আমার কসুর নেই বাবা, তোমাকেও বলেছি, পরেশকেও বলেছি। তবে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোঝান শক্ত।

মাসীমা সুযোগ পেলেই একালের মস্তক চর্বণ করে থাকেন।

তা হলে তোমরা তীর্থে থেকে ঘুরে এস, তারপর যা হয় কথাবার্তা পাকা করা যাবে।

হ্যাঁ, আর একটা কথা নৃপেশ।

বল মাসীমা।

তোর ঐ লম্বামত চাকরটা কি জাত বল্ তো?

তা তো জানি না।

সে কি রে, কি জাত, তাও খবর রাখিস্ না! এত বড় একটা দরকারী ব্যাপার সম্বন্ধেও মানুষ খোঁজ রাখে না, এ মাসীমার ধারণার বাইরে।

কেন বল তো!

কেন আবার কি! দিনরাত ঘরের ভেতর যাচ্ছে আসছে, কি কাণ্ড বাবা!

আচ্ছা, আমি বারণ করে দেব না হয় তোমার ঘরে যেতে।

সে আমি নিজেই করব।

দ্রুত প্রস্থান করলেন মাসীমা। যা কিছু ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতে পারবেন। সে ক্ষমতা তাঁর আছে। হাসল নৃপেশ—নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে মেয়েদের মতামত খুব স্পষ্ট, তা ছাড়া হিউমার জ্ঞান নেই বললেই হয়। মনে পড়ল নৃপেশের, ইলার জন্মদিনে নিমন্ত্রণের কথাটা। ড্রইং-রুম, সোফা, কৌচের ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের অনুষ্ঠান, বন্ধুর দলই বেশী—সমারোহ নেই, তবে পরিচ্ছন্নতা আছে। যথাসময়ে এল নৃপেশ। হাসিমুখে এগিয়ে এসে ইলা অভ্যর্থনা করে বললে, আস্থন।

একটা ট্যাক্সি নিলে রবার্ট ডগলাস। সাধারণতঃ যখন সে ডিউটিতে যায় তখন বাসে বা ট্রামেই তার কাজ চলে যায় কিন্তু কেট্ এবং লগেজের জন্যে ট্যাক্সি ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, সুতরাং ট্যাক্সিই নিলে সে। মাল নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়াটা চুকিয়ে কেটের কাছে পাসটা দিয়ে দিলে রবার্ট, তারপর চলে গেল তার হাজিরা দিতে।

ইঞ্জিনে ডিউটি দেবার আগে ড্রাইভারদের এ্যাপিয়ারেন্স বুকে সই করতে হয়, তা ছাড়া চশমা থাকলে স্পেকটিক্যাল রেজিষ্টারেও সই করা দরকার। ড্রাইভার যে ইঞ্জিনে কাজ করে তার সম্পূর্ণ ওজন, এ্যাক্সেল লোড এবং টাইপও জানা উচিত। ট্রেনের বুকড স্পীড, লাইনের ম্যাক্সিমাম স্পীড, ট্রেনের লোড এবং ইঞ্জিনীয়ারিং স্পীড, রেষ্ট্রিকসান কোথাও আছে কিনা তা পূর্বেই জানার প্রয়োজন আছে।

কপালের ওপর টুপীটা নামিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস। পথে গার্ডের সঙ্গে দেখা হল, ঘড়িটা সেই সুযোগে মিলিয়ে নিল সে। ইয়ার্ডে গিয়ে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করল, তার পর সে নির্দিষ্ট ইঞ্জিনটায় গিয়ে উঠল। আবদুল, পাণ্ডে এবং খালাসী ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে। গরম ইঞ্জিনটার মধ্যে উঠে খুব ভাল লাগল রবার্টের। বন্ধুত্বের উত্তাপ যেন মিশে রয়েছে ওটার সঙ্গে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কোমরে হাত দিয়ে ইঞ্জিনের চারিদিকটা একবার দেখে নিলে রবার্ট। মনটা এতক্ষণ যেন তার নিস্তেজ হয়েছিল। কোলাহল, ইঞ্জিনের ধোঁয়া, ষ্টীমের একটানা

হুহু ধ্বনি, ধুলো আর কঠিন ইস্পাতের স্পর্শ এতক্ষণে যেন শক্তি আর সজীবতা সঞ্চারিত করল তার মধ্যে।

কন্ট্রোল রুম থেকে অর্ডার আসার পর ইঞ্জিনটা পিছু হটিয়ে নিয়ে চলল সে ৭নং প্ল্যাটফর্মের দিকে। অবশ্য আবদুলই সব করছে, কারণ ইঞ্জিন চালনার প্রাথমিক ব্যাপারগুলো ইতিমধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এর আগে সান্টিংয়ের কাজও অনেকদিন করেছে আবদুল। নিয়মগুলো তার প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে—যেমন স্টার্টার সিগন্যালের পিছনে সান্টিং করতে হলে ব্লক ব্যাক করতে হয় এবং ড্রাইভারকে ও-পি-টি সেভেন্টিনাইন দিতে হয়, কিংবা স্টার্টার সিগন্যালের আগে বা এ্যাডভান্স স্টার্টারের ভেতরে সান্টিং করতে হলে ড্রাইভারকে শুধু ও-পি-টি সেভেন্টিনাইন দিলেই হয়। শুধু তাই নয়, ইঞ্জিনে বা গাড়িতে লাগান বাতির তারতম্যও সে ভাল ভাবেই জানে, যেমন লোকো-ইয়ার্ডে পাইলটের আলো হয়, আগের বাফারে লাল এবং পিছনের বাফারেও লাল। আবার ট্রাফিক-ইয়ার্ডে পাইলটের আলো হয়, বাঁ দিকে আগে লাল, পিছনে সাদা এবং ডান দিকে আগে সাদা পিছনে লাল রঙের। ইঞ্জিনের হুইসেলের প্রভেদ সম্পর্কেও তার আর নতুন করে কিছু জানার নেই। ইঞ্জিন লোকো-ইয়ার্ড থেকে ট্রাফিক-ইয়ার্ডে যাবার জন্যে দুটো ছোট ছোট হুইসল বাজাতে হয়, আবার যখন ট্রাফিক থেকে লোকো যাওয়া প্রয়োজন হয় তখন বাজাতে হয় পর পর দুটো লম্বা সিটি।

অদূরে ৭নং প্লাটফর্মটা দেখা গেল। ইতিমধ্যে বগিগুলো সেখানে রাখা হয়ে গিয়েছে, রেগুলেটারে চাপ দিয়ে গতিটা মন্দীভূত করল আবদুল। রবার্ট ডগলাস ঝুঁকে পিছন দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠিক হ্যায় সাহাব? জিজ্ঞাসা করল আবদুল।

ঠিক হ্যায়। উত্তর দিলে রবার্ট! ঘটাং আওয়াজ হল একটা, ট্রেনে ইঞ্জিন জোড়া হল।

নেমে এল রবার্ট ডগলাস প্ল্যাটফর্মের ওপর, একবার তাকিয়ে দেখল—জনাকীর্ণ ৭নং প্ল্যাটফর্মের দিকে, সেখানে প্রচণ্ড ভীড় হয়েছে, লড়াই হচ্ছে যেন একটা।

কপালের ওপর থেকে টুপিটা একটু উঠিয়ে দিলে সে, তার পর একদৃষ্টে

ভীড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল কেট্‌কে। কিছুক্ষণ পরেই কেট্‌কে দেখা গেল। একটা কুলির মাথায় লগেজগুলো চাপিয়ে পিছনে আসছে কেট্‌। কেট্‌ কুলির পিছু পিছু চলছে কেন তা রবার্ট বুঝেছে। অতিরিক্ত সাবধান এবং সন্দিগ্ধচিত্ত সে। সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে, তার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে পড়ে মাঝে মাঝে রবার্টও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। আবদুলের হাত থেকে জুট এবং অয়েলক্যান নিয়ে ইঞ্জিনের কাছে এগিয়ে গেল রবার্ট। জার্নাল পিষ্টন কভারগুলো একবার হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করল সে, তার পর ক্র্যাক এ্যাক্সেলটার দিকে তাকিয়েই রইল কয়েক মুহূর্ত। ক্র্যাক এ্যাক্সেলের ঠিক ওপরে এবং নীচে রয়েছে ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড এক্‌সেন্টিক। তা থেকে চলে গিয়েছে একসেন্টিক রড দুটো, আর দুটোর মধ্যে রয়েছে কনেক্‌টিং রডটা। ভাল লাগে রবার্টের এগুলো দেখতে, মনে হয় যেন সবই জীবন্ত। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এদের সঙ্গ পেলে সে ক্লান্তিবোধ করে না একটুও, সন্দেহচিত্ত কেটের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর কৈফিয়তের কথা যেন ভুলিয়ে দেয় এরা।

সুনীল রায় এবং হাসনু মানে শ্রীলেখা যখন স্টেশনে পৌছলো তখনও ট্রেনের সময় হয় নি। একটু আগেই ওরা এসে পৌছেছিল। হাসনুর পরনে ছিল সুনীলের দেওয়া সবুজ লেডিজ কোটটা। সাদা নাইলনের শাড়ীর সঙ্গে হালকা ধরনের জুয়েলারী অর্থাৎ হীরের কয়েক গাছা চুড়ি, মুক্তো-পান্নার মানতাসা আর এক ছড়া বড় মুক্তোর মালা পরেছিল সে। সবুজ কোটের অন্তরালে কারুকার্যখচিত গাঢ় লাল রঙের চোলীর অনেকাংশই গোপন রয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের সম্যক প্রকাশ ব্যাহত হয় নি। ওদের কাছাকাছি বেশ একটা ছোটখাট ভীড়ের সৃষ্টি হল। কারণ সিনেমা স্টার হিসাবে ইতিমধ্যে কয়েকটা ছবিতে আত্মপ্রকাশ করে শ্রীলেখা জন-প্রিয়তা অর্জন করতে সুরু করেছে বলা চলে। শ্রীলেখা কিন্তু বিরক্ত হয়েছিল, প্রথমতঃ এভাবে হঠাৎ যে তাকে সুখের নীড় ছেড়ে দূরদেশে পাড়ি দিতে হবে একথা সে কল্পনাও করে নি, আর দ্বিতীয়তঃ স্টেশনে এসে যখন শুনল তাদের জন্য আলাদা 'কূপে'র ব্যবস্থা হয় নি, তখন সে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হল। সুনীল রায়ের সঙ্গে একসঙ্গে এক 'কূপে'তে ভ্রমণের কথাই সে মনে মনে ভেবে নিয়ে-

ছিল, কিন্তু কার্যতঃ নান্নুভাই এবং কোম্পানির অন্যান্য লোকের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণের ব্যবস্থা দেখে সে ক্রুদ্ধই হল।

সুনীল রায় একবার তাকিয়ে দেখল তার রক্তাভ মুখের দিকে। হাসনুর মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তার কিছুটা অনুমান করতে সে সক্ষম বৈকি। জনাকীর্ণ স্টেশনের মধ্যে হাসনু অন্ততঃ তার ক্রোধটা সম্যকভাবে প্রকাশ করতে পারবে না জেনে মনে মনে আশ্বস্ত হল সুনীল রায়।

পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে এই ধরনের কোন কারণ ঘটলে বেশ কয়েক ডজন গ্লাস, ডিস, ফুলদানী বা গ্রামোফোনের রেকর্ড চূর্ণ হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কাল-বিলম্ব না করে সুনীল রায় অন্য ব্যবস্থার চেষ্টা সুরু করল। অবশেষে বেশ কিছু অর্থের বিনিময়ে দুটো আলাদা বার্থ পেয়ে মনে মনে খুশীই হল সে।

কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বসল হাসনু। মুখে তার বিরক্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। লিপষ্টিকরঞ্জিত অধরোষ্ঠ মুক্তদন্ত দিয়ে দংশন করে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে রইল সে।

ফিল্ম ডাইরেক্টর ধীরেন ভড় শুধু বিরক্ত হয় নি—৭নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সে নিজের ভাগ্যকেও ধিক্কার দিচ্ছিল। বহুক্ষণ পূর্বেই সে স্টেশনে এসেছে। দেশাই ফিল্মসের সে বেতনভোগী ডাইরেক্টর বটে কিন্তু ফিল্ম ডাইরেকসন ছাড়াও বিনা বেতনে তাকে উপরি কাজ করতে হয় প্রচুর। যেমন নিয়মিত নান্নুভাই দেশাইয়ের বড়বাজারের বাড়িতে ধরনা দেওয়া, দৈনিক তাদের শারীরিক কুশলসংবাদ নেওয়া, দায়ে-অদায়ে এবং কাজেকর্মে অযাচিত ভাবে পরিশ্রম করা এবং প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে স্তুতিবাদ ও তোষামোদ করা ইত্যাদি। এ কাজ-গুলি তার অলিখিত কর্তব্যকর্মের মধ্যে কয়েকটা বলা চলে। জনাকীর্ণ ৭নং প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে ধীরেন ভড় তাই নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে অদূরে প্রবেশপথের গেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। সপারিষদ নান্নুভাই দেশাই এখনও এসে পৌছতে পারে নি। নান্নুভাইকে সম্বর্ধনা জানাবার এবং লগেজের তদ্বির করার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। সে জানে এ কাজটি না করলে ভবিষ্যতে অন্যদিক দিয়ে কর্মক্ষেত্রে অকস্মাৎ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দেরী হবে না।

নীল রঙের প্যাণ্টের ওপর লাল হরিণমার্কা হাওয়াই-সার্ট-পরিহিত ধীরেন ভড় অস্থির ভাবে কয়েক পা পদচারণা করে অর্ধদগ্ধ কাঁচি সিগারেটটায় অগ্নি সংযোগ করল। পুরো একটা সিগারেট একেবারে খাবার মত বিলাসিতার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। সুতরাং সিগারেটটা নিভিয়ে রেখে দেয় পরে ব্যবহারের জন্য। হঠাৎ গেটের অদূরে নানুভাইকে দেখা গেল। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ধীরেন ভড়, কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হতেই তার গতি রুদ্ধ হল। একপাশে প্রকাণ্ড কাঁচঘেরা মেঠাই-ওয়ালার ঠেলা রাখা, অপর পাশে প্ল্যাটফর্মের ওপর চতুর্দিকে ছত্রাকারে হাঁড়িকুঁড়ি ছড়িয়ে বসে রয়েছেন একজন বৃদ্ধা, সুতরাং বিপদে পড়ল সে, না পারে এদিক যেতে না পারে ওদিক অগ্রসর হতে।

সুহাসিনী দেবী নিজেই কয়েকটা হাঁড়ি এবং টিন সরিয়ে পথ করে দিতে ধীরেন ভড় ঊর্দ্ধশ্বাসে গেটের দিকে ছুটে চলল। পরেশ দৃশ্যটি দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তা ছাড়া করার মত তার কিছুই ছিল না। এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে আসতে তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দাদার একান্ত অনুরোধে তাকে একটু আগেই যাত্রা করতে হয়েছিল। এখন সে ভাবছে এরপরে স্টেশনে পৌছালে নিশ্চয়ই ট্রেন পাওয়া সম্ভব হত না। কারণ মাসীমা তাঁর চিঁড়ের হাঁড়ি, টিনের বাক্সে বড়ি, আমসত্ত্ব, গঙ্গাজলের কলসি, গঙ্গামাটি ইত্যাদি মূল্যবান মালপত্রগুলি ট্যাক্সি থেকে নানা অবাঞ্ছিত স্পর্শ বাঁচিয়ে যখন প্ল্যাটফর্মে পৌছলেন তখন প্রায় ৪৫ মিনিট গত হয়ে গিয়েছে।

মাসীমাকে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ যে তাকে ভুগতে হবে তা সে পূর্বেই কতকটা অনুমান করে নিয়েছে। নৃপেশ এবং পরেশ যখন শুনল যে ট্রেনে ভ্রমণকালীন মাসীমা জল-স্পর্শও করবেন না, তখন তারা দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এতখানি দীর্ঘপথ জলস্পর্শ না করে কি ভাবে যে তিনি কাটাবেন তা তারা বুঝতে সক্ষম হয় নি। তাদের অনুরোধে অবশ্য কাজ কিছুই হয় নি, মাসীমা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুবিধবার পক্ষে উপবাস করাটা এমনকিছু একটা ভয়াবহ নয়, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। বরং উপবাস না করলেই নাকি তাঁরা অসুস্থ বোধ করেন।

সে যাই হোক, সৌভাগ্যবশতঃ টিকিট দুটো আগেই কেনা ছিল, কিন্তু পরেশ তা সত্ত্বেও মাসীমাকে নিয়ে দস্তুরমত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কয়েকবার

সামলাবার বিফল চেষ্টা করে, অবশেষে সে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করল। তাতে আর কিছু না হোক, নিজের চিত্তবৈকল্য থেকে মুক্তি পেল সে। অতিকষ্টে সুহাসিনী দেবীকে তাঁর মূল্যবান মালপত্রগুলিসহ একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে পরেশ প্ল্যাটফর্মে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ পরে স্টেশনের চতুর্দিকটা দেখার সুযোগ পেয়ে পরেশ মনে মনে খুশি হল। জনস্রোত বয়ে চলেছে একধার থেকে অন্যধারে, মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই তার, সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল পরেশ। বিশৃঙ্খলা, চীৎকার, হুড়োহুড়ির তাণ্ডব সব লক্ষ্য করে মনটা যেন তার বিষাদে ভরে গেল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যেই সেটা বেশী লক্ষণীয়। রুগ্ন, দরিদ্র, অশিক্ষিত এই লোকগুলো যেন যন্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। শীর্ণ শুষ্ক দেহে বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অকারণ ছুটোছুটি আর চীৎকার করে চলেছে অনবরত। এই হল সাধারণ ভারতীয় জনতা, ভাবছে পরেশ—সবকিছুরই অভাব এদের। প্রথমতঃ, খাদ্যের অভাব, ক্ষুধা মানুষের আদিম অনুভূতির মধ্যে প্রধান। অনুভূতিটা যে মানুষকে কোথায় নামিয়ে দিতে পারে তার ঠিক নেই। মনের পটভূমিতে ধাক্কা লেগে রূপ তার বার বার পালটে যায়। পরেশের হঠাৎ মনে হল যেন একটা অসহায় আর ক্লান্ত, ঘোড়াকে তীব্র কশাঘাতে দৌড় করান হচ্ছে, জোর করে সফেন মুখে লাগামের রাশটা কঠিন বজ্রমুষ্টিতে কে যেন ধরে রেখেছে। একটা যন্ত্রকে যেন পরিমাণ মত তেল না দিয়ে চালনা করা হচ্ছে নিয়মবহির্ভূত ভাবে। ঐ শীর্ণ শুষ্ক হাতপাগুলো যেন সেই বিকল যন্ত্রের কয়েকটা অকেজো ভগ্নাংশ। মানসচক্ষে সে যেন দেখতে পেল এই অসংযত জনসমুদ্রের মধ্যে আশার ইঙ্গিত। মনে পড়ল রাশিয়ার কথা, সেখানেও শিক্ষা ছিল না, সংযম বা সংহতি ছিল না। তবুও ধীরে ধীরে তারা দেশকে নবজীবনের বাণী আর সাম্যের নীতি দিয়ে গড়ে তুলেছে। অকস্মাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল পরেশের।—কিছুক্ষণ ধরে সে একটা অস্বস্তি বোধ করছিল—কারণটা ধরা পড়ল এতক্ষণে—অনেকগুলো ক্ষুদে নিশাচর পোকা তার অনাবৃত গলা এবং ঘাড় একযোগে আক্রমণ করেছে, হাত দিয়ে সেগুলো নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল সে। পরেশ লক্ষ্য করল যে, সে এতক্ষণ একটা আলোর নীচেই দাঁড়িয়েছিল। আলোটা ঘিরে ছোট ছোট অগুনতি পোকা জলস্তম্ভের আকারে সেখান থেকে নেমে আসছে।

একটু দূরে সরে গিয়ে কালো ফ্রেমের চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে সযত্নে মুছে নিলে, তার পর কয়েক বার আঙ্গুলী সঞ্চালন করল তার রুক্ষ চুলের মধ্যে ; কারণ অনেকগুলো পোকা ইতিমধ্যে তার চুলের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। দংশনের জ্বালা নেই বটে, কিন্তু উপস্থিতির অস্বস্তি আছে প্রচুর।

একটি মেয়ে পাশের উচ্চশ্রেণীর কামরায় উঠল। পরেশ একবার তাকিয়ে দেখল, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতই বটে। মুখের ভাবে বেশ একটা বলিষ্ঠ সতেজ ভাবের প্রকাশ রয়েছে। এ রকম মেয়ে পার্টিতে থাকলে কাজের অনেক সুবিধা হয়—ভাবল পরেশ। আদর্শের সঙ্গে কাজের খাপ খাইয়ে চলতে জানে এ ধরনের মেয়েরা। পরেশ লক্ষ্য করল মেয়েটির রুচিজ্ঞানও বেশ আছে, কাপড়জামা সাধারণ বলা চলে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। চুলটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে বেণীবদ্ধ, দেহের রংটা একটু নিরেশ, তা হোক—ভাবল পরেশ। ঐ রংই মেয়েটিকে ভাল মানিয়েছে। বিখ্যাত রং-ব্যবসায়ীর একটা বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে গেল তার। ছবির ওপরে বড় হরফে লেখা রয়েছে "একটি সুন্দর সংসার" ; সোফা, কৌচ, কার্টেন সমন্বিত আধুনিক একটি ড্রইংরুমের ছবি। একটি সুবেশা তরুণী বসে আছে, সামনে একটি যুবক, উভয়ের মুখেই হাসি। তরুণীর মুখের কাছে লেখা— 'সত্যি তোমার পছন্দ আছে', যুবকের মুখে বিগলিত ভাব। বিজ্ঞাপনের নিচে লেখা—'আপনিও মনের মত রঙে ঘর সাজান'। সত্যি এক-একটা রং এক-একজনের পক্ষে বেশ মানানসই হয়, ভাবল পরেশ। পাশের পাঞ্জাবি-পরিহিত যুবকটিকে নজর করল সে, হাতে তার একগুচ্ছ ফুল। ফুলগুলো কিন্তু সাধারণ বলে মনে হল পরেশের। নার্সারীবিক্রিত ফুলের গুচ্ছ বলে মনে হল না।

পরেশের পাশ দিয়ে একজন গেরুয়া বস্ত্রধারী লোক চলে গেল, তার দিকে তাকিয়ে পরেশের মনে হল এই স্টেশনটি যেন সারা ভারতের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ ; রোগ, শোক, অনাহারে জর্জরিত, অশিক্ষিত জনগণের সঙ্গে ধর্ম-ধ্বজাধারী ভণ্ডদলের শোভাযাত্রা।

স্বামী স্বরূপানন্দ মাধবীকে নিয়ে যথাসময়ে স্টেশনে এসে পৌছলেন। হুগলী থেকে দূরগামী ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁকে প্রথমে এখানেই

আসতে হল। দুটো টিকিট তিনি কিনেছেন, একটা উচ্চশ্রেণীর নিজের জন্য, অপরটি তৃতীয় শ্রেণীর মাধবীর জন্য। দুজনে একত্রে ভ্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন। মাধবীর হাতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দিয়ে ভোলা মাড়োয়ারীর টাকা আর গহনাভর্তি ব্যাগটি গৈরিক বস্ত্র জড়িয়ে তিনি সন্তর্পণে বহন করে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন শেষের দিকে, সঙ্গে তাঁর এক হোল্ডঅল, স্যুটকেশ ও টিফিন কেরিয়ারটা। বাসদেও শর্মা ও বিজয়সিংহ দেহরক্ষী হিসাবে ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেই এল, কিন্তু দূর থেকে লক্ষ্য করলে তারা যে পরস্পরের পরিচিত একথা বোঝা বা ধারণা করাও সম্ভব হল না, এক একটা কামরায় তারা উঠে পড়ল। ব্রজেশ্বরবাবু দ্রুত এগিয়ে গেলেন উচ্চশ্রেণীর কামরার দিকে, তাঁর বড় দেরী হয়ে গিয়েছে।

কবি কমলাকান্ত সরকারকে সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তা অনুপম এবং অন্যান্য ভক্তেরা যখন মাল্যদান করে ট্রেনে তুলে দিল তখন সে দস্তুরমত লজ্জিত হয়ে পড়েছে। অনাবশ্যক এ উচ্ছ্বাসের কোন কারণ ছিল বলে কমলাকান্তর মনে হ'ল না, অবশ্য আপত্তি করার মত অবকাশও পায় নি সে। যাই হোক, কামরায় উঠে অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকাতে পারল না কমলাকান্ত, গলার ফুলের মালাটা খুলে হুকে টাঙিয়ে রেখে সে জানলা দিয়ে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে রইল। নীলাভ আলোর নিচে মুখর ও চঞ্চল জনতাকে লক্ষ্য করতে লাগল একমনে।

এষা কামরায় উঠে এল। সঞ্জীব ওর হাতে ফুলগুলো দিলে, দু-জনেই দু-জনের দিকে তাকাল শুধু, মনের কথা বলার আর প্রয়োজন নেই যেন ওদের। প্ল্যাটফর্মের ওপর ভীড়ের মধ্যে সঞ্জীব দাঁড়িয়ে রইল, মনটা তার হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস সামনের সিগনালটার দিকে তাকাল। সবুজ আলোর তীব্র রশ্মিটা ইঞ্জিনের গায়ে এবং লাইনের পাশে বিচ্ছুরিত হয়ে রয়েছে। ঢং ঢং—তীক্ষ্ন ঝঙ্কার দিয়ে ঘণ্টাটা বেজে উঠল। মাইকে অনুনাসিক

সুরে স্ত্রীকণ্ঠে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্রেনের যাত্রার সময়টা ঘোষণা করা হল শেষবারের মত। আবদুল ফায়ার হোল ডোর হ্যাণ্ডেলটা নিচে নামিয়ে দিল! রিভারসিং হুইল আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। রবার্ট ডগলাস ইঞ্জিনটার ওপর এবার উঠে পড়ল। ভ্যাকুয়াম গেজের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার, এ পাশে রয়েছে সুপারহিট টেম্পারেচার মাপের যন্ত্র। তাপের পরিমাণ ১৩০ ডিগ্রী থেকে ১৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়ে থাকে, আর বয়লার প্রেসার প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চি ১৮০ পাউণ্ড হয়। ভ্যাকুয়াম ব্রেকের গেজটাও ভাল করে লক্ষ্য করে নিল রবার্ট, কারণ তারতম্যে গাড়ী অচল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবদুলের সামনে ষ্টীম জেট এবং এ্যাশব্লোয়ার রয়েছে, ফায়ারম্যান হিসাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ তাকেই করতে হয়।

প্ল্যাটফর্মের কোলাহল আর চঞ্চলতা অকস্মাৎ বেড়ে গেল যেন। শেষবারের মত কুলীরা যাত্রীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছে। বুকস্টলে এতক্ষণ কয়েক-জন যাত্রী অধীর আগ্রহে বিনাব্যয়ে সিনেমা স্টারদের চিত্রমাধুর্য উপভোগ করছিলেন, এবার তাঁদের ফিরে যেতে হল। সিগারেট ও পান ভেণ্ডারদের এখনও খরিদ্দার রয়েছে। মিঠাইওয়ালার কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে—কাঁচঘেরা ঠেলাটা একপাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ব্রেকভ্যানে মাল তুলে দিয়ে কুলীরা শূন্য ঠেলা নিয়ে ফিরে চলেছে। লৌহচক্রের ঘর্ঘর আওয়াজটা স্টেশনের কোলাহলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যাত্রীরা এখন সবাই ট্রেনে। বিদায় দিতে যারা এসেছে, যাত্রী অপেক্ষা তাদের সংখ্যাই যেন বেশী। ট্রেনটা ছাড়বার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তারা প্ল্যাটফর্মের ওপর। প্ল্যাটফর্মের বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটাটা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচেছে এবার। আবার সেই ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল গার্ডের হুইসলের তীক্ষ্ণ ধ্বনিটা। একই বাদ্যযন্ত্রে অপটু কোন শিক্ষানবীস যেন পর পর দুটো অসঙ্গত আর বেসুরো ধ্বনি তুলেছে। প্ল্যাটফর্মের কিছুটা দূরে অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়েছে গার্ড। চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠতে হবে তাঁকে। হাতের সবুজ আলোটা আন্দোলিত হল—সবুজ রশ্মিটা যেন দূরে অবস্থিত সিগনালের আলোরই প্রতিচ্ছবি। ড্রাইভার রবার্ট হুইসল চেনটা টানল—বজ্র-নির্ঘোষে হুইসলটা জনতাকে সচকিত করে বেজে উঠল। ষ্টীম রেগুলেটারটায় চাপ দিলে রবার্ট। সতেজে রাক্ষসটা তার বলিষ্ঠ অস্তিত্ব ঘোষণা করল। এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা ধীর-মন্থর গতিতে।

গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এখনও কয়েকজন প্ল্যাটফর্মের ওপর চলেছে। বিদায়দান-কারীদের মধ্যে কয়েক জন প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে হাত এবং রুমাল আন্দোলিত করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মিনিয়েচার ডিস্ক সিগনালের দিকে তাকিয়ে রেগুলেটারে আর একটু চাপ দিলে ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস। ঝক্ ঝক্ ঝক্—ইঞ্জিনের পানিহুইলগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে, ক্র্যাক এ্যাক্সেলের সুতীক্ষ্ণ আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছে রবার্ট। আবদুল বাইরে একটু ঝুঁকে দেখছে পিছন দিকে—গার্ড 'অলরাইট সিগনাল' দিচ্ছে, প্রত্যুত্তর দিল আবদুল।

ঠং—এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাচ্ছে ইঞ্জিনটা ক্রীচ ক্রীচ—লাইন ও চাকার সংঘর্ষণে একটা আওয়াজ হচ্ছে তীক্ষ্ণ স্বরে। ঝক্ ঝক্ ঝক্—ঘটর ঠং, ঘটর ঠং—ক্রীচ ক্রীচ ক্রীচ।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে, সঞ্জীব কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও। এষাকে আর দেখা যাচ্ছে না, সঞ্জীব তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে অপস্রিয়মান ট্রেনটার দিকে। তার মনে হচ্ছে, এষা যেন দূরে সরে সচ্ছে—সঞ্জীব অনুভব করল, দূরত্বটা যেন প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে। দূরে যাচ্ছে এষা, আরও দূরে। ট্রেনের পিছনের আলোটা রক্তচক্ষু মেলে অপলক দৃষ্টিতে তাকে যেন নিরীক্ষণ করছে।

মালপত্র গুছিয়ে রেখে সুনীল রায় হাতঘড়িটা প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিল। ট্রেন ছাড়তে আর বেশী দেরী নেই তখন। মাথার টুপিটা খুলে পাশের ব্রাকেটে রেখে দিল। হাসনু একবার তাকাল ওর দিকে—দৃষ্টিটা অর্থব্যঞ্জক নয়, শুধু দেখার জন্যই দেখা। হাসনু ওরফে শ্রীলেখা দেবীর চোখের প্রশংসা অনেকেই করে থাকে। সুনীল রায় সেই দীর্ঘল সুর্মাটানা চোখের দৃষ্টির সামনে পড়ে সঙ্কুচিত আর দুর্বলতা অনুভব করল। দৃষ্টির অর্থটা সম্যক বুঝতে না পেরে হাসনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ, তারপর ব্যাকব্রাশ-করা চুলের ওপর আলতো ভাবে হাতের তালুটা স্পর্শ করে হাসনুর ঠিক পাশেই বসল। হাসনুর বিরক্তির কারণটা তার ইতিপূর্বেই জানা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু 'কূপে' না পাওয়াতে তার ত্রুটি কোথায় তা সে অনুমান করতে পারল না। বরং অনর্থক অতগুলো টাকা বাজে খরচ করে যে এই দুটো বার্থ পাওয়া গিয়েছে তার জন্য অন্ততঃ হাসনুর মুখে হাসি দেখার আশা সে করেছিল বই কি।

পান। অস্ফুটস্বরে বলল হাসন্থ, বিরক্তটা মুছে ফেলতে চায় সে আলাপের মাধ্যমে। কিছু করতে পেরে কিন্তু খুশি হল স্থনীল রায়। গুমোটটা দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় এতক্ষণ মনমরা হয়েছিল সে।

প্ল্যাটফর্মে নামল স্থনীল। মিঠে পান পাওয়া গেল না, সিগারেট ছিল বটে, তবে আর এক টিন কিনে নিল সে। সিগারেট তার মনে জোর আনে। সিগারেটের অকুলান হবে এই চিন্তাটা থাকলে কোন কাজেই সে মনঃসংযোগ করতে পারে না—অদৃশ্য কাঁটার মত সেটা বার বার অস্বস্তি আনে শুধু। আশপাশে তাকিয়ে দেখল স্থনীল রায়। অনেকগুলো চিন্তার ঢেউ একসঙ্গে তার মনকে উদ্বেল করে তুলেছে। অদূরে একজন কালো মোটামত লোক যেন তাকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে বলে মনে হল তার। না ভুল হতেও পারে— ভাবল স্থনীল রায়। আর তার দিকে অনেকেই যে তাকিয়ে থাকে তা তার বিলক্ষণ জানা আছে, কথাটা ভেবে আত্মগরিমায় স্ফীত হল সে।

একটা হিন্দুস্থানী লোক'ও যেন তাকে দেখে পিছন ফিরে দাঁড়াল। হৃৎপিণ্ড-টার গতি হঠাৎ দ্রুত হয়ে গেল তার। নাঃ, ও কিছু নয়, ভাবল স্থনীল রায়। এমন সব উদ্ভট আজবাজে চিন্তা আসছে তার মনে। নিজের ওপরই বিরক্ত হল সে।

স্থনীল!

চমকে উঠেছে স্থনীল রায়, মুখ ফিরিয়ে ধীরেন ভড়কে দেখতে পেয়ে বললে, ও তুমি, তাই ভাল।

কেন তুমি কি অন্য কেউ ভেবেছিলে, নিরাশ করলাম নাকি? হেসে বলল ধীরেন ভড়।

না, তা নয়। আমতা আমতা করল স্থনীল।

জান স্থনীল, তোমরা এসেছ বলে কর্তা খুব খুশি।

তাই নাকি? কর্তার খুশির কারণ হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করল না স্থনীল রায়।

তাছাড়া এই বইতে কর্তা তোমাকেও একটা চান্স দেবেন। গোপন স্থসংবাদটা নিভৃতে জানিয়ে রাখল ধীরেন ভড়।

কাটা সৈনিকের পার্ট নাকি?

না না, কি যে বল।

সুসংবাদটা মাঠে মারা যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ধীরেন ভড়, কারণ ডাইরেক্টর হিসেবে প্রত্যেক জিনিসটার এফেক্ট আশা করে সে।

তোমার বোধ হয় কবির পার্টটাই দেওয়া হবে। আলতো ভাবে কথাটা শেষ করল ধীরেন ভড়।

কবি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কবি। মানে হাসনুর সিনে সেই যে। মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করল ধীরেন ভড়।

আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। উপস্থিত যে পার্ট সে নিয়েছে সেটা ভাল ভাবে শেষ করতে পারলে নিষ্কৃতি পায় সে।

অত পান কি হবে বাবা ! সুনীলের হাতের দিকে তাকাল ধীরেন ভড়।

খাওয়া হবে আবার কি।

তুমি তো পান খাও না বন্ধু, প্রাণ খাও।—অট্টহাসি হাসল ধীরেন ভড় নিজের রসিকতায়। সুনীলের হাত থেকে অযাচিত ভাবে কয়েকটা পান তুলে গালে দিল ধীরেন ভড়, তারপর একটা চোখ অর্ধেক সঙ্কুচিত করে হাসনুর কামরার দিকে কি যেন ইঙ্গিত করে চলে গেল।

লোকটার সাধারণ সৌজন্যবোধ যে নেই সেকথা সুনীল অনেকদিন আগে জেনেছে। আর তাকে পার্ট দেওয়ার গূঢ় অর্থটাও তার কাছে পরিষ্কার।

কামরার দিকে তাকাল সে, লক্ষ্য করল একজন বাবাজী শ্রেণীর লোক বসে আছেন, গেরুয়া-পরা কিন্তু বেশ শক্ত চেহারা। এ আপদটা আবার এল কোথা থেকে ! ভাবছে সুনীল রায়। আরও লক্ষ্য করল, ইতিমধ্যে বাবাজী হাসনুর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন—মাথা নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন বলে মনে হল। বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত হল তার।

স্বামী স্বরূপানন্দ হাসনুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মনে মনে তিনি প্রীত হয়েছেন। বিনা আয়াসেই যে পুরস্কার তিনি লাভ করবেন এতটা তিনি আশা অবশ্য করেন নি, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁকে অনেক সময় টোপ ফেলতে হয় না, এমনকি চারেরও দরকার হয় না, বড় বড় রুই-কাৎলা অযাচিত ভাবে ধরা দিয়ে যেন কৃতার্থ হয়। এ সৌভাগ্য কোনদিনই তাঁকে পরিত্যাগ করবে না বলেই স্বামীজীর বিশ্বাস। ধর্ম সম্বন্ধে যে কোন আজগুবি

কাহিনী সরস ভাবে এবং উপযুক্ত পরিবেশে পরিবেশন করলে সকলের পক্ষেই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে যে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয় সেকথা স্বামিজী জ্ঞাত আছেন। আবার সেই ধর্মের আবরণে অনেক দুরূহ কাজই যে সুসম্পন্ন করা যায় সে অভিজ্ঞতাও তাঁর কম নয়।

সুনীল রায় কামরায় ঢুকে একবার বিরক্তিভরে তাকাল স্বামিজীর দিকে, তারপর হাসনুর দিকে পানগুলো এগিয়ে দিল। পাশের একটা বাক্সে সযত্নে পানগুলো রেখে দিল হাসনু। পকেট থেকে রুমালটা বার করে হাতটা মুছল সুনীল রায়, পানের রসে হাতের তালুটা তার লাল হয়ে গিয়েছে। সমস্ত জিনিসগুলো ঠিক একই ধরনের বিরক্তিকর। 'কূপে' না পাওয়া, হাসনুর কুঞ্চিত ভ্রূ, ধীরেন ভড়ের ভাঁড়ামী, ভণ্ডটার উপস্থিতি সবই এই পানের রসের মত অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত আর অস্বস্তিকর। একটা সিগারেট ধরালে সুনীল রায়, আঙুল দুটো আবার কেঁপে উঠল তার। নীলচে ধোঁয়াটা নাসারন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে উদ্গীরণ করল সে।

সুনীল রায়কে নিরীক্ষণ করলেন স্বামিজী কয়েক মুহূর্ত, তার পর অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, রাহু।

অ্যাঁ, আমায় কিছু বললেন? অস্পষ্ট কথার আওয়াজটা শুনেছে সুনীল রায়।

না, ঠিক আপনাকে নয়।—মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন স্বামিজী, তবে রোগী দেখলে কবিরাজের মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেই রকম গ্রহের স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করলে হঠাৎ বলে ফেলি।

গ্রহ? কৌতূহল হ'ল সুনীল রায়ের।

হ্যাঁ, আপনি রাহুগ্রস্ত। বিচারকের মত রায় দিতে দেরী করলেন না স্বামিজী।

কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ সুনীল রায় জানে না, তবে জিনিসটা মোটামুটি বুঝেছে সে। অবিশ্বাস আর কৌতূহলমিশ্রিত মুখের ভাবটা তার লক্ষ্য করেছেন স্বামিজী।

মনটা সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান, তবুও সুনীল প্রশ্ন করল, রাহুগ্রস্ত মানে?

তার মানে, ঝুঁকি আছে, অনেক বাধাবিঘ্ন রয়েছে, দুস্তর দুর্গম পথ।—

কথা বলা শেষ করে চোখ বন্ধ করলেন স্বামিজী,—বিপদসঙ্কুল পথের চিত্রটা যেন অকস্মাৎ তাঁর মানসপটে ফুটে উঠেছে।

ঠিক বুঝলাম না তো। বলল সুনীল, কৌতুহল চলে গিয়ে এবার ভয়ের চিহ্ন ফুটেছে তার মুখে, অবিশ্বাসের কথা এখন আর মনে নেই, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

বোঝা একটু শক্ত ভাই। কথাটা তাঁর বেশ লাগসই হয়েছে দেখে খুশী হলেন তিনি। বললেন, সব জিনিসই কি সবাই বুঝতে পারে, সেই কথাই তো এই বেটিকে বলছিলাম। কথাটা শেষ করে সস্নেহে তাকালেন তিনি হাসনুর দিকে।

কি বলছিলেন ?

বলছিলাম মনের দিক দিয়ে অপূর্ব মিল, কিন্তু···।

কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি, শুধু চোখ দুটো বন্ধ করে রহস্যভরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

হু হু শব্দে ট্রেনটা চলেছে লৌহবর্ত্মের ওপর দিয়ে। বিরাট একটা সরীসৃপ যেন এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে গর্জন করতে করতে—ঝক্, ঝক্, ঝক্। আশেপাশে কলকারখানার আলো দেখা যাচ্ছে। বহুমূল্য রত্নাভরণের মত সেগুলো সাজানো রয়েছে যেন চতুর্দিকে। শীতের কুয়াশা, ধোঁয়া আর ধূলিজালে উজ্জ্বল আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। কালিমাখা বিরাট বাড়ীগুলো অন্ধকার পটভূমিতে অজানা রহস্যময় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একের পর একটা। হাসনু মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। লাইনের বাঁকের মুখে ট্রেনের ইঞ্জিনটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে ইঞ্জিনের চিমনীর ওপর দিকে একটা লালচে আভা ফুটে রয়েছে। আগুনের ফুলকিগুলো সেখান থেকে বার হয়ে আশপাশের গাছের ওপর জোনাকী হয়ে জ্বলছে যেন। ইঞ্জিনের মাথায় সার্চলাইটের তীব্র রশ্মিটা পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে। লাইনের স্লিপারগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। লম্বা লম্বা একই আকৃতির কাঠগুলো শুকনো পঞ্জরাস্থির মত সমান্তরাল ভাবে সাজানো রয়েছে। কালো পাথরের টুকরো ছড়ানো রয়েছে তার চতুর্দিকে। লাইনের পাশে কয়েক জায়গায় পাথরের স্তূপ রয়েছে, তারই অদূরে তাঁবু খাটানো। ইতস্ততঃ কয়েকটা ধূমায়িত লণ্ঠন দেখা গেল, লাইন মেরামত হচ্ছে হয় তো, ভাবল

হাসছ। বেশ লাগছে তার এখন, ট্রেনের গতি আর চলমান দৃশ্য তার মনটা হালকা করে দিল। ঝক্ ঝক্ ঝক্—তুলকী চালে ট্রেনটা চলেছে।

কেট্ ডগলাস ওধারের বার্থটা পেয়েছে, সেও তাকিয়ে আছে বাইরের অন্ধকারের দিকে। ইঞ্জিনটা রবার্ট চালাচ্ছে, কি রকম করে চালায় কে জানে—ভাবল কেট্ ডগলাস। অনেকে ওর স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা করে, কিন্তু তার নিজের তা মনে হয় না। বরং অনেক সময় অকারণে রাগ করতে রবার্টকে সে দেখেছে। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে তুমুল কাণ্ডও অনেক বাধিয়েছে বলে মনে পড়ল কেটের।

অবশ্য অল্প বয়সে রবার্ট এ রকম ছিল না। প্রথম মেয়েটা হবার পরই যেন রবার্ট কেমন বদলে গেল। বাড়ী ফিরতে দেরী সুরু হল, ড্রিঙ্কের মাত্রা বাড়ল, পয়সা ওড়াতে লাগল নানাভাবে। সেদিনের স্মৃতি এখনও পীড়া দেয় কেট্‌কে। স্বপ্নময় রঙীন ভালবাসার প্রথম স্পর্শের পরই রূঢ় আঘাতগুলো বেজেছিল খুব, কিন্তু কেট্ সহ্য করেছিল। হয়তো অতটা সহ্য তখন না করলেই ভাল হত। চক্ষুলজ্জার ধাপ পার হওয়ার পরই রবার্ট যেন বেহেড বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল, আর তা ছাড়া নিজের দিক দিয়েও সে ভুল করেছিল বলে এখন মনে হয়। সে অবস্থায় অত বেশী ঢিলে দিয়ে নিজের বুকে আঘাতটা নেওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ার চাপটা এখন যেন তাকে অনুভব করতে হচ্ছে—একটু বেশী মাত্রায় মনটা তাঁর সন্দিগ্ধ আর সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে 'সিন ক্রিয়েট' করা ইদানিং তার যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। রবার্ট ডগলাসের মূর্তিটা কেটের চোখের ওপর ভেসে উঠল। রবার্ট এখন যেন কেমন মোটা থলথলে ধরনের হয়ে গিয়েছে। মনের মত শরীরের ওপরও এখন [illegible] তার দখল নেই আর।

শক্ত সুদৃশ্য মাংসপেশীর স্থানে জমেছে বিসদৃশ চর্বির আস্তরণ। দীর্ঘদেহী রবার্টকে এখন স্থূল আর খর্বকায় অন্য একটি লোক বলে মনে হয় তার কাছে। আগে কিন্তু রবার্ট বেশ লম্বা ছিল। দীর্ঘ পদক্ষেপে রবার্টের ঋজু চলনভঙ্গীটা মনে পড়ে গেল কেটের।

মানুষ কত বদলে যায়। যেন মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন আসে তার জীবনে। রবার্টের চোখে সেও নিশ্চয়ই এই রকম পালটে গিয়েছে। তার মত রবার্টও কি

সেই মধুর স্বপ্নোজ্জ্বল দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে বেদনা অনুভব করে? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কেটের। কেট দেখল, ওদিকের বার্থে বসা লোকটি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে—চেইন স্মোকার বলে মনে হল।

ওদের মুসলমান বলে চিনতে পারল কেট্। পাশের মেয়েটির চেহারাও ভাল লাগল তার। মুসলমান বস্তিবাসীদের সঙ্গে অনেকদিন মেলামেশা করেছে কেট্। হাসনুর অবশ্য পরনে বোর্খা বা হাতে মেহদী পাতার রং নেই, কিন্তু আচার-ব্যবহার হাবভাবটা তার সুপরিচিত বলেই ওকে চিনতে দেরী হল না কেটের। মেয়েটি বারবার পান মুখে দিয়ে কচ্‌চ করে চিবোচ্ছে আর রক্তবর্ণ পিকটা ফেলছে কয়েক মিনিট অন্তর। ন্যাসটি হ্যাবিট—নিজের অজান্তে কেটের গৌরবর্ণ নাসিকার অগ্রভাগ কুঞ্চিত হল। সিগারেটের ধোঁয়া কেটের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল।

অন্য লোক তার সাক্ষাতে ধূমপান করলে তারও নেশাটা সঙ্গে সঙ্গে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, এমনকি সিনেমার নায়ক যখন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে তখনও তার ধূমপানের স্পৃহাটা জেগে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। একটা সিগারেট বার করল কেট্ ডগলাস তার সুদৃশ্য কেস থেকে, তার পর ক্ষুদ্রাকৃতি লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরিয়ে নিলে সেটা। এক মুহূর্ত লাইটারের অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার পর ডালাটা হালকা একটা ভঙ্গীতে ছেড়ে দিল। লাইটারের আগুনটা নিভে গেল। জেনী তাকে দিয়েছিল এটা, কেটের জন্মদিনে জেনীর উপহার। ছোট্ট লাইটারের গায়ে লেখা আছে—Many happy returns, Jenny to Mummy।

সেই এক ফোঁটা মেয়ে জেনী এখন চার ছেলের মা—ভাবতেও আশ্চর্য লাগে তার। শৈশবাবস্থায় জেনীর একবার হুপিং কাসি হয়েছিল, কেটের সেই কথা মনে পড়ে গেল। কি অমানুষিক যন্ত্রণাই পেয়েছিল মেয়েটা। কাসতে কাসতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত হ'ত অনেক সময়, নীল হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। অবিশ্রান্ত কাসত মেয়েটা, কাসির দমকে চোখের শিরা ছিঁড়ে রক্ত জমাট বেঁধে যেত। সেদিনের কথাটাও বেশ মনে আছে কেটের, ডাক্তার সমারসেট্ জেনীকে দেখে সেদিন শেষ জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। রোগীর অবস্থা তাঁদের ক্ষমতাবহির্ভূত বলে ঘোষণা করে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে বলেছিলেন, সে মুহূর্তটা ভোলবার মত নয়। সেই দুর্যোগের

কথা এখনও মনে আছে কেটের, রাতের পর রাত সে আর রবার্ট মুমূর্ষু জেনীর শয্যার পাশে কাটিয়েছে। একদিনের কথা।

রবার্ট তাকে জোর করে এক পেয়ালা কফি আর বিস্কুট খাওয়ালে, অনেক সান্ত্বনা দিলে সেই সঙ্গে। হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে উঠল, রবার্ট নীচে নেমে গেল দেখতে, কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল গম্ভীর মুখে।

কে এসেছে? জিজ্ঞাসা করল কেট্।

ও একটা বুজরুক। তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলে রবার্ট।

বুজরুক?

হ্যাঁ, একজন সাধু বললে তোমার বাড়ীতে অসুখ, এই মন্ত্রপূত ফুলটা তার মাথায় দাও, সে ভাল হয়ে যাবে—অল বাংকাম।

কোথায় সে? চীৎকার করে উঠল কেট্।

চলে গেছে বোধ হয়। উত্তর দিলে রবার্ট। কেটের উত্তেজনার কারণটা খুঁজে পায় না সে।

চলে গেছে? যেন কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না কেটের। রবার্টের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কেট্ নিজেই উন্মত্তের মত ছুটে গিয়েছিল রাস্তায় নেই সাধুর খোঁজে। অনেক খোঁজখবর করে শেষ পর্যন্ত সাধুকে ধরতেও পেরেছিল সে। সাধুপ্রদত্ত সেই মন্ত্রপূত ফুল জেনীর মাথার পাশে রেখে দিয়েছিল কেট্। মনে আছে—তার পরের দিনই জেনীর সহজ অবস্থা। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সে আর রবার্ট, ডাঃ সমারসেট্ও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য ভেবে নিয়েছিলেন যে, তাঁরই ওষুধের জোরে এটা সম্ভব হয়েছিল। কেট্ও কোন মন্তব্য বা সাধুর কথা উল্লেখ করে নি। তার মেয়ে ভাল হয়ে গিয়েছে—সেইটাই বড় কথা।

ছোট্ট লাইটারটার দিকে তাকিয়ে রইল কেট্। এই সেই জেনী, যার জন্যে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, অনাহারে, অনিদ্রায় কাটিয়েছে। এই সেই জেনী, বছরে এখন সে মাত্র দুটি চিঠি লেখে, একটা নববর্ষে আর একটা তার জন্মদিনে, সঙ্গে অবশ্য এ ধরনের একটা উপহারও পাঠায়। দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার আর একটা।

ওধারে উপবিষ্ট সাধুকে দেখেই জেনীর সেই অসুখের কথা মনে পড়ে গিয়েছে তার। গেরুয়াধারী সাধুদের ওপর এখনও কেট্ ভগবানের অচলা

ভক্তি আর বিশ্বাস আছে। খুক্‌খুক্‌…কাশির শব্দে কেটু বেঞ্চির অপর দিকে তাকাল। যে লোকটাকে গলায় মালা দিয়ে মহাসমারোহে বিদায়সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সেই লোকটা কাসছে—এই শীতে মাথাটা বার করে আছে—কাসবেই তো। হয়তো ছোটখাট একটা নেতা হবে। যাকে গলায় মালা দিয়ে অনর্থক চীৎকার আর জয়ধ্বনি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেই কেটু ডগলাস নেতা বলে ধরে নেয়। সিগারেটে আর একটা টান দিলে কেটু।

কবি কমলাকান্ত ফুলের মালাটা টাঙিয়ে রেখেছিল একটা হুকে, তার পাশেই সবুজ রঙের একটা লেডিজ কোট রয়েছে লক্ষ্য কবল সে। রজনী-গন্ধার মালাটা সবুজ রঙের পাশে বেশ মানিয়েছে, গাড়ীর দোলায় তুটোই তুলছে। কিন্তু তুলছে একই দিকে, পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারছে না, অবিশ্রাম ও-তুটো যেন লুকোচুরি খেলে চলেছে। বাইরের দিকে তাকাল কমলাকান্ত, অন্ধকার ভাল লাগে তার, ঘন সূচীভেদ্য অন্ধকার নয়—আবছা, ধোঁয়াটে রহস্যময় অন্ধকার—অল্প দেখা যায় কিন্তু সবটা বোঝা যায় না। ট্রেনটা শহর ছাড়িয়ে এবার গ্রামের পাশ দিয়ে চলেছে। রহস্যাবৃত অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলো সুন্দর দেখতে লাগছে কমলাকান্তের। ঝাঁকড়া চুল নিয়ে মাঠের মধ্যে যেন ছোট ছোট মেয়েরা খেলা করছে—দূরে সরে যাচ্ছে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারছে না—ঠিক ওই রজনীগন্ধার মালার মত। বুনো ঘাসের গন্ধ পাওয়া গেল, শীতের রাতের কুয়াশার সঙ্গে বুনো ঘাসের গন্ধ বেশ লাগে কমলাকান্তের। পানাভরা ডোবা, কলাগাছের ঝাড়, পুকুরের ভাঙা শেওলাপড়া ঘাট, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, বাংলার নিজস্ব রূপ যেন চোখের ওপর মূর্ত হয়ে উঠল তার। সব জিনিসেরই একটা ছন্দ আছে বলে মনে হয় তার। এই যে ট্রেনটা ছুটে চলেছে এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সব অবস্থার সঙ্গে যেন একটা অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে, বেশ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে তাকাল সে। এত জায়গা থাকতে লোকের জায়গা হয় না কেন কে জানে? মানুষগুলো ছুটে ছুটে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায় কেন, তা কে বলবে? কিসের আশায় এত ছুটোছুটি পড়ে যায়? ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ ধ্বক্‌—ইঞ্জিনের আওয়াজটা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। আওয়াজটা

ঠিক এক রকমের—কোন তারতম্য নেই—ছন্দেরও ব্যতিক্রম নেই--ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্। গাড়ীর চাকার শব্দটা কিন্তু ভিন্ন ধরনের—ঘটাঘট-ঘটর-ঘট। অনেকগুলো অজানা অশ্রুত বাদ্যযন্ত্র দিয়ে কারা যেন অর্কেষ্ট্রা বাজাচ্ছে। পাশের একটা সরু নালা চোখে পড়ল কমলাকান্তের—একে-বেঁকে চলেছে, ঠিক যেন বৃহদাকার একটা অজগর সাপ। গাড়ীর সঙ্গে সেটাও যেন এগিয়ে চলেছে। গুম গুম গুম—নালার সাঁকোর ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে —ছন্দটা পালটে গেল, তাল ফেরতা করল যেন অদৃশ্য সঙ্গতকারী। আকাশের দিকে একবার তাকাল কমলাকান্ত। ও-কোণে যেন একটু মেঘ করেছে বলে মনে হল তার—তরমুজের একটা সরু ফালির মত দেখতে অনেকটা। এপাশের মেঘটা কিন্তু পেঁজা তুলোর মত, উড়ে চলেছে একপাশ থেকে অন্যপাশে। দূরে একটা পাহাড় দেখা গেল, সেটাও সরে সরে যাচ্ছে। চলমান গাড়ীর মধ্য থেকে দেখলে সবই গতিশীল বলে মনে হয়। চলছে শুধু চলছে—সবেরই গতি রয়েছে, বেগ আছে। কোন কিছুই থমকে দাঁড়িয়ে নেই—ধ্বক্ ধ্বক্, ঘটঘট ঘটর ঘট—একটানা স্পন্দন ধ্বনি, ধ্বক্ ধ্বক—ঠিক হৃদ্‌পিণ্ডের মত, অনবরত চলছে, ক্লান্তহীন অবিরাম গতিতে—ধ্বক্ ধ্বক্।

রেবার কথা মনে পড়ল কমলাকান্তের। কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে রেবা। মালদহে উকিলের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা এবং কিছুদিন পরেই ওর স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ ও জানে, তারপর শুনেছিল, রেবা নাকি রেলে নার্সের চাকরী নিয়েছে, এখন কোথায় কে জানে! রেবার হাসিখুশি উজ্জ্বল মুখের কথা মনে পড়ল তার, সেই পরিচিত কালো আঁচিলটা, কোঁকড়ানো চুল, চোখের বাদামী রঙের মণিটা কিছুই ভোলে নি সে।

এক্সকিউজ মি।—তাড়াতাড়ি পা-টা সরিয়ে নিলে কমলাকান্ত। মেমসাহেব পাশ দিয়ে চলে গেল। খুকখুক কাসি হচ্ছে একটু, গলাটাও কেমন যেন খুশখুশ করছে। গলার ওপরে হাত দিয়ে ব্যথা নিরূপণের চেষ্টা করল কমলাকান্ত, ঢোক গিলতেও একটু বেদনা অনুভব করল যেন। চিন্তিত হ'ল কমলাকান্ত সরকার। মনে পড়ে গেল—সাহিত্যিক সন্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার কথা আছে। গলার বেদনা যদি আরও বেড়ে যায় তা হলে আগেকার দিনের নির্বাক চিত্রের অভিনয়ের অনুরূপই হবে। তাড়াতাড়ি

গলায় গরম মাফলারটা জড়িয়ে নিলে কমলাকান্ত—অনেকটা পথ তাকে যেতে হবে ; ইতিমধ্যে যদি গলাটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যায় তা হলেই মঙ্গল। দু'একবার সশব্দে গলা ঝাড়ল, সে গলার স্বরটা নিজের কানেই শ্রুতিমধুর ঠেকল না। চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে।

কামরার যাত্রীদের ওপর মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করল এবার। সুনীল রায় আর হাসনুর ওপরই স্বভাবতঃ প্রথম দৃষ্টি পড়ল তার। হাসনুর চেহারাটা মোটামুটি ভাল লাগল, কিন্তু ওর সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা রুক্ষতা লুকিয়ে আছে বলে মনে হয় কমলাকান্তের, দুর্মূল্য বাহারে ফুলের অনেকটা চটক তাছে হয় তো, কিন্তু লাবণ্য আর পেলবতার অভাবটা সুপরিস্ফুট। মনে মনে কাঁঠালচাঁপার সঙ্গে মেয়েটির তুলনা করল কবি। মনোরম সন্দেহ নেই, কিন্তু উগ্র সুগন্ধের তীব্রতাটা স্নায়ু-বিভ্রমকারী বলা চলে। রজনীগন্ধার মৃদু সুরভি শ্বেত, শতদলের শুচিতা খুঁজলে পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রাচুর্যের দুর্দমনীয় আকর্ষণ আছে প্রচুর কিন্তু মাধুর্যের ছোঁয়াচ নেই তাতে। সুনীল রায়কেও ভাল লাগল বেশ। একটা আভিজাত্যের সূক্ষ্ম স্পর্শ লক্ষ্য করা যায় ওর ব্যক্তিত্বের মধ্যে, তবে সজ্জাটা ঠিক পছন্দ হল না কমলাকান্তের।

অনেক বাঙালী আছেন, তাঁরা অন্য প্রদেশের পোশাক পরতে ভালবাসেন, বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেষ্টা করেন হয়তো। সুনীল রায়ের আচকান সালওয়ার পরিহিত সুঠাম চেহারার দিকে নজর পড়ল তার। ভদ্রলাককে ধুতি এবং পাঞ্জাবী পরলে আরও ভাল মানত বলে মনে হল কমলাকান্তের।

স্বামিজীকে বেশ রসিক বলে মনে হল তার কথায়, প্রেমিকযুগল খুব হাসছে, লক্ষ্য করল সে। গলাটার ওপর আর একবার হাত রাখল কমলাকান্ত।

স্বামী স্বরূপানন্দ নশ্বরতা সম্বন্ধে সরল ভাবে আলোচনা করছিলেন,—সবই দুদিনের, কিছুই কিছু নয়, আজ আছে কাল নেই, তবে হ্যাঁ, ভালবাসতে হবে —এই যেমন তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসো এই রকম। কথাটা বলে আড়চোখে ওদের দিকে তাকালেন স্বামিজী প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্য।

ও তো আমায় ভালবাসে না সাধুজী। হাসনু প্রতিবাদের সুরে বলল। অন্য মেয়ের মত দোষারোপ করার সুযোগ পেলে সহজে সেটা ছাড়ে না হাসনু।

বাসে না? স্বামিজীর মুখভাবে অবিমিশ্র বিস্ময়ের প্রকাশ হল।

সুনীল কথার কোন জবাব দিল না, শুধু হাসল একটু। স্বীকার করলে ছেলেমানুষী হয়, অন্যথায় আবার বিপদ আসার সম্ভাবনাও থাকে।

হাসনু সুনীলের উত্তরের অপেক্ষায় ছিল না। তার মন্তব্যটা সে প্রকাশ করতেই উৎসুক হল। বলল, ও কি বলবে সাধুজী, আমি বলছি,ও আমার জওয়ানীকে ভালবাসে, আমাকে নয়।

দার্শনিক সত্যটার প্রকাশে স্বামিজী যেন মোহিত হলেন, হাসনুর দিকে তাকিয়ে জ্রর নীচের ক্ষতচিহ্নটায় অঙ্গুলী স্পর্শ করে অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন—মোহ আর মায়া।

এবার হাসনুকে ভাল ভাবে দেখতে লাগলেন তিনি। স্পষ্টভাবে দেখার আর কোন বাধা নেই এখন। হঠাৎ মাধবীর কথা মনে পড়ে যেতে তিনি যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। হাসনুর ফুটন্ত ঢলঢলে যৌবনপুষ্ট লোভনীয় দেহসৌষ্ঠব, আধুনিক সাজসজ্জার চাকচিক্য আর কথা বলার মনোরম ভঙ্গীটার পাশে মাধবীর সাধারণ চেহারা যেন আলুনি, বিস্বাদ আর ন্যক্কারজনক বলে মনে হল তাঁর কাছে। কিন্তু বিচলিত হয়ে পড়লে বিপদ আসার সম্ভাবনা আছে, সে-কথা তাঁর অজানা নেই। সুতরাং জোর করে মনটার মোড় ফেরালেন স্বামিজী।

হাসনুর কথাটা তখনও শেষ হয় নি। সে বলল, আমার যদি কোন খারাপ অসুখ হয়, এ দেহটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে ও কি আমায় আর ভালবাসবে?

তা ঠিক। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে স্বামিজী চোখ দুটো বন্ধ করলেন, অকস্মাৎ যেন একটি অজানা আর অপ্রিয় সত্যের সামনাসামনি তিনি এসে পড়েছেন। ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল।

সুনীলও অপ্রস্তুত হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে হাসনুকে সে বললে, তুমি কিছু খাবে না?

না এখন নয়, তুমি?

পরেই হবে—স্বামিজী তো কিছুই খাবেন না। স্বামিজীর দিকে তাকিয়ে সুনীল বললে।

কথার কোন উত্তর দিলেন না তিনি—মৃদু হাসলেন শুধু, বেঞ্চির তলায় রক্ষিত খাবারের বাক্স থেকে লোভনীয় খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে।

এক্সকিউজ মি, আপ কেয়া সাড়ু হ্যায়। কেট ডগলাস আর নিজেকে সামলাতে পারে নি, সাধুর কাছে সন্তর্পণে এগিয়ে এসেছে সে।

কেটের দিকে তাকালেন স্বামিজী। অন্য খাদ্য উপস্থিত দেখে পুলকিত হলেন তিনি। বললেন, ক্যায়সা বোলেগা ?

হাতের তালুটা উলটে তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন তিনি, তারপর একদৃষ্টে কেটের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, দিলমে তুমহারা বহুত দুখ হ্যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে এল কেট ডগলাস, হঁ্যা সাড়ুজী। দুঃখ অবসানের ইঙ্গিত পেয়েছে সে সাধুজীর কথায় আর উপস্থিতিতে। অপার অসীম দুঃখ রয়েছে তার—ঠিকই তো। আশ্চর্য হল কেট সাধুজীর কথা শুনে। পাশে সে, তার পর সাগ্রহে স্বামিজীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, দুখ ক্যায়সা যায়গা সাজড়ী ?

হাতঠো লাও। হাতটা এগিয়ে দিল কেট তাঁর দিকে। হস্তবিচার সুরু করলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। কেটের নরম তুলতুলে আর দুধের মত সাদা রঙের হাতটা নিজের হাতে গ্রহণ করলেন তিনি। ভ্রূর কাছের তীর্যক ক্ষতটার রং পালটে গেল তাঁর, শ্বাস দ্রুত হল কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটি হাতের ওপর কেটের হাতটা রেখে অপর হাতের তালু দিয়ে প্রথমে সেটা মুছে নিলেন সযত্নে। শীতকালেও কেটের হাতের তালুটা ঘর্মাক্ত হয় অকারণে। তারপর নিজের অনামিকা দিয়ে কেটের হাতের তালুর ওপর ধীরে ধীরে তুলির ভঙ্গীতে স্পর্শ করতে লাগলেন, যেন হস্তরেখাগুলোকে একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করেছেন তিনি। এধরনের স্পর্শ মেয়েদের ভাল লাগে বলে স্বামিজী জানেন। কেটের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে ব্যগ্র হয়ে আছে তার ভবিষ্যৎ জানার জন্য। সে খুঁজছে তার তীব্র দুঃখ-অবসানের ওষধি।

হাসনু তাকিয়ে রয়েছে স্বামিজীর দিকে। অপর একজন স্ত্রীলোকের গোপন দুঃখের ইতিহাস আর তার প্রতিকারের উপায়টা মন দিয়ে শুনছে সে। সুনীল রায়ও সেদিকে তাকিয়ে ছিল। ইতিপূর্বে তার সম্বন্ধে স্বামিজী যে মন্তব্য করেছেন সে কথাগুলো তার মনের মধ্যে এখন তোলপাড় করছে। সত্যিই খুব বেশী ঝুঁকি নিয়েছে সে। আফিসের টাকাগুলো আত্মসাৎ করার সময় ভবিষ্যতের ফলাফল সম্বন্ধে তার চেতনা ছিল না। উন্মাদনায় আর উত্তেজনায় তার মনটা সে সময় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কৃতকর্মের ফলটা

কি হতে পারে সে চিন্তাটা এতক্ষণ ছিল না, এবার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার ছবিটা মানসপটে ফুটে উঠছে যেন। স্বামিজীর ক্ষমতা সম্বন্ধে এতক্ষণ যে অবিশ্বাস আর সন্দেহের ভাবটা ছিল, মেমসাহেবের নির্ভরতা লক্ষ্য করে সেটা অদৃশ্য হয়ে এসেছে প্রায়। স্বামিজীকে একবার নিরিবিলিতে পেলে ভাল হ'ত, ভাবল সুনীল রায়। কথাটা মনে পড়তেই আত্মরক্ষার দুর্দমনীয় স্পৃহাটা অকস্মাৎ জেগে উঠল তার মধ্যে। জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে যেমন প্রাণটা অস্থির হয়ে ওঠে, সুনীল রায়ের প্রায় সেই শ্বাসরুদ্ধ অসহায় অবস্থার অনুরূপই হ'ল।

হাসনুর দিকে নজর পড়ল এবার। অপরূপ সুন্দর! দৃষ্টিটা যেন ফেরাতে ইচ্ছা হয় না তার। হাসনুর কপালের ওপর কুঞ্চিত চুলের একটা গুচ্ছ এসে পড়েছে পাশ থেকে। সুডৌল মুখের ভাবটা মনোমুগ্ধকর। সূক্ষ্ম জ্রর পাশে সুঠাম নাসিকার রেখাটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে। গ্রীবাভঙ্গীটাও মনোরম। নারী-সৌন্দর্যের একজন বিশেষজ্ঞ সুনীল রায়, অনেক দেখেছে সে, কিন্তু এর তুলনা হয় না? সদ্য-ফোটা বাসরাই গোলাপ যেন একটা। ভাল জিনিসের মূল্য দিতে হয় একটু বেশী, সে-কথাটা তার অজানা নেই—আর বিপদের কথাই বা সে ভাবছে কেন? দুশ্চিন্তাহীন নিরুদ্বেগ শান্ত জীবন চাইলে সে অনায়াসেই পেতে পারত। মালতীর আঁচলের তলায় তার আশ্রয়ের অভাব হত না নিশ্চয়ই। তা হলে অবশ্য শুধু কূপমণ্ডুকের মত তাকে ওই ছোট্ট গণ্ডীটার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে হত। ঘড়ির কাঁটার মত একঘেয়ে ভাবে চলতে হত অবিরাম, ছবিটা যেন দেখতে পেলাম। সুবোধ বালকের মত অফিস থেকে বাড়ী এবং বাড়ী থেকে অফিস যেত আর আসত মাকুর নির্ভুল চলনের মত! ছুটির দিনে বাড়ীর আসবাবপত্র সাফ করা। কোনদিন মালতীকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়া, অন্যায় পরশ্রীকাতর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী গিয়ে অখাদ্য-খাবার এবং দুর্গন্ধযুক্ত চা গলাধঃকরণ করে শরীর নষ্ট করা, আর না হলে মালতীর পছন্দ ও ফরমাস মত লেশ, উল বা শাড়ীর পাড় খুঁজে নিয়ে আসা। ব্যাপারটা চিন্তা করতেই মনটা কুঁকড়ে গেল তার। অসম্ভব! তা হলে তার এই সুন্দর চেহারার অর্থ কি রইল।

হাসনু একবার তাকাল ওর দিকে, দেখল সুনীল রায়ও মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাসল হাসনু। সেই মধুর প্রাণমাতানো হাসি,

যে হাসি অনেকের রক্তস্রোতে জ্বলন্ত তরল আগুন ঢেলেছে, যে হাসির আকর্ষণে অনেক পতঙ্গই ঝাঁপিয়ে পড়েছে অনাহুত ভাবে। ঠিক এই হাসিটা যে কত লোকের সামনে এবং কতবার হেসেছে তার সংখ্যা গোনা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু শ্রীলেখা এই অপরূপ হাসিটার জন্যেই সিনেমা-দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে স্বরু করেছে। সিনেমা লাইনে হাসনু সম্প্রতি এসেছে তবে ইতিমধ্যেই স্থায়ী আসন সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলে মনে হয়। হাসনুর বুদ্ধি তার রূপের মতই প্রচুর, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই দুই আর দুইয়ে আবশ্যক ও সুবিধা মত চার বা বাইশ করতে দেরী হয়নি তার। বোম্বাইয়ে অবশ্য প্রথম গিয়েছিল সে, কিন্তু বাজারে সেখানে ভীড় বেশী, রীতিমত গরম বলা চলে। পাওয়ার আশায় দিতে হয় প্রচুর, আর শেষ অবধি মূলধনটাও অবশিষ্ট থাকে না, তাই সময় নষ্ট না করে সে চলে এসেছিল বাংলাদেশে। এখানের ফিল্মজগতে প্রবেশ করতে তার বেশী সময় লাগে নি! অর্থের দিক থেকে একটু ঘষা-মাজা, দরদস্তুর আছে বটে, কিন্তু একবার মার্কেট ক্রিয়েট করে নিতে পারলে আর ভাবতে হয় না, অজস্র ঐশ্বর্য এসে পড়ে অল্পায়াসেই।

বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটা অব্যর্থ উপায় অবশ্য হাসনু জেনে নিয়েছে এবং নানুভাই দেশাই-এর মত মালিক বাংলার ফিল্মজগতে বিরল নয় তাও সে জানে। নানুভাই-এর বাগান-বাড়ীতে উপযুক্ত সুবিধা ও অর্থের বিনিময়ে কয়েকবারই সে তার নৃত্যকলার নিদর্শন দিয়ে এসেছে! আর খতিয়ে দেখতে গেলে এই লেন-দেনে লাভ তার এ পর্যন্ত কিছু কম হয়নি। নানুভাই দেশাই ছাড়া অন্য কয়েকজন যেমন ডাইরেক্টার ধীরেন ভড় তার দিকে কুৎসিত লোমশ হাত বাড়িয়েছিল বটে, কিন্তু সেগুলো পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবার মত কূটবুদ্ধি তার যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। কয়েকজন পাওরিয়া ও অন্তরিয়া গ্রন্থনায়কও মালিকের ইসারায় তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। কিন্তু তারাও নিরাশ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভালবাসার সাঁড়াশী দিয়ে তাকে কোন ফিল্ম কোম্পানীতে টেনে রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। সেইজন্যই সুনীল রায়কে হাসনুর ভাল লেগেছিল, ওদিক দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয়টা সঠিক জানা না থাকলেও হাসনু সুনীলকেই সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিল। তাদের জীবনে এবং ব্যবসায়ে ভালবাসা আর একনিষ্ঠতা শুধু পাপ নয়—অন্যায়। এক

কথায় মূল্যবান বোকামী বলা চলে। কিন্তু সঙ্গীহিসেবে একজনের প্রয়োজন থাকে। তাকে সুবিধা এবং পছন্দ মত পালটানো চলে যতবার দরকার হয় ততবার।

কিছুক্ষণ পূর্বে সুনীলের অনুপস্থিতিতে সাধুজীর কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে কয়েকটা ভবিষ্যৎ বাণী সে শুনেছে। সুনীল যে শীঘ্রই পক্ষবিস্তার করবে সে-কথা তাকে নিভৃতে সাধুজী বলেছেন। হাসনু তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। বরঞ্চ একটু খুশীই হয়েছিল যেন। নতুন সাথীর নবসন্ধানে ধরা দেবার জন্য সে ব্যগ্রভাবেই অপেক্ষা করছিল, বোধহয় ইদানীং সুনীলকে তার একঘেয়ে লাগছিল। চেহারা সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু বলিষ্ঠতার অভাব আছে বেশ, তা ছাড়া চেহারা সুন্দর বলে সুনীলের আত্মম্ভরিতা শুধু অস্বস্তিকর নয়, অপ্রীতিকরও বটে। লক্ষ্ণৌর মনসুর আলীর চেহারা ও ধারণাই করতে পারবে না। নিরঞ্জন ভার্গবের তুলনায় ও আর এমনকি? সত্যজিৎ কাপুরের পাশে দাঁড়াতে পারবে সুনীল রায়? তা ছাড়া সম্প্রতি ধীরেন ভড়ের কাছে ও শুনেছে যে, সুনীল রায় বিবাহিত এবং তার স্ত্রীও নাকি সুন্দরী।

হাসনু লক্ষ্য করে দেখেছে যে বিবাহিতদেরই পদস্খলন হয় বেশী। অবিবাহিতরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের সামলাবার সামর্থ্য রাখে। তবে রক্তের স্বাদ পেলে সবাই সে রক্তের পেছনেই ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঘুরঘুর করে তাও তার অজানা সেই। হাসনুর আর ভাল লাগছে না। কোন রকমে সুটিংগুলো শেষ করতে পারলে সে বাঁচে। সম্প্রতি সুনীল রায় নাকি বেশ কিছু টাকাও সংগ্রহ করেছে বলে শুনেছে সে। তার প্রাপ্যটা নিতে দেরী করলে শেষ অবধি হয়তো তাকে নিরাশ হতে হবে। কারণ এ ধরনের হঠাৎ প্রচুর টাকার মালিক হওয়ার কথা ইতিপূর্বে সে কয়েকবার শুনেছে। প্রেরণা অবশ্য সে-ই জুগিয়েছে। উপায়টা এবং পরিণতি সম্বন্ধেও কিন্তু তার বেশ সুস্পষ্ট ধারণা আছে, সুতরাং আগে বুঝে কাজ না করতে পারলে পরে পস্তাতে হবে তাকেই। সাধুজীর প্রতিশ্রুত তাবিজটাও নিয়ে নিতে হবে। শ' আড়াই টাকা খরচ হবে বলে বলেছেন। তা হোক, এমন আর বেশী কি, ভাবলে হাসনু। টাকাটা সুনীল রায়ের কাছ থেকে সহজেই মিলবে একবার শুধু সেই হাসিটা দেখালেই যথেষ্ট।

বিষ-পাথর সামনে ধরলে যেমন বিষাক্ত কেউটে কুঁকড়ে কেঁচো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি। চিন্তাটা উপভোগ্য হল হাসমুর কাছে, মনে বলও পেল সেই সঙ্গে। যুদ্ধোপযোগী হাতিয়ার মজুত থাকলে মনোবল বাড়ে বৈকি। তা ছাড়া মাদুলী তাবিজের ওপর ভক্তি হাসমুর অগাধ। কেটের মত তারও বিশ্বাস জন্মেছে পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলে! সত্যজিৎ কাপুরের বেলায় সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মাদুলীর জোরেই সে জয়ী হয়েছিল। সেকথা হাসমু কোনদিনই ভুলবে না। কত বিরুদ্ধমুখী ঘাত-প্রতিঘাতই না এসেছিল সেই সময়ে। মানুষের সাধ্য ছিল না তাকে সাহায্য করে কিন্তু আশানুরূপ ফলই পেয়েছিল সে। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা কিছু করতে পারে নি, সেখানে একটা সামান্য মাদুলী তার সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল, একথা চিরদিনই তার মনে গাঁথা থাকবে। হাসমু জানে যে প্রত্যেক জিনিসটাই সংগ্রহ করতে হয়। আর সেই প্রচেষ্টায় যে বাধাগুলো সামনে এসে অভিষ্টলাভের অন্তরায় হয় তাদের জয় করতে হয় এক একটা করে।

পন্থাগুলো কি হবে, ভাল কি মন্দ, পার্থিব কি অলৌকিক সে সব চিন্তা করতে গেলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হটে যেতে হয়। পরাজয়ে গ্লানি আর দুঃখে জর্জরিত হয়ে ধুলিসাৎ হয় শেষ পর্যন্ত। হাসমু তাকাল সাধুজীর দিকে। হঠাৎ তার চেহারাটা খুব পরিচিত বলে মনে হল তার, ঠিক এই ধরনের মানুষের সংস্পর্শে জীবনে যেন এসেছে বলে মনে হল। অনেক জুয়া ও গুণ্ডার আড্ডায় সে বহুবারই নাইট-ক্লাবে, ক্যাবারেতে, ডান্সিং বা গার্ডেন পার্টিতে সে যেন অনুরূপ ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে আর সংস্পর্শে কয়েকবারই এসেছে। হাসমু শুনতে পেল সাধুজী মেম-সাহেবকে বলছেন—

সব ঠিক হো যায়ে গা—সাধুজীর হিন্দি উচ্চারণ-ভঙ্গীটা বাঙালী-কথিত হিন্দির মত নয়, চমকে উঠেছিল হাসমু ওঁর বাচনিক ভঙ্গী লক্ষ্য করে, অবিকল হিন্দুস্থানীদের মত। বিভিন্ন জাত এবং ভাষার সঙ্গে মেশার ফলে সাধুজীর অনেক ভাষার ওপর দখল এসে গিয়েছে হয়তো, ভাবল হাসমু।

কোই ওর নেহি, সব ঠিক হো যায়গা, স্বামিজী বলছেন কেট্ ডগলাসকে আশ্বাসের সুরে। কেটের নরম শুভ্র হাতটা নিয়ে অনেক কচলাকচলি করলেন তিনি।

ঠিক হো যায়গা ক্যায়সে? দুর্ভাগ্যের অবসান কি করে সম্ভব হবে, সে ধারণা করতে পারল না কেট্ ডগলাস।

গ্রহকা ফের হ্যায়—দুর্বোধ্য জিনিসটা সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন স্বামিজী—কেয়া হ্যায়? মানেটা ঠিক বোধগম্য হল না কেটের।

ব্যাড স্টারস্। স্বামিজীর ভাঁড়ারে দু-একটা ইংরেজী কথার সঞ্চয় আছে।

আই সি, এতক্ষণে বুঝলে কেট্ ডগলাস—ভাগ্যাকাশে দুষ্টগ্রহের আবির্ভাবে সম্মোহিত হল সে, অস্ফুট স্বরে বললে, তব ক্যায়া হোগা সাডুজী? আর্তনাদের মত শোনাল কেট ডগলাসের কথাটা।

ডর মাৎ, ইসকো সমমে রাখখো—পার্শ্বস্থিত বালির মধ্য থেকে একটা শুকনো শিকড় বার করে দিলেন স্বামিজী। অনেক দরকারী জিনিস সঞ্চিত তাতে, ভক্তিভরে কেট ডগলাস সেটা নিল। মনে পড়ে গেল ঠিক এইরকম একটা শিকড়ের প্রভাবে জেনীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পেয়েছিল সে। এতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় তার মুখটা ঝলমল করে ওঠল, এতদিন পরে তার দুর্ভাগ্যের অবসানের ইঙ্গিত দেখতে পেল সে। ইঞ্জি-নের হুইসিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজটা শোনা গেল।

খুক্ খুক্ কমলাকান্ত কাশছে, কাশিটা ঠিক কবিসুলভ নয়। গলার মধ্য থেকে অব্যক্ত আর্তনাদের মত বার বার সেটা বেরিয়ে এসে বিরক্ত করছে তাকে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা বার করে নিলে, তা ছাড়া গলাটাকে যত্ন করছে কমলাকান্ত। অতি নিকট-আত্মীয়ের মত পরমাদরে তাকে নিবিড় উষ্ণতায় ঢেকে রেখেছে, জানলাটা অবশ্য বন্ধ করেনি সে। ইচ্ছে একবার হয়ে-ছিল বটে, কিন্তু বাইরের উন্মুক্ত আবহাওয়া আর দৃশ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে শেষ পর্যন্ত মন উঠল না তার। আবছা অন্ধকারে ঢাকা চলমান দৃশ্য দেখতে লাগল কবি। ট্রেনটা চলছে ঝক্ ঝক্ ঝক্, একটানা শব্দ করে। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে গাড়ীটা চলেছে এবার। আশপাশে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কুটির দেখা গেল। গ্রাম্য পরিবেশে মানুষের বসতি—অনেকদিন পরে দেখল কমলাকান্ত। গ্রামের রাস্তা পার হল ট্রেনটি। দুপাশের গেট দুটো বন্ধ করা। গেট-ম্যান হাতে সবুজ বাতি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, নীরব আশ্বাসের প্রতীক নিয়ে। গেট বন্ধ হওয়ার জন্য দুটো গরুর গাড়ী আর কয়েকজন লোক

আটকে রয়েছে। দুটো ধূমায়িত হ্যারিকেন জ্বলছে, গরুর গাড়ীর সামনে। আর একটু দূরেই উন্মুক্ত জায়গায় জনসমাগম লক্ষ্য করল কমলাকান্ত। গ্রামের হাট বলে মনে হল তার কাছে। সেখানেও কয়েকটা আলো জ্বলছে। সব জিনিসটাই কমলাকান্তের নিকট অত্যন্ত প্রিয়, পরিচিত আর নিজস্ব বলে মনে হল। অদূরে একটা কুটিরের মধ্যে মিটমিট করে আলো জ্বলছে দেখতে পেল সে। কিষাণ-বধূ অপেক্ষা করছে স্বামীর প্রত্যাশায়, তাকিয়ে আছে আঁকা-বাঁকা পথের দিকে। ওদের সুখ-দুঃখভরা জীবনের চিত্রটা কবির মানসপটে ভেসে উঠল। হাট থেকে মানুষটা ফিরলে ধূলি-ধূসরিত হাতমুখ ধোবার জন্যে জল রেখেছে এক ঘটি, পাশে তার পিঁড়ে পাতা। বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট কুটিরের মধ্যে জেগে রয়েছে দুটি শ্রান্ত অলস চোখ। কান পেতে রয়েছে শূন্য-অঙ্গনে পদধ্বনি শোনার জন্য। আর তার জন্যে কে প্রতীক্ষা করছে? মেসের সেই হলদে পার্টিশান-দেওয়া ঘরটির মধ্যে সেই ক্রীম রঙের টিকটিকিটা হয়তো নিঃসঙ্গ বোধ করছে তার অভাবে? মনে মনে হাসল কবি। তাকে যেমন এই ট্রেনটি দূরে নিয়ে যাচ্ছে, এমন তো কত লোকই চলেছে। কত দুঃসহ বেদনা ভারাক্রান্ত বিরহেরই না সৃষ্টি করছে এই ট্রেনটি! স্বামী চলে যাচ্ছে হয়তো তার নববধূকে ছেড়ে, ছেলে চলেছে দূর দেশে মায়ের স্নেহ-বন্ধনকে ছিন্ন করে। প্রেমেরও বিচ্ছেদ এল হয়তো কারও জীবনে। আবার অপর দিকটাও ভাবল কবি কমলাকান্ত— এই ট্রেনটি আবার কত বিরহের অবসান ঘটাচ্ছে। অনেক দিন পরে আনন্দোজ্জ্বল ঘরে ফিরে যাচ্ছে হয়তো কোন প্রবাসী, ঐ কৃষাণবধূর মত কেউ হয়তো আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই। লোক চলেছে এপার ওপারে ক্রমাগত। এ বিরহ মিলনের সেতু যেন এই ট্রেনটা রূপকথার রাজপুত্রের মত নিজের খেয়ালে—কখনও দান আর কখনও বা বঞ্চিত করে চলেছে জনে জনে। ঝক্ ঝক্ ঝক্—ইঞ্জিনের আওয়াজটা যেন সায় দিল কবি কমলাকান্ত সরকারের চিন্তায়।

সুনীল রায় একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে। দুর্ভাবনার জটটা যেন ক্রমশঃ দুরূহ হয়ে উঠেছে তার কাছে মুহূর্তে মুহূর্তে। মানসিক চাঞ্চল্য এলে সুনীল রায় সিগারেট খায় একটার পর একটা। গলা আর জিবের স্বাদটা পালটে গিয়েছে তার এতক্ষণে। নিকোটিনের তিক্ততা ভিজিয়ে রেখেছে তার

মুখের ভেতরটা আরও ভেজা আমের টুকরোর মত। তবুও আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করল সে। এটা না করলে আরও ছটফট করতে হয় তাকে। জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠিটা সিগারেটের প্রান্তে ধরে রাখার সময় তার আঙুলগুলো কেঁপে উঠল, বার বার এটা তার নজরে পড়ে কেন? এটা সে লক্ষ্য না করলেই তো পারে, অগ্রাহ্য কেন করে না? এটা যে একটা স্নায়বিক দুর্বলতা সে কথা সুনীল রায় বোঝে, এবং বোঝে বলেই সেটাকে বন্ধ করতে চেষ্টা করে প্রাণপণে। ফল কিন্তু একই হয়—অর্থাৎ কম্পনটা স্তব্ধ তো হয়ই না, উল্‌টে যেন বেড়ে যায়। সমস্ত জিনিসটা চিন্তা করতে গিয়ে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সে।

অনেক ঝুঁকি নিয়েছে সত্যি কিন্তু সেই সঙ্গে ধরা যাতে না পড়ে সেজন্যে সবদিক দিয়েই তো সে আটঘাট বেঁধে কাজ করেছে বলে মনে হল তার। শেষ করা কাজের পরিকল্পনাটি আবার ভেবে নিয়ে কোন খুঁত বার করতে পারল না সুনীল রায়। নিজেই নিজের বিরুদ্ধে মনে মনে অনেক যুক্তিই খাড়া করতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোষী প্রতিপন্ন হল না কোন মতেই। এবার মনে একটু বল পেল সে। সিগারেটের দগ্ধাংশটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে সেটাকে নিভিয়ে দিয়ে ধোঁয়াটা মুখ দিয়ে উদ্গীরণ করে দিল সুনীল রায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা চক্রাকারে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে সুরু করেছে। হিসেব-পত্রে কোন খুঁত আছে বলেও মনে হল না। কিন্তু আবার সুনীল রায়ের মনের কোণে উদ্বেগ আর দ্বিধার কালো মেঘটা ঘনীভূত হয়ে উঠল। সন্দেহের ভূতটা আবার কোন অসতর্ক মুহূর্তে তাকে আশ্রয় করেছে। হঠাৎ কামরার আলোটার ওপর নজর পড়ল সুনীল রায়ের, একটা পোকা বার বার আলোটার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করছে আর আর বসছে এক একবার। সুনীল মনে মনে ভেবে নিলে, যদি পোকাটা এক থেকে তিন অবধি গোণবার মধ্যে আলোটার ওপরে বসে তা হলে সে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে না। এক···মনে মনে বললে সুনীল, দুই বলার আগে একটু সময় নিলে সে। সেই সঙ্গে আন্তরিকভাবে পোকাটাকে আলোর ওপর বসতে অনুরোধ করল, শুধু তাই নয়, সমস্ত মনের জোরটা অর্থাৎ উইল ফোর্স প্রয়োগ করে পোকাটাকে আলোর ওপর বসতে বাধ্য করতে চেষ্টা করল সে। দুই, নাঃ—পোকাটা বৃত্তাকারে শুধু ঘুরেই চলেছে, আলোর ওপর

বসছে না মোটেই। এর আগে কিন্তু বার বার বসছিল। ওটা আলোর ওপর বসার জন্য যে সুনীল রায়ের জীবনমরণ একটা সমস্যা নির্ভর করছে এটা সে বুঝতেই চাইছে না যেন। তিন—মনে মনে বললে সুনীল রায়। এইটাই শেষবার না; এবারও সব উপেক্ষা করে পোকাটা সমানে প্রদক্ষিণ করে চলল আলোটাকে। হ্যাঁ, ধরা পড়ে যাবে সে, এ বিষয়ে সে এখন নিঃসন্দেহ—মুহ্যমান মনের প্রতিক্রিয়াটা সুনীল রায়ের সারা শরীর শিথিল করে দিল এক নিঃশ্বাসে। দুর্বলতাটা ক্রমবর্ধমান হয়ে তাকে যেন গ্রাস করতে চাইল। এক পেগ হুইস্কি খেতে হবে পরের স্টেশনে, ভাবল সুনীল রায়। হুইস্কির তীব্র স্বাদটা আর উন্মত্ততা মুখে আর পাকস্থলীর মধ্যে অনুভব করল সে। হাসনুর দিকে চোখ পড়ল তার, হুইস্কি এবং হাসনু একই যোগসূত্রে বাঁধা রয়েছে, একটার কথা ভাবলে আর একটাও মনে পড়ে যায় সেই সঙ্গে। সুনীল দেখল কুঞ্চিত কেশের একটা গুচ্ছ হাসনুর কপালের সামনে দুলছে। ঝক্ ঝক্ ঝক্—ট্রেনটায় ঝাঁকুনি লাগল অকস্মাৎ। ঠিক সেই মুহূর্তে অপর কামরায় নানুভাই দেশাই ল্যাভটারি থেকে বার হওয়ার মুখে টালটা সামলে নিলেন পাশের দেওয়ালটা ধরে। নানুভাই দেশাই ভ্রূকুঞ্চিত করে এসে বসলেন তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায়। ট্রেনের অকস্মাৎ ঝাঁকনিতে তিনি বিরক্ত হন নি, বিরক্ত হয়েছেন অকারণে এতগুলো টাকা অপব্যয় হওয়াতে। হাসনু আর সুনীল রায়কে বার করতে এবং হাসনুকে বইটা শেষ করাতে তাঁকে অযথা এই বিড়ম্বনায় পড়তে হল। ধীরেন ভড়ের জন্যেই এই অঘটন ঘটেছে। আহম্মকটা এ অবস্থার কথাটা ভেবে দেখারও সময় পায় নি। হাজার হোক, বাঙালী তো, ভাবলেন নানুভাই দেশাই। অপরিণামদর্শী, পরশ্রীকাতর, আত্মবিদ্বেষী, শ্রমবিমুখ এ জাতটার সম্বন্ধে নানুভাই-এর ধারণা ভাল নয়।

ধীরেন—ডাকলেন নানুভাই।

অ্যাঁ, চমকে উঠেছে সে। এতক্ষণ একমনে অপর দিকের বেঞ্চে বসা মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিল ধীরেন ভড়।

মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের রবীনবাবু কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন নানুভাই। পাশের থার্ড ক্লাস কেন?

মানে এখানে ভীড় হলে আপনার কষ্ট হবে তাই। প্রভুভক্তির চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করল ধীরেন ভড়।

কষ্ট হবে? থার্ড ক্লাসে গেলেও আমার অসুবিধে হত না। নানুভাই-এর কথাটা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করলে তিনি প্রকৃতপক্ষে আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম পেতেন। নানুভাই দেশাই আরামপ্রিয় নন। মুক্তকণ্ঠে জনগণ সমক্ষে অবশ্য তিনি আরাম হারাম হ্যায় একথা ঘোষণা করেন নি, কিন্তু প্রত্যেক কাজকেই তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন প্রচুর। তিনি ঠিক বাঙালী বাবুদের মত নন।

কাপড়, জামা, সেণ্ট, সিনেমা, পরদা, সোফা বন্ধুদের নিয়ে চারবেলা ভুরিভোজ—নতুন নতুন উত্তেজনার লোভে শুধু শুধু নিজেদের দেউলিয়া করা! আর মাসের শেষে অফিস থেকে, এর তার কাছ থেকে দু-দশ টাকা ধার নেওয়া, এ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ধীরেন ভড়ের কথায় তিনি প্রীত হলেন না।

ট্রেন থামলে গিয়ে ডেকে এন—

আচ্ছা, এত সহজে নিষ্কৃতি পাবে এ আশা ধীরেন ভড়ের ছিল না। সব ব্যাপারেই তাকে সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়—কি ঘরে কি বাইরে। দ্বিতীয়-পক্ষে বিয়ে করে আব এক ঝঞ্ঝাট হয়েছে—ভেবেছিল পল্লীগ্রামের মেয়ে কলকাতায় এসে খুশীই হবে, হাতে আকাশের চাঁদ পাবে। ওমা, একেবারে উল্‌টো ব্যাপার—ঝগড়া, ঝগড়া, ঝগড়া—এ ছাড়া কথা নেই। অবশ্য ভাল যে বাসে না তা নয়। এই তো গত মাঘ মাসে নিউমোনিয়া হয়েছিল—এক হাতে সব করেছে, রাতের পর রাত জেগেছে। বিছানা ছেড়ে এক মুহূর্তও নড়তে চায় নি। শুধু কি তাই, নিজের গলার হার, হাতের বালা সব বাঁধা দিয়েছিল তার চিকিৎসার জন্যে! তখন ঝগড়া বাধত সত্য ডাক্তারের সঙ্গে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল ধীরেন ভড়ের। তখন তার অসুখ বাড়ের মুখে। একদিন সত্য ডাক্তারকে অপর্ণা বললে—

ডাক্তারবাবু একটা কথা বলব?

বলুন, সত্য ডাক্তার তাকালেন অপর্ণার দিকে।

আপনি তো রোজ চারটে করে ফুঁড়ছেন, কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না কেন?

এইবার সারবে—ঢোক গিলে বললেন তিনি।

সাত দিন হয়ে গেল, আপনি না হয় এক কাজ করুন ডাক্তারবাবু—

বলুন—

আরও চারটে করে ফি নিন একসঙ্গে।

কেন, শুধু শুধু ফি নেব কেন? আশ্চর্য হন ডাক্তারবাবু।

আমি জানি, বাঁকড়োর মধুসূদন ডাক্তার ঠিক এইরকম করে—যেই মনের মত ফি-টি পেল ব্যস—অমনি অসুখ সেরে গেল রোগীর।

না না, ও-সব ঠিক কথা নয়—ব্যস্ত হলেন সত্য ডাক্তার।

ঠিক কথা নয় মানে? নিজের চোখে দেখা। ডাক্তারদের আর কি বলুন না, রোগী যতদিন ভোগে ততই ভাল তাদের।

সব অসুখই সময়ে সারে—টাইফয়েড যদি চার দিনে সারাতে চান তা কি হতে পারে? অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয় কি আর সাধে পাই ডাক্তারবাবু? পাড়াগাঁ থেকে এসেছি কলকাতায় স্বামীর ঘর করব বলে—কিন্তু ও লোকটাই যদি ওরকম করে পড়ে রইল, তা হলে আর সাহস পাব কোত্থেকে?

তার দু-চার দিন বাদেই ধীরেন ভড়ের অসুখ সেরে গেল। কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্যদিক দিয়ে—সেদিন নজরে পড়ল অপর্ণার গলায় হারটা নেই—দোষের মধ্যে শুধু সে বলেছিল—

হ্যাঁ গো তোমার গলার হারটা কোথায়?

চুলোয়, জানো না ন্যাকা!

কেন, কি হল?

বলতে লজ্জা করছে না,—ভুঁড়ি উলটে এক মাস বিছানায় শুয়ে রইল, আর হার কি হল?

আমি বলেছিলাম নাকি তোমার হারটা নষ্ট করতে?

তবে কি করতে শুনি? কোমরে হাত দিয়ে এগিয়ে এল অপর্ণা।

কেন হাসপাতাল কি নেই? সেখানে যেতাম—ভয় দেখাচ্ছ কাকে। ধীরেন ভড়ের কি অভিমান থাকতে নেই? কিন্তু চালে ভুল হল। অপর্ণা রেগে গেল আরও।

হাসপাতাল কেন নিমতলায় গেলে তো পারতে?

তা হলে তো বাঁচতাম—আবার অভিমান করে ভুল করলে ধীরেন ভড়।

তুমি নয়, তুমি নয়—আমি বাঁচতাম, আমার হাড়ে বাতাস লাগত—বুঝলে, আমার হাড়ে বাতাস লাগত।

দুম্ দুম্ করে চলে গেল অপর্ণা। কিছুক্ষণ পরেই এক বাটি দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

দুধটা খেয়ে নাও।

কিন্তু ধীরেন ভড়েও অভিমান তখনও রয়েছে।

নাঃ, খাব না—মুখ ফিরিয়ে নিলে ধীরেন ভড়।

কি বললে? জ্বলে উঠল যেন অপর্ণা, খাবে না? এই বাটি দিয়ে ওই যে তোমার ছেলে শুয়ে রয়েছে ওর মাথায় মারব। সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে—বুঝলে?

কি, খাবে?

দাও—ধীরেন ভড় দুধটা খেয়ে নিলে।

অপর্ণা আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দিলে ধীরেন ভড়ের।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে দেখ না—ধীরেন ভড়ের সন্দেহ হল, অপর্ণার ঠোঁটের কোণে হাসির যেন আভাস রয়েছে। আচ্ছা দজ্জাল মেয়েছেলে যা হোক।

ওধারে বেঞ্চে-বসা মেয়েটা তো মন্দ নয়, নান্টুভাই কয়েকবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছে—তা সে লক্ষ্য করেছে। মেয়েটার ফিল্মস-ফেস আছে—ছবি উঠবে খাসা। কয়েক মাস ধরেই নতুন ফেস রিক্রুট করার চেষ্টাই আছে, কিন্তু আগের দিন আর নেই। অভিজাত বংশের শিক্ষিতা সুন্দরীরা অবশ্য ফিল্মসে নামছেন, কিন্তু তাঁদের সামলান খুব মুশকিলের কথা। টাকা-পয়সার কথা ছেড়ে দিলেও তাদের বইয়েতে নামাতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়।

সাধারণ অবস্থা থেকেও যে-সব খেঁদী-পেঁচীদের পালিশ করে জাতে ওঠান হয়—কিছুদিন পরে তারাও চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে সুরু করে। ধরাকে সরা দেখে—এও ধীরেন ভড় দেখেছে—আর বলবে নাই বা কেন একটু পালিস পড়লে, একটু চকচকে হলেই হন্যে কুকুরের মত সব ছেঁকে ধরে। তখন খেঁদী-পেঁচীদের দেমাক হবে বৈকি! আর তা ছাড়া তখন তো আর খেঁদী-পেঁচী নয়—তখন সুপর্ণা দেবী কিংবা বিশাখী মুখার্জি। এই তো সেদিনের কথা, কল্পনাকে কত কষ্টে ঘষে-মেজে যেই একটু চকচকে করেছে অমনি সকলের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল—আর মেয়েগুলোই কি কম নেমকহারাম নাকি—বলে কিনা, ধীরেনদা এবার থেকে আপনাকে জেটু বলে ডাকব। এমনকি

আর বয়েস হয়েছে? না হয় বংশগত টাকটাই অসময়ে একটু প্রকট হয়েছে, তাতে কি সে একেবারে জ্যাঠামশায়ের পর্যায়ে পড়ে যাবে? তা নয়! আদত কথা হল, স্থনীল রায় হাসনু আসবার আগে কল্পনার সঙ্গে স্থনীলের মাখামাখির কথা সকলেই জানত, অবশ্য স্থনীলের বেশীদিন টেঁকতে হয় নি। কারণ খোদ কর্তার নজর পড়েছিল কল্পনার ওপর। মেল ট্রেন যখন যায় তখন মালগাড়ী সাইডিং-এ যা'ব এ আর বিচিত্র কি? এখন আবার সেই স্থনীল রায় আর হাসনুকে িয়ে আর এক কাণ্ড! হঠাৎ ধীরেন ভড়ের মাথায় একটা মতলব এল, হুঁ! ঠিক হয়েছে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। স্থনীল রায়কে মেয়েটার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া যাক্—স্থনীল এ পর্যন্ত কোন কাজেই ব্যর্থকাম হয় নি। স্থতরাং স্থফল যদি হয় তা হলে হাসনুকেও ম্যানেজ করা যাবে, আর নতুন একটা মুখও সংগ্রহ হল। সিনেমা-সংক্রান্ত মাসিকে বিভিন্ন লোভনীয় ভঙ্গীতে স্বল্প পরিচ্ছদে ফটো তুলিয়ে ছাপিয়ে দিলেই চলবে—তলায় হেডিং থাকবে ফিল্ম জগতে নব-অভ্যুদয়—

আগামী দিনের উজ্জল তারকার প্রকাশ···তার পর একটু লেখা থাকবে শ্বেতা দেবীর জীবনী সম্বন্ধে—লিখে দিলেই হবে অভিজাতবংশের স্থশিক্ষিতা অপূর্ব দেহছন্দের অধিকারিণী। শ্রীমতী শ্বেতা শীঘ্রই আপনাদের অভিবাদন করবেন? দু-একটা যোগব্যায়ামের ভঙ্গীতে ফটো দিলেও মন্দ হয় না। পরের স্টেশনে স্থনীলকে খবরটা দিতে হবে।

আড়চোখে এষার দিকে তাকিয়ে হাত দুটো ঘষে নিলে ধীরেন ভড়। মনে মনে খুশী হয়েছে সে। স্থনীল রায়কে এর পর কাজ দিতে হবে, ছেঁটে ফেলতেও হবে। ওর জন্যে বহুবার তাকে বিপদে পড়তে হল। হাসনুর স্থটিংগুলো শেষ হোক তারপর সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে ওদের, আর এ মেয়েটাকে বাগাতে পারলে তো কথাই নেই। কিন্তু আবার তো সেই একই প্রশ্ন—স্থনীল রায়। বয়সটা যদি একটু কম হত তা হলে একবার দেখিয়ে দিত সে। স্থনীল রায়ের সব বাহাদুরী, নিঃশেষ করে দিত, বাছাধনকে আর চরে খেতে হত না। মেয়েটা একলা এসেছে—তা ধীরেন ভড় লক্ষ্য করেছে—একটি ছোকরা ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল, হয় তো তাও সে দেখেছে। কলেজে-পড়া ছোকরার প্রেম করতে সাধ হয়েছে।

জানে না তো কত ধানে কত চাল? মেয়েটার পাশে একটা হোঁতকা কালো টেকো লোক বসে বসে পান চিবুচ্ছে।

ক্রমাগত চিবিয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ গাড়ীতে উঠেছে ততক্ষণ, একনাগাড়ে চিবুচ্ছে—কচ কচ, এক মুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই। লোকটার চেয়ালটা যেন লোহার তৈরী, বার বার ইঞ্জিনের পিষ্টনের মত ওঠানামা করছে, সঙ্গে সঙ্গে চর্বিশ অন্তরালে গায়ের মাংসপেশী তুটো একসঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ব্রজেশ্বরবাবু পান খেতে ভালবাসেন আর শুধু পান কেন, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর একটু তুর্বলতা আছে। তাঁর ধারণা, খাওয়ার জন্যেই প্রাণীর জন্ম, আর মরতে যখন একদিন হবেই তখন না-খেয়ে মরার কি সার্থকতা থাকতে পারে? রসনা এবং জিহ্বার তৃপ্তিই তৃপ্তি। খাওয়ার জন্যই তো সব! এই যে তাঁকে দারুণ শীতের মধ্যে নরম ও গরম বিছানা ত্যাগ করে একটা জুয়োচোরের পশ্চাদ্ধাবন করতে হচ্ছে, এও সেই পেটের তাগিদে। নিজের অজান্তে ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর হাতের তালু তুটি উদরের ওপর ন্যস্ত করলেন। বেঞ্চির ওপর রক্ষিত টিফিন-কেরিয়ারটার ওপর নজর পড়ল তাঁর। বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়লেন তিনি, মনে পড়ে গেল, তার মধ্যে সুরমা দেবীর প্রস্তুত কড়াইশুঁটির কচুরি ও আলুর দম রয়েছে। তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবী সত্যই পাকা রাঁধুনী, বিশেষতঃ তাঁর তৈরী কচুরি এবং আলুর দম অতুলনীয় বলা চলে। বার তুই ঢোক গিললেন ব্রজেশ্বরবাবু, রসনা সিক্ত হয়ে এসেছে তাঁর। গাড়ীতে উঠলেই তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেটা তিনি বরাবরই লক্ষ্য করেছেন, আর হবে নাই বা কেন? তুপুর বেলার আহারকে দস্তুরমত লঘুপাচ্য বলা চলে, সুতরাং ক্ষুধার উদ্রেকে তিনি আশ্চর্য হলেন না। আশপাশে তাকিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু দেখলেন, যাত্রীদের মধ্যে কেউই খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত নয়। বিরক্তিতে জ্রুকুঞ্চিত করলেন তিনি। সকলের সামনে টিফিন-কেরিয়ারটা খুলে ক্ষুধা নিবারণ করতেও সঙ্কোচ বোধ করলেন। এই খাওয়ার জন্যে কয়েকবার তিনি লজ্জায় পড়েছেন বলে মনে পড়ল তাঁর।

তাঁর বিয়ের কয়েক বৎসর পরের একটি ঘটনা। শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়েছেন ব্রজেশ্বরবাবু। খেতে বসেছেন, সামনে বড় শালাজ বসে তত্ত্বাবধান করছেন।

কি খাচ্ছেন, ভাল করে খান, অত লজ্জা কিসের ?

না লজ্জা আর কি, দিন আর দুখানা।

আর একটু মাংস ?

দিন।

দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু। কয়েকবারই মাংস এবং লুচি নিলেন।

মিষ্টি দিই ? প্রশ্ন করলেন বড় শালাজ।

খাচ্ছি, আগে এগুলো খাই—বাঃ, মাংসটা তো চমৎকার হয়েছে, কে রেঁধেছে ? আপনি ?

হ্যাঁ।

দিন তা হলে আর একটু। বোধ হয় একটু হৃদ্যতা দেখাবার চেষ্টা করলেন ব্রজেশ্বরবাবু। মাংস তখন নিঃশেষ।

ইয়ে, মিষ্টিগুলো খান। আর একবার রাশ টানতে চেষ্টা করলেন ভদ্রমহিলা।

ওঃ বেশ ! তাই খাই। কিছুতেই আপত্তি নেই তাঁর। আর দোব ? ভদ্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বিপদে পড়লেন আবার।

দেবেন ? তা দিন।

তাও এক-একটি করে শেষ হয়ে গেল, যেন রাবণের বুভুক্ষা ব্রজেশ্বরবাবুর, শুধু তাই নয়, খাদ্য সম্বন্ধে যে লজ্জা নেই, সে কথাও প্রমাণিত হল।

সে রাত্রে ঘরে যেতে সুরমা দেবীর বেশ দেরী হল, ঘরে ঢুকে তিনি হেসে অস্থির। ব্রজেশ্বরবাবুকে বললেন, যা কাণ্ড করেছ তুমি !

কেন কি হয়েছে ?

আর কি, হাঁড়ি চাট-পুট, দোকান থেকে খাবার আনিয়ে তবে আমরা সকলে খেলাম।

তাই নাকি, ইস্, বড় অন্যায় হয়ে গেছে তা হলে। অপ্রস্তুত হলেন তিনি।

ওমা, অন্যায় কিসের, সকলের খুব ভাল লেগেছে।

বস্তুতঃ সুরমা দেবীরও নিজের ভাল লেগেছিল, এবং এ পর্যন্ত সে দিক দিয়ে সুরমা দেবীকে কোন দিনই নিরাশ হতে হয় নি। এখনও ব্রজেশ্বরবাবুর খাবার সময় তাঁর সামনে তিনি বসে থাকেন ! ব্রজেশ্বরবাবু

একমনে হাঁসফাঁস করে খেতে থাকেন, আর সুরমা দেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেই দিকে, খুব ভাল লাগে তাঁর।

প্ল্যাটফর্মে যে লোকটার সজ্জা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেই লোকটা ট্রেন ছাড়বার পর যখন তাঁর কম্পার্টমেণ্টেই উঠল তখন একটু আশ্চর্য হলেন ব্রজেশ্বরবাবু। লাল হরিণ-মার্কা জামাটা আর নীল রঙের প্যাণ্ট-পরা লোকটাকে ভাল লাগে নি তাঁর। লোকটার চালচলনও খুব আপত্তিজনক। বৃদ্ধবয়সে পদস্খলন হয়েছে বলে মনে হয়। তা না হলে বেঞ্চির ওপাশে বসা ওই মেয়েটার দিকে ওরকম ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকার কি মানে হয়? ওদিকের হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের ভয়ে তো লোকটা যেন সর্বদা সশঙ্কিত হয়ে রয়েছে। কোন কোম্পানীর মালিক-টালিক হবেন বোধ হয়! চোমরান গোঁফ, ভুঁড়ির পরিধি এবং আশেপাশে জনসমাগম দেখে সেই কথাই মনে হল ব্রজেশ্বর-বাবুর। মেয়েটির দিকেও লক্ষ্য করেছেন তিনি, অনেক মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন। পুলিসে চাকরি করার সুবিধেই এই, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জ্ঞান হয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই মেয়েটির স্থির এবং দৃঢ় চরিত্রের কথা মনে হল তাঁর। স্বদেশী যুগে বিপ্লবী দলে দু-একজন এই ধরনের মেয়ের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। ভারি শক্তজাতের হয় এই মেয়েরা—ভাঙে তবু মচকায় না। চোখ দুটো দেখলেই বোঝা, যায়,—দৃষ্টিটা স্থির—চাঞ্চল্য নেই, শুধু গভীরতা আছে। বুড়ীর অর্থাৎ তাঁর মেয়ে কল্যাণীর কথা মনে পড়ে গেল, সে কিন্তু অন্য জাতের মেয়ে, এর চেয়ে ছোট। তাঁর কাছে সব মেয়েই বুড়ীর চেয়ে বড়, একথাটা কেন মনে হয়, তা বিশ্লেষণ করে তিনি কখনও দেখেন নি। অন্ধ স্নেহের ওটা যে একটা নিদর্শন সেকথা ব্রজেশ্বরবাবু কোনদিনই ভাবেন নি। বুড়ী কি এভাবে একলা দূরে পাড়ি দিতে পারত? না, তা হয় তো পারত না। তবে বলা যায় না, কারণ মেয়েদের বিষয়ে কোন কথা সঠিক বলা যায় না। সময় এবং অবস্থা অনুসারে তারা সবই করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা তাঁর পুলিস-লাইনে থেকে হয়েছে।

হাজরা রোডের কেসটার কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটার নাম ছিল শিউলি গুপ্ত। সুন্দর চেহারা, বয়স আর কত হবে, তবে তাঁর বুড়ীর চেয়ে অনেক বড়। কলকাতা ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট। আশপাশের

থেকে সংগ্রহ করা রিপোর্ট থেকে মেয়েটির বিষয় যা জেনেছিলেন তাতে, এইটুকু বুঝেছিলেন যে, মেয়েটি আদর্শ চরিত্রের, শান্ত এবং মধুর স্বভাব। বছর তিনেক বিয়ে হয়েছিল, একটি দেড় বছরের ছেলেও ছিল। স্বামী ইঞ্জীনিয়ার—নাম নীরেন গুপ্ত। হাসপাতালে ব্রজেশ্বরবাবু শিউলি গুপ্তের জবানবন্দী নিয়েছিলেন—

আপনার নাম ?

শিউলি গুপ্ত।

আপনি এ রকম করলেন কেন ?

এ ছাড়া আর উপায় ছিল না বলে ?

আপনার স্বামীর ওপর রাগ হতে পারে কিন্তু অতটুকু শিশু তো কোন অপরাধ করে নি।

তাই তার কোন অবকাশ দিলাম না।

আপনার স্বামীর ব্যবহারে ইদানীং কোন—

না, তাঁর ব্যবহারে কোন পার্থক্য ছিল না, তিনি চিরকালই ভদ্র।

হঠাৎ উত্তেজনার বসে কি এ রকম করলেন ?

না, অনেক চিন্তার পর এ রকম করেছি, তবে উত্তেজনা একটু ছিল বৈকি।

স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে এ রকম করেছেন ?

না, ও আমায় যাতে ভুলতে না পারে সেইজন্য—

কত দিন আগে আপনি এই খবরটা পেয়েছিলেন ?

তিন মাস আগে উনি নিজেই আমায় সব বলেছিলেন ?

তা হলে এই তিন মাস সময় আপনি অপেক্ষা করেছিলেন কেন।

কোন্ পন্থা আমায় অবলম্বন করতে হবে, সেটা এই সময় ঠিক করে নিয়েছি।

সে মেয়েটির নাম কি ?

অমিতা সিংহ। সম্পর্কে আমার বোন হয়।

মেয়েটির স্বভাব কি ভাল নয় ?

এত ভাল স্বভাবের মেয়ে হয় না।

এবে এ রকম হল কেন ? তা হলে আপনার স্বামীর দোষ নিশ্চয়ই।

তা জানি না—কার দোষ বুঝতে পারছি না—বোধ হয় আমার নিজেরই দোষ। অমিতাকে ওর সঙ্গে না পাঠালেই হত।

কোথায় ?

উত্তর প্রদেশে। ওখানে আমার স্বামী একটা ব্রীজ করছিলেন। সেই সময় তিনি অসুখে পড়েন। অমিতাকে লক্ষৌতে চিঠি লিখে আমিই পাঠিয়েছিলাম তাঁর সেবা করার জন্যে।

তার পর ?

তার পর সবই বুঝলাম। উনি যখন ফিরে এলেন তখন যেন অন্য মানুষ, শরীর তো ভেঙেছেই, তা ছাড়া মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে মনে হল।

কি রকম ?

রাত্রে ঘুমতেন না, বিড় বিড় করে একমনে কি বকতেন, তা ছাড়া সময় সময় আমার হাত ধরে কাঁদতেন আর ক্ষমা চাইতেন।

আপনি কিন্তু ক্ষমা করতে পারলেন না ?

ক্ষমা মানে যদি বলেন ভুলে যাওয়া, জিনিসটাকে লঘু করে নেওয়া, তা হলে করি নি। আমি জানি, কাজের চাপে অসুখের ফলে বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থাতে হয় তো প্রতিক্রিয়া হিসাবে এক মুহূর্তের অসতর্কতায় সেটা ঘটেছিল। কিন্তু আমি কেন ওই কাঁটাটা সারাজীবন বুকে বয়ে বেড়াব ? আমি কেন সকলের কাছে ছোট হব ?

কিন্তু আপনার স্বামীকে এ কষ্টে ফেললেন কেন ?

আমার কষ্ট বুঝবে বলে।

এক মুহূর্তের ভুলের জন্যে এত বড় শাস্তি কেন তাকে দিলেন ?

এক মুহূর্তও আমায় ভুলবে না বলে।

কিন্তু অসহায় শিশুটা ?

অসহায় যাতে না হয় সেই জন্যেই তো—

কিন্তু নিজে এভাবে—

হ্যাঁ, হয় তো আরও সহজভাবে মরা যেত ! কিন্তু একটা ভুল করলাম বিষটা সবটা খোকনকে দিয়ে দিলাম—যদি বেঁচে যায় তা হলে। তারপর নিজে বিপদে পড়লাম।

কেন ?

এমন কিছু হাতের কাছে পেলাম না যাতে করে—আর তা ছাড়া মৃত্যুটা একটু একটু করে হলে উপভোগ করা যায়।

উপভোগ ?

হাঁ। একটা কাঠের পার্টিশন থেকে সরু একটা লোহার মত তার বেরিয়ে ছিল, তাতে বাঁদিকের বুকটা ঠিক হৃদ্-পিণ্ডের জায়গায় দিয়ে নিজের দেহটা সজোরে ঠেলে দিলাম, রডটা ভেতরে ঢুকতে চা' নি, তার পর খুব জোর দেওয়ার রডটা ভেতরে ধীরে ধীরে ঢুকতে লাগল, সব শক্তি দিয়ে নিজের দেহটাকে আরও ঠেলে দিলাম, কচকচ করে কাটতে কাটতে লোহার রডটা ঢুকে গেল।

শিউলি গুপ্ত সুন্দরী, আধুনিকা এবং শিক্ষিতা। তার সম্বন্ধে একথা কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিল কি !

হ্যাঁচ-চো-ও-ও। চমকে উঠলেন ব্রজেশ্বরবাবু। নাম্নুভাই দেশাই সশব্দে হাঁচলেন। লোকটা অসভ্য যে ভদ্রভাবে অসভ্য কাজগুলো এখনও করতে শেখে নি। পকেট থেকে দেড়-গজি একটা রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন—নানান ভঙ্গীতে একবার এ নাক একবার ও নাক, মোটা কড়ে আঙুলে রুমাল জড়িয়ে বুরুশ দিয়ে শিশি ধোয়ার ভঙ্গীতে কয়েকবার, তারপর হাতের তালু দিয়ে নাকের উপর ঘসলেন দু-তিনবার, দু-আঙুলে নাকটা টিপে ধরলেন, নিশ্বাস নিলেন জোরে জোরে বারকতক, অতঃপর রুমালটা খুলে নিরীক্ষণ করলেন কয়েক সেকেণ্ড—প্রয়াসের ফলটা অনুধাবনের জন্য। রুচিটাও দেহের মতই স্থূল।

উসখুস করছেন ব্রজেশ্বরবাবু, তিনি শুধু বিরক্তই হন নি, বেশ রেগেও গেছেন। আর কাঁহাতক সামলানো যায়—এ কম্পার্টমেণ্টে সকলেই কি অনশন ব্রত নিয়েছে নাকি ? রাগে তাঁর তালু শুকিয়ে গেল, দুটো পান গালে দিয়ে ক্রমাগত চিবুতে লাগলেন। থাক গে, এর পরের স্টেশনে শুনেছেন পানতুয়া পাওয়া যায়—ভাল ঘিয়ে ভাজা তাজা পানতুয়া—স্টেশনে গাড়ী থামলে টাকাখানেক পানতুয়া নেওয়া যাবে। কড়াইশুঁটির কচুরি—আলুর দমের পর একটু মিষ্টিমুখ না করলে খাওয়াটা ঠিক সম্পূর্ণ হবে না। পানতুয়া আর পানের রস এক হয়ে গেল। মেয়েটি মনে হয় তাঁর দিকে আড়চোখে একবার তাকালে।

এষা চৌধুরী সত্যিই তাকিয়েছিল ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে, কারণ বিরক্ত বোধ করছিল সে। যতগুলো মূর্তিমান উৎপাত সব যেন একসঙ্গে জুটেছে এই কামরাটায়। পাশের ভদ্রলোক তো ক্রমাগত পান চিবুচ্ছেন আর চর্বির স্তূপের মধ্য থেকে ছোট চোখ দুটো বার করে কেবল নিরীক্ষণ করছেন সকলকে। অবশ্য চাউনিটা আর কিছু না হোক ভদ্র। যেন হাঁসফাঁস করছেন ভদ্রলোক, দারুণ শীতেও ঘেমে গেছেন, আর ঘামবেন নাই বা কেন, যা দেহের আয়তন তাতে ঘামা আশ্চর্য নয়।

ওপাশে আর একজন বসে রয়েছেন, তাঁর অবস্থা তো সঙ্গীন, লাল হরিণ মার্কা জামা আর মীগ রঙের প্যাণ্টপরা। এষার বাবার বয়সী হবে, কিন্তু তার দিকে এমন তীর্যক দৃষ্টি দিচ্ছেন, যাকে ঠিক পিতৃসুলভ বলা চলে না। মানুষের কি অদ্ভুত রুচি হয়—স্থানকালপাত্রভেদে নাকি রুচি পরিবর্তন হয়। কিন্তু ও-ধরনের লোকের রুচির পরিবর্তন হওয়া খুব শক্ত। পাশের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও ওই শ্রেণীর। একটা জিনিস এষা লক্ষ্য করল—এই তিনজন আয়তনে, বয়সে এবং ওজনে প্রায় সমতুল্য—পাশের ভদ্রলোকের অবশ্য চাউনিটা আপত্তিজনক নয়—এই যা তফাত। কম্পার্টমেণ্টে একজনও মেয়েছেলে নেই—একটু অস্বস্তি বোধ করছিল এষা সেইজন্যে, তা ছাড়া ভয়ও করছে, একলা এভাবে বাইরে এর আগে কখনও আসে নি, শুধু যদি সঞ্জীব কাছে থাকত তা হলে সব ভুলে থাকতে পারত। সঞ্জীব তাকে কোন দিনই ভুল বুঝবে না, তারা দুজনেই দুজনকে চেনে, পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে পারে। শত বিপদও ওদের মিলনের কাছে হার মেনে যায়—সঞ্জীব ভুল বুঝ না আমায়—।

আশ্চর্য ওরা, একটুও বোঝে না, পাওয়া মানে কি! স্থূল অনুভূতি ছাড়া ওদের অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। সঞ্জীব ভাবছে, আমার স্বার্থের জন্য আমি তাকে ছেড়ে চলেছি—অর্থের আশায়—প্রতিষ্ঠার আশায়—তা নয়, পাব বলেই তো দূরে যাচ্ছি। না, চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়, মালতীদির মত সে অবস্থা বিপর্যয়ে নিজেও পড়তে চায় না, সঞ্জীবকেও ফেলতে চায় না, কিন্তু মালতীদিই বা কেন ও রকম অবস্থায় পড়ল? বরাত—বলে চুপ করে বসে থাকব নাকি? সারা জীবনই মালতীদির ওই একই অবস্থা থাকবে? দুঃখে, কষ্টে, বেদনায় জর্জরিত হয়ে কাল কাটাবে? এর কোন প্রতিকার নেই? এখন হয় তো নেই, এখনও সমাজের, দেশের সে দৃঢ়তা—বলিষ্ঠতার অভাব

রয়েছে! সুনীলদা, ওই একটা লোকের জন্যে মালতীদি আজ হাসতে ভুলে গেছে। কিন্তু সুনীলদাকে প্রথম থেকে দেখেই ভাল লেগেছিল—যেমন সুন্দর চেহারা তেমনই ব্যবহার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে এ রকম সাংঘাতিক তা কে জানত! তার বাবা শান্ত, আত্মসমাহিত, ধ্যানগম্ভীর। পৃথিবীর কলরোল থেকে যিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, আত্মভোলা মহেশ্বরের মত কঠিন তপস্যায় যিনি ডুবে রয়েছেন—তিনি কি করে সহ্য করবেন, এ আঘাত তাঁর স্নেহের মালতীর এ দুর্দশায় তিনি কি করবেন? মালতী অবশ্য বলবে না কিছুই, কিন্তু রমেনবাবুর মত সহানুভূতিসম্পন্ন অনেক প্রতিবেশী আছেন—দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁরা যেন সর্বদাই উন্মুখ হয়ে আছেন—মুখে সমবেদনার কথা বলেন বটে, কিন্তু প্রতিবেশীর দুঃখ তাদের কাছে অত্যন্ত মুখরোচক, খাদ্যের মতই লোভনীয় ও কাম্য।

ঘাড় ফিরিয়ে এষা দেখলে বাইরের দিকে—চারিদিকে অন্ধকার, ঘন ঝোপ-ঝাড়, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড দু-একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন অনেকগুলি শিশুসন্তান নিয়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রেনের আওয়াজটি দূরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে আর একটা ট্রেন যেন পাশাপাশি যাচ্ছে, টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো এতক্ষণ লাইনের কাছাকাছি ছিল—এবার সেগুলো দূরে সরে গেল—একটার পর একটা যাচ্ছে, ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। একটা গাছের মাথায় একটা পতাকা, বনদেবীর পূজার আয়োজন হয়েছে বোধ হয়। দূর থেকে বেশ লাগে দেখতে, কাছে গেলে কি অত লাগবে!

নতুন চাকরিটার কথা মনে পড়ে গেল এষার। চাকরির কোন অভিজ্ঞতা নেই—অনেক কষ্টে চাকরিটা পাওয়া গেছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়? এবারে তাকে মন স্থির করতে হবে, বাবাকে সাহায্য করতে হবে, মালতীদির ভার নিতে হবে।

পাশের ভদ্রলোক যেন উসখুস করছেন, বেঞ্চের তলায় রাখা টিফিন-কেরিয়ারটা একবার বার করলেন—হয় তো ক্ষিধে পেয়েছে, সেটা অবশ্য বিচিত্র নয়, বপুর বহর দেখলে ক্ষিধেটা আন্দাজ করা যায়। ওপাশের লাল হরিণ-মার্কা জামা পরা ভদ্রলোক এখনও তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, হয় তো পরিচিত বা আত্মীয় কোন মেয়ের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিংবা হয় তো তার মত দেখতে কোন মেয়ে তাঁর মারা গেছে—কিন্তু মৃত কন্যাকে

স্মরণ চোখের দৃষ্টিটা ওরকম হবে না, আর তা ছাড়া হাবভাবও তেমন নয়, বৃদ্ধ বয়সে, যুব-সুলভ মুখভঙ্গী নকলও তেমন শোভনীয় বা সময়োপযোগী বলে মনে হচ্ছে না। সঞ্জীবের চাউনীটা বেশ, ওর চোখের তারাটা কিন্তু ব্রাউন রঙের, মুখটা লম্বা ধরনের, চোখ দুটো বড় বড়, ভ্রূ দুটোও বেশ লাগে, একটা সামঞ্জস্য আছে ওর চোখের সঙ্গে। কোন দিন ও সোজা ভাবে চায় না, একবার তার মুখের দিকে তাকায় আবার দৃষ্টিটা অন্য দিকে ফেরায়—এক সঙ্গে অনেকক্ষণ তাকায় না কেন কে জানে? দৃঢ়তার মধ্যে সলজ্জ হাসিটা এষার বেশ লাগে, ওদের দুজনদেরই মন অনেকটা এক। মনের কথা নিয়ে ওরা ভালবাসাকে যাচাই করে না। ভালবাসা নিয়ে গল্প করে না—ভালবাসা কি বলার জিনিস? গল্প-উপন্যাসের পাতায় ইনিয়ে বিনিয়ে ভালবাসার কাহিনী শুনতে শুনতে তার মনে হয় ভালবাসার আসল রূপটি মিলিয়ে গেছে—তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। কমলা খুব ভালবাসার কথা বলতে পারে—তাকে কত ছেলে যে ভালবাসল, কার ভালবাসা কি রকম তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারে সে। তার বক্তব্য হল—তার জন্যে সকলে পাগল, এর জন্যে সে কি করতে পারে—তার সৌন্দর্যের জৌলুসে পতঙ্গের মত কাতারে কাতারে মোহমুগ্ধ হয়ে তার চতুর্দিকে প্রশংসা ও ভালবাসার গুঞ্জনধ্বনি তুলে যদি কেউ আসে তা হলে তার অপরাধ কোথায়?

কিন্তু এই ভালবাসার গল্পগুলিই কমলার অমূল্য সম্পদ। যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরীর সুদৃঢ় ভূগর্ভস্থিত সেলটারের মধ্যে সেগুলি সঞ্চিত করে রেখেছে, জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে সযত্নে সেগুলো বাঁচিয়ে রেখেছে। নেশার সময় নেশার জিনিস থেকে বঞ্চিত হলে বিপদ হয়। ভালবাসার গল্প কমলার নেশার জিনিস। মৌতাতের সময় সেগুলো চাই। অপরের কাছে বলতে হবে, নিজে মনে মনে ভাবতে হবে, তবে তার মনটা সরস হবে, উদ্দীপনা আসবে—তা না হলে ছট্‌ফট্ করবে, উসখুস করবে—পাশে বসা ওই পেটুক ভদ্রলোকের মত। এষা কিন্তু নিজের মনের কথা নিয়ে আলোচনা করে না, সঞ্জীবও তাই। সেবার সঞ্জীবের সর্দি-জ্বর হয়েছিল, বেশ ভোগালে কয়েকদিনই। পরস্পরের খবর পেল না কয়েক দিন। তার পর যেদিন দেখা হল, সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে এষা বললে, কয়েক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি পারি নি এমন আটকে গেছলাম।

ও! তাই নাকি ?

হ্যাঁ। এষা আগেই সঞ্জীবের শরীর খারাপের কথা জেনেছিল।

কি নিদারুণ উৎকণ্ঠায় এ ক-দিন কাটিয়েছিল সেকথা প্রকাশ করতে ও কিন্তু রাজী নয়।

তোমার চেহারাটা কেমন শুকনো লাগছে। প্রশ্ন করলে সঞ্জীব!

আমার? আশ্চর্য হল এষা—উল্টো চাপ কেন ?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কয়েক রাত্রিই তুমি যেন ঘুমাও নি।

চেহারা দেখে অনিদ্রার কথা বলা যায় নাকি ?

হ্যাঁ তা বলা যায় বৈকি—অন্ততঃ আমি তো বেশ বুঝতে পারছি। সঞ্জীবের চোখে কৌতুক। মুখ ফেরাল এষা, ধরা পড়ে যাচ্ছে নাকি ?

হ্যাঁ, একদিন শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে বললে এষা।

হ্যাঁ, আমিও বালিগঞ্জে গিয়ে সেই খবরই পেলাম।

সে কি, তুমি ওই শরীর নিয়ে বালিগঞ্জে গেছলে? উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল এষা।

হেসে উঠল সঞ্জীব, ওরা দুজনেই ধরা পড়ে গেল।

পাশের ভদ্রলোক এবার মরিয়া হয়ে উঠেছেন, টিফিনকেরিয়ারটা বেঞ্চির নিচে থেকে ওপরে তুলেছেন, বাঁ হাতে তালু দিয়ে উত্তাপটা লক্ষ্য করছেন বোধ হয়—বেঞ্চির ওপর রেখে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে—অদর্শনে কাতর হয়ে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই।

গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়ে এল—এক লাইন থেকে অপর লাইনে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে—কামরাটা দুলছে—এক ধার থেকে অপর ধারে—লাইনের সঙ্গে গাড়ীর চাকার সংঘর্ষ হচ্ছে—একটানা আওয়াজটা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তীক্ষ্ণ—ওপরের বাঙ্কের শিকলগুলো কেঁপে কেঁপে আওয়াজ করছে ঝম ঝম ঝম—সর্ব শৃঙ্খলের এক রকমই আওয়াজ বোধ হয়। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গাড়ীটা ঢুকল। নির্জন অঙ্গন থেকে কোলাহলময় জনাকীর্ণ ঘরের মধ্যে যেন হঠাৎ ঢুকে পড়েছে, অন্য পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে ট্রেনটা। এতক্ষণ দারুণ পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন সে, ধীরে ধীরে থামল গাড়ীটা।

ব্রজেশ্বরবাবু অপেক্ষা করছিলেন, ট্রেন থামতেই তিনি প্ল্যাটফর্মে নামলেন—পানতুয়া কিনতে হবে তাঁকে।

ব্রজেশ্বরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পানতুয়া বিক্রেতারা হঠাৎ ডুমুরের ফুল হয়ে উঠল যেন, একটাকেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবারই ঘুরে এলেন, ওদিকটা দেখা হয় নি। দ্রুত চললেন তাঁর হস্তীতুল্য দেহটি নিয়ে।

মাধবী তৃতীয় শ্রেণীর বগিতে বসে, স্টেশনে গাড়ীটা থামতেই নজর পড়ল ব্রজেশ্বরবাবুর ওপর—আরামবাগের দাদাবাবু না? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। আবার সামনে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। খুব নিরীক্ষণ করে দেখলে মাধবী—আর সন্দেহ নেই তার—আরামবাগের দাদাবাবুই, সেই লম্বাচওড়া কালো রঙের চেহারা। বদলেছে অনেক, প্রায় বুড়ো হয়ে গেছেন, মোটা হয়েছেন খুব, মাথার চুলগুলো উঠে গেছে। তা হোক, আরামবাগের দাদাবাবুকে চিনতে মাধবীর দেরী হল না। ট্রেন থেকে নামল মাধবী—একবার প্রণাম করতে হবে, কতদিন দেখা হয় নি।

ব্রজেশ্বরবাবু ফিরে আসছিলেন, হঠাৎ পায়ের ওপর মাধবী উপুড় হয়ে প্রণাম করল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, বললেন, কে?

আমি মাধু।

মাধু? অবাক হলেন ব্রজেশ্বরবাবু, মাধু বলে কোন স্ত্রীলোককে তিনি চেনেন না তো!

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল মাধবী, আমায় চিনতে পারলেন না দাদাবাবু?

হ্যাঁ, না, ইয়ে—ঠিক মনে করতে পারছি না তো—

আরামবাগের কথা সব ভুলে গেছেন? আমার মা আপনাদের বাড়ী রান্না করত।

বিস্মৃতির অতলগহ্বরে ব্রজেশ্বরবাবু ডুব দিলেন—হাঁ, একটা শুঁটকে মেয়ে মাথায় উকুন আর ময়লা কাপড় নিয়ে, ছেঁড়া ফ্রক্ পরে বাইরের দাওয়াতে বসে থাকত, এই সেই নাকি?

তুমি মাধু?

হ্যাঁ দাদাবাবু, আমিই মাধু। আবার প্রণাম করলে মাধবী—আপনার

দয়া কোনদিনই ভুলব না। আমার মায়ের অসুখের সময় আপনি কত করেছেন। আর আপনি না দেখলে তো আমি মরেই যেতাম।

এত উপকার যে ব্রজেশ্বরবাবু করতে পারেন সেকথা তাঁর নিজেরই বিশ্বাস হয় না।—কোথায় যাচ্ছ? বললেন তিনি।

স্বামিজীর সঙ্গে যাচ্ছি।

মাধবীর নাকের তিলকের ওপর নজর পড়ল ব্রজেশ্বররাবুর—স্বামিজী?

হ্যাঁ, হুগলীর স্বামী স্বরূপানন্দ।

হুগলীর?

কৌতূহল হল ব্রজেশ্বরবাবুর, নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ওখানে কতদিন আছ?

তা প্রায় তিন মাস হল।

আমিও তো স্বামিজীকে খুঁজছি?

কেন? মন্ত্র নেবেন বুঝি?

না, দেখার ইচ্ছে আছে?

দেখার কিছু নেই।

কেন বল তো?

দাদাবাবুকে সব বলে দেবে, দাদাবাবুর চেয়ে আপনার আর কে আছে পৃথিবীতে? স্বামিজী, দত্তবাড়ীর বাবু, সেন-সাহেব সবাই এক, সাজসজ্জায় শুধু তফাৎ। কেবল দাদবাবুই যা মানুষ—মাধবীর কৈশোরের স্বপ্ন।

ব্রজেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকাল মাধবী, স্বপ্নের সঙ্গে অবশ্য কোন মিল লক্ষ্য করল না ব্রজেশ্বরবাবুর চেহারায়। তবুও সাহস পেল মাধবী, হারিয়ে-যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে এল যেন।

বললে, আপনি মানুষ নন দাদাবাবু, দেবতা। আপনাকে সব বলব। থেমে থেমে উচ্চারণ করল মাধবী।

বল। ব্রজেশ্বরবাবু তাকালেন মাধবীর দিকে।

স্বামিজী লোক ভাল নয়।

কেন?

একটা মাড়োয়ারীর অনেক টাকা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে আর আমাকেও নিয়ে যাচ্ছে সেই সঙ্গে। আনুপূর্বিক ঘটনার একটা বিবৃতি দিল মাধবী।

তুমি কাউকে বলনি কেন ?

কাকে বলব দাদাবাবু ? আর যদি জানতে পারে তা হলে ও আমায় শেষ করে দেবে। পাংশুমুখে জবাব দিলে মাধবী।

কোন্ গাড়ীতে আছে সে ?

ওই যে আগের কামরায়। একটা কামরার দিকে দেখিয়ে দিলে সে, তারপর আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি কি করব দাদাবাবু ?

তুমি যাও, গিয়ে গাড়ীতে বস, পরের স্টেশনে আমি দেখা করব আবার। হ্যাঁ, আর একটা কথা—স্বামিজীর ডান-চোখের তলায় একটা কাটা দাগ আছে ? প্রশ্ন করলে ব্রজেশ্বরবাবু।

হ্যাঁ আছে, লম্বা একটা দাগ। কেন দাদাবাবু ? স্বামিজীকে নিশ্চয় চেনেন দাদাবাবু, ভাবছে মাধবী।

ঠিক আছে, তুমি গাড়ীতে বস। কারণটা বলার মত সময় নেই ব্রজেশ্বরবাবুর।

এগিয়ে গেলেন তিনি নির্দিষ্ট কামরাটির দিকে, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন স্বামিজীকে—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বরাত তাঁর ভালই বলতে হয়—একসঙ্গে দুজনকে পাওয়া যাবে। হুগলী থেকে কয়েক সপ্তাহ আগেই স্বামিজীর খবরটা পেয়েছিলেন তিনি। কসবার নান্টুভুরও এতদিনে সন্ধান মিলল।

স্টেশনের ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার ট্রেন ছাড়বে, পা চালিয়ে চললেন তিনি। মাধবী মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ব্রজেশ্বরবাবুর পানতুয়া কেনা হল না। মাধবীর শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টির সামনে পানতুয়া কেনাটা খুব শোভন হবে বলে মনে হল না। ব্রজেশ্বরবাবু নায়কোচিত ভঙ্গীতে লাফিয়ে উঠে পড়লেন নিজের কামরায়।

স্টেশনে গাড়ী থামতেই ধীরেন ভড়ও ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাশের তৃতীয় শ্রেণীতে রবীন সরকার বসে আছে—কর্তার হুকুম হয়েছে তাকে ডাকতে হবে। লাল হরিণমার্কা জামার ওপর নীল রঙের একটা কোট চাপিয়ে নিলে ধীরেন ভড়। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, ভেতরে অপর্ণার তৈরি স্লিপ-ওভারটা আছে, গরম গেঞ্জীও একটা আছে বটে, তবুও শীত করছে বেশ। রবীনের থার্ড ক্লাসের কামরাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ধীরেন ভড়।

ওহে, কর্তা তোমায় ডাকছেন—

আমাকে ? আশ্চর্য হল রবীন, তাকে কেন ?

হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে গাড়ীতে থাকতে হবে—মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের কি সব কথা আছে যেন—

কিন্তু আমার থার্ড ক্লাসের টিকিট যে। আপত্তি জানায় রবীন।

তার জন্যে চিন্তা নেই, সে ব্যবস্থা করা যাবে। রবীন সরকারকে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে দিয়ে ধীরেন ভড় বাকি টাকাটা পকেটস্থ করেছিল, এবার সেটাকে উদ্গীরণ করতে হবে ভেবে ক্ষুণ্ন হল সে।

নিয়ে এস—এই কুলী। ডাকলে ধীরেন ভড়।

রবীন সরকার মালপত্র নিয়ে নান্নুভাইয়ের গাড়ীতে এসে উঠল।

এই যে রবীনবাবু, বসুন। অভ্যর্থনা করলেন নান্নুভাই। মাঝের বেঞ্চিতে বসল রবীন।

হরবংশ কোম্পানীতে খবর দিয়েছেন ?

হ্যাঁ, কাল টেলিগ্রাম করেছি।

মালের অর্ডার কি রকম পাওয়া যাবে বলে মনে হয় ?

'কমভিটোলিনে'র অর্ডার কিছু পাওয়া যাবে বোধ হয়।

গত মাসে বিক্রী তো ভাল হয় নি। রবীনের দিকে তাকালেন নান্নুভাই।

এখন বাজার মন্দা, তা ছাড়া কমপিটিসান বেড়ে গেছে, আর ওই একই ধরনের ওষুধ চালান মুশকিল !

রোজ কি নতুন নতুন ওষুধ বার করতে হবে নাকি ? নান্নুভাই বিরক্ত হলেন। ধীরেন ভড় রবীনের নির্বুদ্ধিতা দেখে খুশী হল যেন।

তা বলছি না, তবে একটু পালটাতে হবে। উত্তর দিল রবীন।

তার মানে, খুলে বলুন।

আমার সাজেশান হচ্ছে, কমভিটোলিনের সঙ্গে কয়েকটা ওষুধ মিলিয়ে আরও দু-একটা ভ্যারাইটি করতে হবে যেমন ধরুন কমভিটেলিন উইথ ডায়াসটেস, কমভিটোলিন উইথ ফলিক এ্যাসিড এণ্ড আয়রন, কমভিটোলিন উইথ কোলা কোলা—এই রকম আর কি। লোকে একটা না নিলে আর একটা দেওয়া চলবে—ডাক্তারবাবুরাও ইম্প্রেসড হবেন। তা ছাড়া

'লিটারেচার'গুলোও ভাল করে ছাপানো দরকার। বাজে ছবি দিয়ে সস্তায় ওগুলো ছাপান হলে কোম্পানীর সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা হয়ে যায়।

হুঃ, খরচ বাড়বে না? স্ফীত চিবুকের ওপর কয়েকবার হাতের তালুটা ঘষলেন তিনি।

না, খরচ আর এমন কি হবে, লেবেলগুলোও পালটাতে হবে ঐ সঙ্গে, আর খরচ যা হবে সামান্যই, তার বদলে বিজনেস পাওয়া যাবে ভালই।

ভ্রুকুটি করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন নান্নুভাই দেশাই। ধীরেন ভড় আশা করছে, রবীন সরকারের এবার দফা শেষ হবে, ধমক খেল বুঝি।

আপনার এ সাজেশান আগে দেন নি কেন? বললেন নান্নুভাই। চুপ করে রইল রবীন সরকার।

সামনের মাস থেকে কোম্পানীটাকে রি-অরগ্যানাইজ করুন। সেলস ম্যানেজার আমাদের ছিল না, ওটার দরকার। আপনি কত মাইনে পাচ্ছেন এখন? একটু চিন্তা করে প্রশ্ন করেন নান্নুভাই।

একশ' পঁচাত্তর টাকা। মৃদুস্বরে উত্তর দিলে রবীন।

সামনের মাস থেকে চারশ' পঞ্চাশ টাকা আর টি-এ পাবেন, কোন অসুবিধা হবে না?

না। ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল রবীন! কারণ সংবাদটা হঠাৎ তাঁকে বিমূঢ় আর স্তম্ভিত করে দিয়েছে যেন।

ধীরেন ভড়ও হকচকিয়ে গিয়েছে, ভুল শুনছে না তো! কি আশ্চর্য, রবীন সরকারও তাকে ছাপিয়ে ওপরে উঠে গেল? ঈর্ষায়, কশাঘাতে মুখটা ছোট হয়ে গেল ধীরেন ভড়ের।

রবীন সরকার আশা করে নি যে, এভাবে ট্রেনের কামরায় তার পদোন্নতির খবরটা পাবে। তখনও যেন খবরটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

মীরার কথাই আগে মনে পড়ে গেল। খবরটা শুনে মীরা কি করবে? খুব শক্ত মেয়ে মীরা, নিজেকে ঠিক সামলে নেবে। মীরার সুন্দর মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—মাঝারি ধরনের চেহারা মীরার, তার মত দীর্ঘাকৃতি লোকের পাশে যেন ছোট দেখায়।

মীরার মুখটা কিন্তু সুন্দর, একটু গোল ভাব, চোখ দুটো বড় বড়, মুখটি ঘিরে যেন লাবণ্য ছড়িয়ে আছে। বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয় তাকে,

কে বলবে তার মিন্টুর মত মেয়ে আছে ? শুভ সংবাদটা সে নিজেই মীরাকে দেবে, টেলিগ্রাম করার কোন দরকার নেই। মীরার মুখটা খবর পেয়ে যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সেটা দেখার লোভ আছে রবীন সরকারের। পাশ থেকে মীরাকে আরও সুন্দর দেখায়। একটা ছবি মনে পড়ে গেল তার।

একদিন স্নান করার পর মীরা বসে বসে সেলাই করছে। ভিজে চুলগুলো সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে ময়ূরের পেখমের মত। কপালের পাশে একগুচ্ছ চুল এসে পড়েছে, সবেমাত্র সিঁদুর পরেছে মীরা। স্নান করার পর মীরা সিঁদুর পরে। মাথার সীঁথিতে চিরুনি দিয়ে সোজা একটা রেখা টানে, তার পর দেয় কপালে একটা ছোট্ট টিপ, পরে সেই আঙুলটা বাঁ হাতের শাঁখার ওপর ছুঁইয়ে নেয়, কেন তা কে জানে ? খুব ভাল লেগেছিল রবীনের। মীরার সজ্জা, বসবার মনোহর ভঙ্গীটা, তার তন্ময়তা, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল সে, চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না, হঠাৎ মীরা নিজেই চোখ তুললে। রবীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তখনও। হাসল মীরা, বলল, কি দেখছ ?

তোমায় ?

সে তো অনেক দেখেছ।

হ্যাঁ, তা দেখেছি। তবে আজ যেন তোমায় নতুন করে দেখলাম।

নতুন করে ? মীরার মুখে হাসি।

হ্যাঁ, মীরা, তোমার এক-একটা রূপ আমার কাছে নতুন করে যেন ধরা দেয়।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

এখনও পুরনো হয় নি ? মীরার চোখে কৌতুক।

না মীরা, তুমি আমার কাছে চিরদিনই নতুন। এগিয়ে গেল রবীন, মীরার পাশে বসে কাঁধে একটা হাত রাখল তার।

কি মতলব বল তো ? এখনই মিন্টু এসে পড়বে। আড়চোখে মীরা তাকাল।

না, বাইরে খেলা করছে আমি দেখে এসেছি, কী সুন্দর মুখটা তোমার মীরা। ঘনীভূত হল রবীন।

বাবু! রূপকথার দৈত্যের মত মিণ্টু ঠিক সময়েই হাজির হয়, একটুও ভুল হয় না।

কি হয়েছে তো বলিনি আমি? মীরা হাসিমুখে তাকায় রবীনের দিকে।

মীরার কাঁধের থেকে হাতটা সরিয়ে নিলে রবীন।

মিণ্টু!

অ্যা।

তুমি খেলছিলে না?

হ্যাঁ বাবু।

খেলা হয়ে গেল? আকস্মিক এই স্বল্পক্ষণ স্থায়ী খেলাটা বন্ধ করার কারণ খুঁজে পায় না রবীন?

আর কি করে খেলব? মিণ্টু তাকাল বাবুর দিকে।

কেন বল তো কি হয়েছে?

ঘোড়াটার অসুখ করেছে?

ঘোড়ার অসুখ করেছে?

হ্যাঁ, তুমি যে আমায় কাঠের ঘোড়াটা দিয়েছিলে, সেইটার।

কি হল? ঘোড়া সম্বন্ধে রবীনের ধারণা পাল্টে গেল, এমন অভাবনীয় ভাবে যে জীবের শরীর খারাপ হয় তার সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

ওই তো বললাম, অসুখ।

কি অসুখ বল তো? শিষ্টাচার প্রণোদিত হয়েই প্রশ্নটা করল রবীন। রোগ সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ, ঘোড়ার রোগের তো কথাই নেই।

তা আমি কি করে বলব, তুমি জান—

আমি?

হ্যাঁ, তোমার ব্যাগে তো অনেক ওষুধ আছে। রবীনের ব্যাগে যে ওষুধ থাকে সে সংবাদ মিণ্টু রাখে, আর যে সঙ্গে অত ওষুধ রাখে—রোগ সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু জ্ঞান তার থাকা উচিত বৈকি!

কি হয়েছে বল। জ্ঞানপক্ক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ভঙ্গীটা নকল করল রবীন।

গায়ের রং উঠে গেছে ঘোড়াটার। দুঃখের সঙ্গে বললে মিণ্টু, রাণীর মা গায়ে জল ঢেলে দিয়েছিল কিনা তাই। কথাটা আর শেষ করলে না সে।

তাই তো। রবীন চিন্তিত হল, ঘোড়ার রং? আধুনিকাদের রং সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা সর্বজনবিদিত, সুতরাং ঘোড়াই বা দোষ করলে কি?

আমি কিন্তু ঠিক করেছি। বললে মিণ্টু।

করেছ?

হ্যাঁ।

পরে ঘোড়ার ওপর প্রাথমিক চিকিৎস'র নমুনাটা দেখেছিল রবীন—মায়ের সিঁদুর তেলে গুলে একটা নতুন ঘোড়ার সৃষ্টি করেছিল মিণ্টু।

টপ ল্যাটরিনের দরজাটা সজোরে বন্ধ করলেন নানুভাই দেশাই। ডায়াবিটিসে ভুগছেন তিনি। আহাম্মক ডাক্তারগুলো শুধু খাওয়া বন্ধ করতে বলে। মিঠাই খাবে না, পাকোড়া মানা, আলু খাওয়া চলবে না, ভাত খাবে না—তবে খাবে কি? সুতরাং নানুভাই দেশাই ঘন ঘন ল্যাটরিনে যান। নানুভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ধীরেন ভড় রবীনের কাছে এগিয়ে এল। ফিল্ম লাইনে থেকে রাজনীতিজ্ঞান ধীরেন ভড়ের তীক্ষ্ণ হয়েছে।

যাক শেষ পর্যন্ত কথাটা রাখল তা হলে। অন্তরঙ্গভাবে ফিসফিস করে বললে ধীরেন ভড়।

কি কথা?

রোজই ত কর্তাকে বলি তোমার কথা। মুখে তার আত্মীয়সুলভ একটা ভাব ফুটে উঠল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমাদের মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টে শেল্‌স্‌ ম্যানেজার নেই, রবীনকে অ্যাপয়েণ্ট করুন। একথা প্রায় বলি, জান তো, আমার কথা কর্তা বড় একটা ঠেলতে পারে না।

মনে মনে কৃতজ্ঞ হ'ল রবীন, সত্যি আজকাল এ ধরনের লোক হয় না, পরের জন্যে কে এত করে?

খাওয়াটা পাওনা রইল ভাই। বন্ধুত্বের দাবীটা পেশ করে রাখল সে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ভাল করে খাওয়াতে হবে ধীরেন ভড়কে—ভাবছে রবীন। কিন্তু তার আগে বাসাটা বদলান দরকার। উত্তরপাড়ায় আর থাকা সম্ভব নয়। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট নেবে সে। দক্ষিণ কলকাতার দিকে, উত্তর কলকাতা

তার পছন্দ নয়, মধ্য কলকাতা খুব ঘিঞ্জি, ভাবতেই পুলকিত হল রবীন। এত ভীড়ের মধ্যে থাকতে পারবে না সে, মীরারও কষ্ট হবে। একটা ছোট্ট গাড়ীরও দরকার, মাইনে যখন বাড়ছে, তা ছাড়া ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন গাড়ী রাখতে অসুবিধে হবে না খুব। মিণ্টুকে একটা স্কুলে ভর্তি করতে হবে। লরেটো কেমন? কিম্বা লা মার্টিনিয়ার, না ওখানে খরচ বেশী, ছোটখাট একটা স্কুলে দিলেই চলবে। একটা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ডও রাখতে হবে সেই সঙ্গে। বেশী লোকজনের তার কি দরকার। তবে মীরাকে এবার একটু বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, অনেক কষ্ট করেছে সে। এবার ভাল করে মনের মত করে মীরাকে সাজাতে হবে, কত সুন্দর দেখতে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মনের মত করে সাজাতে পারে নি—রবীনের এ দুঃখটা বরাবরই আছে। হ্যাঁ, রোজ বেড়াতে যাবে সে মীরা মিণ্টুকে নিয়ে। নিজেই গাড়ী চালাবে, ড্রাইভার রাখবার দরকার কি?

স্বপ্নময় রঙীন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবির দিকে তাকিয়ে রইল রবীন সরকার।

টপ ল্যাটরিনের দরজা বন্ধ করে নানুভাই বেরিয়ে এলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে ধীরেন ভড় সরে এল তার নিজের জায়গায়। রবীন কামরাটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে। ওপাশে একটি মেয়ে বসে আছে, মেয়েটার মুখের ভাব অনেকটা পরিচিত বলে মনে হল। মিণ্টু বড় হলে কি ঐ রকমই হবে? তখন তো সেও বুড়ো হয়ে যাবে। মিণ্টুর বিয়ে হবে—ভাবছে রবীন। নিজেই পছন্দ করে করবে কিনা কে জানে, নিজের মেয়ে হলেও আগামী যুগের মানুষের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে নেওয়া উচিত হবে না। মীরা তখন কি রকম দেখতে হয়ে যাবে, আর কি রবীনকে এত ভালবাসবে মীরা? হয় তো মেয়ে আর জামাইয়ের কাছে রবীনের মেজাজ বা অন্য কোন দোষক্রটি দেখিয়ে সমবেদনার দাবী করবে। বুড়ো হলে অনেক সময় মনটা ছোট হয়ে যায়, স্বার্থপরতা আর ছোটখাট খুঁটিনাটি জীবনটাকে যেন সীমাবদ্ধ করে দেয়—না, বুড়ো সে হবে না—মনে মনে স্থির করে ফেলল রবীন সরকার।

নানুভাই এসে পুনর্বার নিজের জায়গায় বসলেন। রবীন সরকারের ওপর অনেক দিনই লক্ষ্য ছিল তাঁর। কর্মচারীদের ওপর বরাবরই নজর থাকে তাঁর, ওদের নিয়েই তাঁর কাজ, ওদের ভালভাবে না চিনলে চলে না। রবীনের কাজের সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল তার নিষ্ঠা—নিজের কাজটি

ঠিক সময়ে করে যেত সে, শত বিপর্যয়েও কর্তব্য করতে ত্রুটি তার হয় নি। দেড় বৎসর চাকরীর মধ্যে একদিন কামাই আছে মাত্র। তা ছাড়া মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের যা কিছু বিক্রী তার মারফৎই হয়েছে, সে সংবাদও নান্নুভাই রাখেন। শুধু তাই নয়, নান্নুভাই মানুষ চেনেন, কাকে দিয়ে কি কাজ আদায় হয় সে অভিজ্ঞতা এত দিনে তাঁর হয়েছে। ধীরেন ভড়ের যোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু দোষও আছে প্রচুর। টাকার ব্যাপারেও একটু হাতটান আছে, তা তিনি লক্ষ্য করেছেন, তা ছাড়া সম্প্রতি সিনেমার মেয়েদের নিয়েও একটু বেশীমাত্রায় মাথামাথি করছে বলে যেন মনে হয়। সুনীল রায়-ও হাসনুর ব্যাপারটাও ধীরেন ভড়ের কারসাজি বলে মনে হয় তাঁর। যে-কোন দিক থেকে একটা জট্ পাকিয়ে দিতে পারলে অনেক সুবিধে। একটা বই নিয়ে অনেক দিন কাটানো চলে, বেশ কিছু টাকাও টানতে পারা যায়। মনে মনে একটা হিসেব করে নিয়েছেন নান্নুভাই। সুনীল রায় আর হাসনুর জন্যে যে খরচটা হল সেটা অন্য দিক দিয়ে পূরণ করে নিতে বেশী দেরী হবে না তাঁর। কথাটা এখন গোপনে রাখতে হবে, ধীরেন ভড়কে জানতে দিলে অন্য এক বিভ্রাটে ফেলতে পারে সে। অপরপক্ষে টাকাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয় টোপ, জল দিলে তবে জল আসবে। রবীনের মাইনে যা বাড়ান হল তাতে কোম্পানীর লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। মনে মনে লাভের ছকটায় চোখ বুলোতে লাগলেন তিনি।

রবীনের উত্তেজনা এখনও কমে নি, এখনও ধীর শান্ত স্বাভাবিক হয় নি তার মনের গতি। কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ছোঁয়াচ লেগেছে, মনটা হঠাৎ যেন হালকা হয়ে গিয়েছে, আনন্দ নয়, তার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নও রয়েছে। ঠিক কি ভাবে কাজ সুরু করবে তার একটা ছক মনে মনে ঠিক করছিল রবীন সরকার। কলকাতাটা চারটে ভাগে ভাগ করে নিতে হবে, প্রত্যেকটার জন্যে দু-জন করে রিপ্রেজেণ্টেটিভ রাখতে হবে, ডাক্তারবাবুদের স্যাম্পেল দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় তা হলে একটা ডায়েরী বা কাগজকাটা প্লাষ্টিকের সুদৃশ্য ছুরি, তাতে লেখা থাকবে, "দেশাই ল্যাবরেটারীর কমভিটোলিন ব্যবহার করুন"। ডাক্তারবাবুদের এ ধরনের দু-একটা জিনিস দিলে তাঁরা মনে রাখেন, লেখবার সময় ঐ ওষুধটার কথাই মনে পড়ে যায়। এথা মনস্তত্ত্বের কথা, অন্য কিছু নয়, দু-একজন

উন্নাসিক ডাক্তার আছেন তাঁরা কোম্পানীর দেওয়া স্যাম্পেল বা অন্য কোন জিনিস গ্রহণ করেন না—তাতে নাকি তাঁদের সম্ভ্রমহানি হয়। সামান্য শিষ্টাচার জ্ঞানও তাঁদের আছে কিনা সন্দেহ--ভাবল রবীন। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তাতে বিভিন্ন কোম্পানীর সঙ্গে ডাক্তারদের একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে, অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে ঘুষ দেওয়া নয় এটা।

ব্রজেশ্বরবাবু ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছিলেন, কানের কাছে নিয়ে যেতে মনে হল, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দু-একবার বাঁ হাতের কব্জীটা ঝাঁকি দিয়ে কানে ঠেকালেন। নাঃ, থেমে গিয়েছে, তাই তখন থেকে কাঁটাটা পৌনে আটটার ঘরে আটকে আছে। অকৃতজ্ঞ ঘড়িটার দিকে বিরক্তভাবে আর একবার চাইলেন।

আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে? রবীনের দিকে তাকিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আটটা দশ। উত্তর দিলে রবীন।

মাত্র আটটা দশ? আমার মনে হয়েছিল ন'টা—ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

শীতের রাত কিনা। উত্তর দিলে রবীন, অন্য সময় হলে ঐ রকম চেহারার একজন লোকের এ ধরনের অবান্তর প্রশ্নে রবীন নিশ্চয়ই খুশী হ'ত না, কিন্তু হঠাৎ সে যেন উদার হয়ে গিয়েছে, এখন তার কাছে সকলেই ভাল, মনে কোন গ্লানি নেই তার—নেহাৎ নান্নুভাই উপস্থিত আছেন তাই, তা না হলে প্রাণ খুলে আড্ডা জমিয়ে তুলত।

তা ঠিক, শীতের রাত আন্দাজ করা শক্ত, আর যা শীত পড়েছে। বললেন ব্রজেশ্বরবাবু।

ছোকরাটিকে বেশ ভাল লেগেছিল ব্রজেশ্বরবাবুর, বেশ সৌম্যদর্শন, চিবুকের গঠনটা দেখে মনে হয় ভেতরে বেশ দৃঢ়তা আছে, তার পাশের মেয়েটা আব এই ছোকরাটির মধ্যে এ বিষয়ে মিল আছে বলে মনে হল তাঁব।

রবীনও ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে তাকাল, এত শীত, অথচ ভদ্রলোকের গায়ে গরম কাপড়জামা তেমন নেই! একটা বাদামী রঙের পাঞ্জাবি আর কাঁধের ওপর ফেলা একটা আলোয়ান—এ জিনিসটা কিছুক্ষণ আগেই সে লক্ষ্য করেছিল, এইবার প্রশ্ন করার সুযোগ পেল, বললে, আপনার গায়ে গরম

জামা বেশী নেই ? শীত করছে না আপনার ? আত্মীয়তার প্রশ্ন করতে বাধল না, তার কাছে এখন সকলেই আত্মীয়।

হাসলেন ব্রজেশ্বরবাবু, কি জানেন! ঈশ্বরদত্ত জামা রয়েছে কিনা। বাঁ হাতে চিমটি কেটে মেদবহুলতা দেখালেন ব্রজেশ্বরবাবু। বললেন, মানে চর্বির আধিক্যে ঠাণ্ডা লাগে কম।

এষার হাসি পেল। এতক্ষণ ধরে সে ওদের কথোপকথন শুনছিল। যে ভদ্রলোক কামরায় ঢুকলেন, এতক্ষণে ভাল করে তাকে দেখে নিয়েছে এষা। ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ লম্বা ছিপছিপে, ফিগারটা সুন্দর, সুনীলদার চেহারাও ভাল, কিন্তু এত পুরুষোচিত নয়, ম্যানলি। এর চেহারার মধ্যে স্পষ্ট পৌরুষত্বের বিকাশ রয়েছে। সুনীলদার চেহারায় সেটার খুব অভাব। সুনীলদাকে শীতপ্রধান দেশের দুর্মূল্য একটি পাখীর মত সাজিয়ে রাখলে মানায় ভাল। কিন্তু হেফাজৎ করতে হয় প্রচুর, বদলে তার সুন্দর রূপটা দেখেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে হয়। এ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সে-কথা খাটে না, একে সুন্দর পরিবেশে রাখলেও যেমন মানাবে ধূলিধূসর হয়ে কর্মক্ষেত্রেও ঠিক ততখানিই মানাবে। কথাটা ভেবে মনে মনে হাসল এষা, তার এই অভিমত যদি সঞ্জীব শুনতে পেত ? মনে পড়ে গেল একদিনের কথা। দুজনে দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্যে এসপ্লানেডের কাছে। পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক গেলেন, এষা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল তাকে। বললে, বেশ চেহারা, নয় ?

হুঁ। বললে সঞ্জীব—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ভাল নয় ? আবার জিজ্ঞেস করলে এষা।

হ্যাঁ, এই তো বললাম ভাল। স্বরটা একটু রুক্ষ।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, বললে এষা, অন্য কোন লোকের চেহারার প্রশংসা করলে তুমি রেগে যাও।

মোটেই নয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সঞ্জীব। সুন্দর চেহারা সব মানুষই পছন্দ করে। আমি নিজে কন্দর্প নই, আর আমার চেয়ে নিশ্চয়ই সুন্দর আছে, সেকথা বললে রেগে যাব কেন ?

বাস এসে পড়ল, দুজনে বাসে করে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে নামল।

গাড়ীতে মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছ? বাস থেকে নেমে বললে সঞ্জীব, ঠিক তোমার সামনের লেডিস সীটে বসেছিল।

ও, হ্যাঁ—সাদা জর্জেট পরে?

হ্যাঁ, তার সঙ্গে ঘোর সবুজ রঙের ব্লাউজ, অদ্ভুত ম্যাচ করেছে, মুখটাও বেশ সুন্দর, নয়?

হ্যাঁ। শুষ্ক উত্তর।

আর গড়নটাও বেশ লম্বা ছিপছিপে—না?

হ্যাঁ, আমি চলি।

সে কি, বইটা কিনবে না?

না, পরে দেখা যাবে। এষা ট্রামে উঠে পড়ল, একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে সঞ্জীব হাসছে।

তার পরদিনই অবশ্য ব্যাপারটা মিটে গিয়েছিল। সঞ্জীবের চেয়ে এষা বেশী লজ্জিত হয়েছিল। তার চেয়ে অন্য কোন মেয়ে সঞ্জীবের চোখে সুন্দর লাগবে এষা তা সহ্য করতে পারে না, এই একটা জায়গায় তার শিক্ষা আর সংযম-বোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। আদিম মানবীর মত আঁকড়ে রাখতে চায় তার প্রিয়তমকে।

রবীনের দিকে আবার তাকাল এষা, হ্যাঁ, সঞ্জীব এর চেয়ে একটু বেঁটে হতে পারে, রংটাও এত ফরসা নয়, কিন্তু সঞ্জীবের চুলগুলো কি সুন্দর ঢেউ-খেলানো নরম, এ ভদ্রলোকের কপালের দু-পাশে চুল উঠে গেছে, কিছুদিন পরে বিপদ অনিবার্য, মানে টাক পড়তে তার বেশী দেরী নেই, কথাটা চিন্তা করে মনে মনে হাসল এষা। তা ছাড়া ধোপ-দুরস্ত কাপড়জামা পরার খুব পক্ষপাতী নয় এষা, কেমন যেন একটা বাবু বাবু ভাব মনে হয়, তার চেয়ে সঞ্জীবের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এলোমেলো ভাবটা অনেক ভাল লাগতো তার। সঞ্জীব কারোর কাছেই ছোট নয়। প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো অনেককে ভাল লাগতে পারে কিন্তু ওটাকে দৃষ্টি-বিভ্রম বলা চলে। সঞ্জীবের কাছে কেউ নয়—কথাটা খুব দৃঢ়ভাবে নিজের কাছে কয়েকবার মনে মনে উচ্চারণ করল সে, কিন্তু মনটা উদাস হয়ে গেল এষার, নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল সেই সঙ্গে। এটা তার প্রায়ই হয়—বিশেষতঃ যখন সঞ্জীবের অনুপস্থিতিতে তার কথা চিন্তা করে তখন তো হয়ই। এতক্ষণ একভাবে বসে থাকতে ভাল

লাগছে না এষার—পরের স্টেশনে একটু ঘুরে আসবে, অন্ততঃ প্ল্যাটফর্মে একটু পায়চারী করবে সে, ভাবল এষা—কোমরটা ধরে গেছে যেন। মালতীদি সঙ্গে থাকলে বেশ হত—দুজনে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে ওরা শুধু হেসে আর গল্প করে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল এষার, খুব দুষ্টু ছিল এষা ছোটবেলায়। মালতীকে বেশ বেগ পেতে হত তাকে সামলাতে। স্নান করিয়ে খাইয়ে ফ্রক পরিয়ে স্কুলে পাঠাত মালতী, কিন্তু সে এক পর্ব।

শৈশবের স্মৃতির দুয়ারটা খুলে গেল। চোখের সামনে দৃশ্যগুলো সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠল এবার।

—দিঁদিঁ! অনুনাসিক সুরে এষা বলছে, আদর পাওয়ার জন্য এ সুরটা সে ব্যবহার করে থাকে।

কি? উত্তর দিলে মালতী।

আমি নিজে চান করব আজ।

না, আমি করিয়ে দিচ্ছি।

তুই বড্ড চোখে সাবান ঢুকিয়ে দিস।

তুই চোখ খুলিস কেন তাই তো সাবান লাগে। চোখ বন্ধ করে থাকবি, মোটে চোখ জ্বালা করবে না। উপদেশ দিলে মালতী।

দিঁদিঁ। সেই সুর।

আবার কি হল?

আমি নিচে চান করব।

কেন?

নিচে চৌবাচ্চায় ডুবে চান করব।

বাদরামি করিস না এষা, আমার আজ সকাল সকাল কলেজ।

না, আমি চান করব না। হঠাৎ মত বদলায় এষা।

এস লক্ষ্মী মেয়ে, কাল নিচে চান করবে, নিজে সাবান মাখবে কেমন?

তোর সেই বোনার কাঠি দুটো দিবি? কিছু চাইবার মত সুযোগ পেয়েছে এষা।

আচ্ছা দোব, আগে চান কর।

আজকে তোকে খাইয়ে দিতে হবে দিদি।

কেন?

আহা, হাত কেটে গেছে জান না? এত বড় খবরটা মালতী রাখে না, আশ্চর্য!

কৈ দেখি! দেখবার চেষ্টা করে মালতী, খালি চোখে দেখা যায় না, আতস কাচের দরকার হয়, হেসে ফেলল মালতী।

হাসলি যে? থাক তোকে চুল মোছাতে হবে না। মাথা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে এষা।

আয় শীগগির—চুল বেয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়ছে।

পড়ুক, তোকে দিতে হবে না। এষার কি রাগ নেই? অত স্পষ্ট কাটার দাগটা রয়েছে অথচ।

শীগগির আয়, বাবাকে বলে দেব তা না হলে।

দিঁদিঁ!

কি?

ও রকম করে চুল আঁচড়াস না। অনুরোধ করল এষা।

তবে কি রকম করে আঁচড়াব?

দু-পাশটা তুলে ওপরে একটা 'বো' করে দে—

হুঁ, আবার স্টাইল হচ্ছে—

থাক, তোকে দিতে হবে না। মাথাটা সরিয়ে নেয় এষা।

আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি। ফরমাশ মত চুল বেঁধে দেওয়া হল।

এবারে খাওয়ার পালা।

দিঁদিঁ!

কি?

মাছ খাব না। আবার মাথা ঝাঁকি দিল এষা।

না তা খাবে কেন? চোখটা যখন নষ্ট হবে তখন বুঝবে। মালতীর মনে আছে মা তাকে ঐ কথা বলেই মাছ খাওয়াতেন।

কি রকম আঁশটে গন্ধ লাগে।

মাছ খেলে গায়ে জোর হয়, জানিস তোদের স্কুলের মেমরা খুব মাছ খায়, সেই জন্যেই তো অত ফরসা।

সত্যি?

হ্যাঁ রে সত্যি।

তা হলে কেষ্ট তো মাছ খায়, ও কালো কেন ?

কেষ্ট বাড়ীর চাকর।

বাজে তর্ক করিস না—নে খেয়ে নে, আমার আজ নির্ঘাৎ দেরী হবে।

মাঝে মাঝে অবশ্য এত সহজে মেটে না। বাবার কাছেও নালিশ করতে হয়। স্থরেনবাবু তাঁর ঘরটিতে বই আর খাতার মধ্যে ডুবে থাকেন, সেখানেও উৎপাত।

বাবা! মালতী সেদিন ঢুকল ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে।

কেন মা ? বই থেকে মুখ তুলে বললেন স্থরেনবাবু।

আমি আর পারছি না, তুমি একটা ব্যবস্থা কর।

কিসের ?

তোমার ছোট মেয়ের।

না বাবা। সঙ্গে সঙ্গে আসামী উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানায়।

কি করেছ—এষা মা ? ছোট মেয়ের দিকে বাবা তাকান।

কিছু নয় বাবা।

তুই জামা পরছিস না কেন? জান বাবা সর্দিতে ফোঁস ফোঁস করছে একেবারে, আর জামা পরবে না কিছুতেই। জোরাল নালিশ করল মালতী।

এষা মা!

উঁ।

এদিকে এস। বাবার কোলের কাছে দাঁড়ায় এষা। একটা হাত দিয়ে টেনে নিলেন স্থরেনবাবু এষাকে। বললেন, লক্ষ্মী মা আমার, জামা পরে নাও।

এষা নিরুত্তর।—দিদির কথা শুনতে হয়। আবার বললেন বাবা।

দিদি আমায় পশম দেয় নি কেন ? এবার পাল্টা নালিশ করল এষা।

পশম ?

হ্যাঁ।

কি হবে ?

বুনব, দিদি যেমন তোমায় 'স্লিপ-ওভার' বুনে দিয়েছে আমিও ওই রকম করব। দিদির চেয়ে সে কোন অংশেই কম নয়।

ওঃ, তা বেশ তো, আগে দিদির কাছে শিখে নাও, তবে তো—

আমি জানি ; আমি তো পুতুলের একটা করেছি।

তাই নাকি ? বেশ বেশ, তা হলে তো পশম দিতেই হয়, কি মালতী মা ?

হ্যাঁ। হাসল মালতী—আয় জামা পরবি আয়।

সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সুরেনবাবু মেয়েদের দিকে।

কত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনেই না মানুষ নিজেকে বেঁধে রাখে। দার্শনিকরা নাকি একে মায়া বলেন। তা হতে পারে কিন্তু এ মায়া যেন চিরদিন তাকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রাখে। বাবা, মালতীদি, সঞ্জীব তিন জনেই তার কাছে অপরিহার্য। মাঠের প্রান্তে ঐ প্রকাণ্ড বটগাছের মত সুদৃঢ় শিকড় আর ডালপালা নিয়ে তার মনে অটল হয়ে গেঁথে রয়েছে, তাকে মায়া বলে উড়িয়ে দেবে নাকি ?

এষার মনটা ভরে উঠল। ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগটা থেকে ততোধিক ছোট্ট একটা রুমাল বার করে মুখ মুছলে এষা। বিশ্রী কালি পড়েছে, ধোঁয়া আর ধুলোয় মুখটা কালো হয়ে গেছে নিশ্চয়। এই জিনিসটা ভীষণ অপছন্দ করে সে, আর ট্রেনে যাতায়াত করলে এটা এড়ান সম্ভব না। যদি একবার মুখটা সাবান দিয়ে নিতে পারত—কিন্তু তা আর কি করে হয় ? একগাদা লোকের মধ্যে বাথরুমের ভেতর ঢুকতে সঙ্কোচ হচ্ছে এষার। পরের স্টেশনে দেখা যাবে, ভাবল সে। অকস্মাৎ সশব্দে পাশ দিয়ে একটা ট্রেন চকিতে চলে গেল, মুখ বাড়িয়ে এষা তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

ব্রজেশ্বরবাবুও তাকিয়ে আছেন রবীনের দিকে। এ ছেলেটিও দেখতে মন্দ নয়। ডাক্তার নৃপেশ মুখুজ্জের ভাই কি রকম দেখতে কে জানে ? সুনীল রায়কে দেখে কিছুক্ষণ আগে ওই কথাই মনে পড়েছিল তাঁর। বস্তুতঃ, সুন্দর চেহারার ছেলে দেখলেই মেয়ের বিয়ের কথাই মনে মনে পড়ে যায় ব্রজেশ্বরবাবুর। বুড়ী মানে তাঁর মেয়ে কল্যাণী যখন জন্মেছিল তখন তাঁকে অনেকে রহস্য করে বলতেন, 'মেয়ে হয়েছে টাকা জমাও, জামাই আনতে হবে। হাসতেন ব্রজেশ্বরবাবু। অত সামান্য কথাটার পিছনে যে এত বড় সত্য লুকিয়ে আছে তা এখন বুঝতে পারছেন তিনি। সামান্য একটা তামাশার কথা এতদিন পরে যে এত অদ্ভুতভাবে বাস্তবে পরিণত হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। হঠাৎ তাঁর আরামবাগের কথা মনে পড়ল, মাধবীকে ভাল

ভাবে চিনতে পেরেছেন তিনি। তখনও পুলিসের চাকরিতে ঢোকেন নি ব্রজেশ্বরবাবু। সে সময়ে দেশের সেবায় মন দিয়েছিলেন তিনি। স্বদেশী যুগের কথা, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহের বন্যায় দেশ ভেসে গিয়েছে সেই সময়। মনে পড়ল জনসেবায় আর পল্লীসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। মড়া পোড়ানো, দুর্গতের সেবা, লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি নানাপ্রকার জনকল্যাণকর কাজ নিয়ে মেতেছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁদের বাড়ীর রাঁধুনির কলেরা হয়, তিনি এবং দলের সেচ্ছাসেবকরা তার পরিচর্যা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সদর হাসপাতালে সে মারা গেল। তার সেই নোংরা শুঁটকে মেয়েটা যে এতদিনে মাধবীতে পরিণত হয়েছে তা তিনি কি করে বুঝবেন। শুধু কি তাই, জীবনে তিনি এত বেশী 'হিরো ওয়ারসিপ' পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। বিয়ের পর যেদিন সুরমা প্রথম গলায় কাপড় দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন সেদিনও তাঁর মনোভাব অনেকটা এই রকমই হয়েছিল। পুলিসের চাকরি ব্যপদেশে অনেকেই তাঁকে অতিভক্তি প্রদর্শন করেছে বটে তবে প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী সেটা ওই শ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকেই বরাবর পেয়েছেন এবং লক্ষণটাও সব সময়েই মিলেছে। উপঢৌকন, নানা জাতীয় ভেট, ওপরওয়ালার চাপ এবং তৎসঙ্গে এই অতিভক্তি তাঁর চাকরি জীবনে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সুতরাং মাধবী নাম্নী যুবতীটি যখন বিনা কারণে শুধুমাত্র পূর্ব পরিচয়ের জেরে তাঁর পায়ে অকুণ্ঠ ভক্তি এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিনয়াবনত চিত্তে অর্পণ করল তখন তিনি যে হতচকিত হয়েছিলেন একথা সত্যি। এতক্ষণে কিন্তু সেই পরম ক্ষণটুকু সম্বন্ধে তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন। বেশ আত্মস্ফীত হয়ে পড়েছেন তিনি। কেশবিরল মাথাটায় একবার খুব সুলভ ভঙ্গীতে হাত বুলিয়ে নিলেন তিনি। মনটা বেশ হালকা ঠেকছে, যেন একটা নূতন ধরনের প্রেরণা পেলেন—ক্ষিধের কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছেন এতক্ষণ। প্রেরণাই প্রতিভা বিকাশের সহায়। কালিদাসের মত কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত ভক্ত, মাদাম কুরীর মত বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক নেতারা সকলেরই প্রেরণার প্রয়োজন হয়েছে এবং সেই কারণেই প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছে একথা অস্বীকার করা চলে না, সুতরাং ব্রজেশ্বরবাবুর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হবে এ আর বিচিত্র কি? কিন্তু খুব ক্ষণস্থায়ী হল তাঁর

চাঞ্চল্য। টিফিনকেরিয়ারটা ট্রেনের আচমকা ঝাঁকুনিতে কাত হয়ে পড়ে গেল, শশব্যস্ত হয়ে তুললেন সেটাকে, হাত দিয়ে গায়ের ধুলো মুছিয়ে দিলেন—যেন অতি আদরের সন্তান পড়ে গিয়েছে তাঁর। সত্যিই এদিক দিয়ে ব্রজেশ্বর-বাবুর সহ্যশক্তি খুব কম। কল্যাণীর যদি কখনও অসুখ হত তা হলে তিনি রাত্রে জেগে বসে থাকতেন, একবার কাসির শব্দ পেলেই উঠে বসে সুরমাকে বলতেন, শুনছ সুরমা?

উঃ! নিদ্রাজড়িত স্বরে উত্তর দিতেন সুরমা।

খুকু কাসছে না? ব্রজেশ্বরবাবুর স্বরে উৎকণ্ঠা।

তা কাসলেই বা। বিরক্ত হতেন সুরমা, বলতেন, তুমি ঘুমোও তো।

গায়ে হাত দিয়ে দেখতো, গাটা গরম কিনা।

না গরম নয়, শুধু শুধু এমন কর তুমি। বিরক্ত হয়ে উত্তর দিতেন সুরমা দেবী।

তোমার মত নিশ্চিন্ত হয়ে নাক ডাকালেই হয়েছে আর কি!

তবে জেগে বসে থাক তোমার সোহাগের মেয়েকে নিয়ে, পাশ ফিরে শুয়ে পড়তেন সুরমা।

গরমের দিনে এক রাত্রে পাখা খুলতেই খুট করে আওয়াজ হল একটা, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেশ্বরবাবু বিচলিত হয়ে উঠলেন।

শুনলে তো। বললেন তিনি স্ত্রীকে।

কি

ওই যে সুইচ টিপতেই খুট করে পাখাতে একটা আওয়াজ হল।

তাতে কি হয়েছে?

যদি খুলে পড়ে যায়—খুকু তো ঠিক পাখার তলায় শোয়।

তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি? আশ্চর্য হলেন সুরমা।

কেন খুলে পড়তে পারে না? তুমি জান? এই পরশু আমাদের আপিসে একটা পাখা খুলে পড়ে গেল।

বাজে বকো না বাপু, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তোমার মাথায় আসে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরমা ঘুমিয়ে পড়লেন কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। নানা চিন্তা ভিড় করে তাঁর মাথায় আসতে শুরু করল। যদি ওই ভারী পাখাটা খুকুর ছোট্ট বুকের ওপর পড়ে যায়,

তাহলে ? সেই রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্যটা বারবার কল্পনা করে উত্তেজিত হয়ে উঠে বিছানায় বসতে লাগলেন তিনি।

শুনছ সুরমা ! ব্রজেশ্বরবাবু আর থাকতে পারেন না।

কি ?

তুমি ওকে সরিয়ে শুইয়ে দাও, তা না হলে আমি ঘুমুতে পারছি না। কাতরস্বরে বললেন তিনি।

এত রাত্রেও দুর্ভাবনায় ঘুমুতে পারছে না ? সমবেদনায় মনটা ভরে গেল সুরমার। একটু দূরে সরিয়ে দিলেন খুকুকে।

নাও, এবার হবে তো ? কোন ব্যঙ্গ করলেন না তিনি, বিরক্তও হলেন না।

হ্যাঁ হয়েছে। শান্ত হলেন ব্রজেশ্বরবাবু, নির্বিঘ্নে রাতটা কেটে গেল।

সেই খুকু বড় হয়েছে তাঁর আদরের বুড়ী—কল্যাণী। কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে, কত দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত হয়েছেন ব্রজেশ্বরবাবু তার জন্যে। শুধু কি তাই ? স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গিয়েছে ওই এক-রত্তি মেয়েটার জন্য। ব্রজেশ্বরবাবু একটা জিনিস সহ্য করতে পারতেন না—সেটা হল তাঁর মেয়ের গায়ে হাত তোলা।

আর একদিনের কথা তখন কল্যাণী ছোট। নিচে বসে আছেন ব্রজেশ্বরবাবু, হঠাৎ ওপরে মেয়ের চীৎকার শুনে উঠে এলেন।

কাঁদছে কেন ? কি হয়েছে ? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি স্ত্রীকে।

আমি মেরেছি। নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দেন সুরমা।

মেরেছ ?

হ্যাঁ।

কেন ?

বাঁদরামি করলেই মারব।

বাঁদরামিটা কি ?

কাঁসার গ্লাসটা ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিয়েছে।

ততক্ষণে কল্যাণীর কান্না কিন্তু থেমেছে, তাকে কেন্দ্র করে কি ঘটনা ঘটেছে তা জানতে উৎসুক হল সে।

কেন ? শুধু শুধু ওমনি ফেলে দিলে ?

তোমার মেয়ের রাগ হয়েছিল তাই।

দেখ সুরমা, আমি তোমাকে অনেকবার বারণ করেছি ওর গায়ে হাত তুলবে না।

তার মানে ?

তার মানে শুধু শুধু ওকে মারবে না।

অন্যায় করলে শাসন করব না বলতে চাও ?

তা বলছি না, কিন্তু এ রকম নির্দয় ভাবে মারার কোন দরকার নেই তো।

নির্দয় ভাবে ?

নিশ্চয়, গাল লাল হয়ে দাগ পড়েছে।

বেশ হয়েছে, অন্যায় করলেই মারব।

না, মারবে না। মতটা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে মেয়েকে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

সেদিন অনেক সাধ্য-সাধনার পর ব্রজেশ্বরবাবু ভাত খেয়েছিলেন। সুরমারও খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু মানুষটার অন্তরের পরিচয় এতদিনে তিনি পেয়েছেন, অদ্ভুত কোমল মনটা।

ভাবছেন ব্রজেশ্বরবাবু, এই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে কি তাঁর কথা আর মনে রাখবে ? সেই সব দিনের কথা, ছোট ছোট ঘটনার বৈচিত্র্য কি জায়গা পাবে তার মধুর স্বপ্নভরা নূতন জীবনের মধ্যে ? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্রজেশ্বরবাবু— হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর নিজের কথা।

সেবার পুজোর সময় আরামবাগ থেকে তাঁর মা তাঁকে বাড়ী যাবার জন্ম লিখেছিলেন কিন্তু তিনি যান নি, যেতে পারেন নি, সদ্যবিবাহিতা বধূর ঢলঢলে মুখ এবং সান্নিধ্য ছেড়ে আরামবাগে মায়ের তৈরি নারকেল নাড়ু খেতে তাঁর মন ওঠে না।

ক্রমাগত চক্রাকারে তাই হয়ে চলেছে। নাগরদোলাটা অবিরত ঘুরে যাচ্ছে। বৃত্তের ব্যাসের বিভিন্ন জায়গায় থেকে ছবিগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে বার বার। পরের বেলায় সমালোচনা করা হচ্ছে বটে কিন্তু নিজের বেলায় নয়, আবার যদি সেই দিনটা ফিরে আসে তা হলে মায়ের কাছে নিশ্চয় ফিরে যাবেন ব্রজেশ্বরবাবু। আর ভুল হবে না। হঠাৎ তাঁর মনে এ কথাটা উঠল কেন ? বুঝতে পারলেন তিনি। কন্যাকে ছাড়বার ভয়ে এ প্রশ্নটা জেগেছে তাঁর মনে। যদি তাঁর নিজের দোষ স্খালন করে, প্রায়শ্চিত্ত করেও মেয়ের

ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না হন, মনে মনে তাই এ কথাটা ভাবছিলেন ব্রজেশ্বরবাবু। হাসলেন তিনি, কারণ বৃত্তটা সমান ভাবেই ঘুরে চলেছে যে—সেটাকে থামাবার তাঁর শক্তি কোথায়?

ডাঃ নৃপেশ মুখার্জীর ছোট ভাই পরেশ মুখার্জী। বড় ডাক্তার, ছোট ইঞ্জিনীয়ার। গত দু-বছর হল পরেশ শিবপুর কলেজ থেকে পাস করেছে। বাবা অনেকদিন আগেই গেছেন, তার পর গেলেন মা। দু-ভাই তখন বেশ বড় হয়েছে, পরেশ তখনও ছাত্র, নৃপেশ সবেমাত্র পাস করেছে। পরেশের পেশা হল রাজনীতি—কিন্তু সবচেয়ে বড় নেশা হল তার দাদা। দাদাকে ছেড়ে কোন জিনিসই কল্পনা করতে পারে না পরেশ। তার এই স্বাধীনতা, তার রাজনৈতিক মতবাদ, শিক্ষা, সবই দাদার পাশাপাশি থেকে সম্ভব হয়েছে। বিপক্ষ দলে দাদা থাকলেও তার জয়েও দাদা দুঃখ পায় না বরঞ্চ যেন খুশীই হয়। পরেশের জীবনে একটা বড় স্থান অধিকার করে রেখেছে নৃপেশ, সেটা পরেশ নিজেই অনুভব করে।

মাসিমাকে নিয়ে আসার ইচ্ছে তার ছিল না, তবে দুটো কারণে সে রাজী হয়েছে, প্রথম সে না এলে দাদাকে আসতে হত, তাতে দাদার ক্ষতি হত প্রচুর, সম্প্রতি যে কাজটা হাতে নিয়েছে নৃপেশ এবং যে ভাবে পরিশ্রম করছে তাতে দাদার জন্য পরেশ চিন্তিত হয়েছে। এমন খেয়ালী লোক দেখে নি পরেশ—দিনের পর দিন দাদাকে যদি চা আর সিগারেট সরবরাহ করা যায় আর তার কাজ নিয়ে থাকতে দেওয়া হয় তাহলেই হল। খাওয়া বা বিশ্রাম করার কোন দরকারই করে না দাদার। অপর একটা কারণ হল তার পার্টির কাজ। যুক্তপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে তাদের কাজটা কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেটা দেখা দরকার। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হল দাদা। দাদাকে ভয় সবচেয়ে তার খাম-খেয়ালীর জন্যে। সেবার যখন ওষুধের কারখানা খুলল, তখন সেই বিরাট আয়োজনের কথা মনে পড়ল পরেশের, উল্টোডাঙার কাছে একটা বড় জায়গা নিয়ে শেড করা হল। জার্মানী, ইউ. কে. থেকে নানা রকম যন্ত্রপাতি আমদানী করা হল। অদ্ভুত আকৃতির যন্ত্র সব। কোনটা পাতা থেকে রস নিষ্কাশনের জন্য, কোনটা পাউডার করার জন্য, কোনটা বা ট্যাবলেট তৈরীর জন্য। সেই সঙ্গে তৈরী হল একটা ল্যাবরেটারী।

শক্তিশালী মাইক্রোসকোপ থেকে ইনকিউবেটার পর্যন্ত, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। সে নিজেও কিছু কিছু সাহায্য করছিল। যন্ত্রপাতি বসাবার ব্যাপারে। পরেশের মনে আছে, নৃপেশ যেন উন্মত্তের মত কাজ নিয়ে মেতে গিয়েছিল, পর পর কয়েকদিন বাড়ীই ফিরল না, সে-দিন পরেশ দাদাকে বাড়ীতে আনতে গিয়ে দেখে স্তূপাকার গাছের পাতা নিয়ে কি যেন করছে সে—পরেশ ডাকলে—

—দাদা—

—এই যে পরেশ এসেছ ?

– হ্যাঁ, তুমি বাড়ী যাও নি কেন ? কৈফিয়ৎ দাবী করল পরেশ।

—কি করে যাই বল এসব ফেলে ?

—খেলে কি, চা আর সিগারেট ?

—দুধ খেয়েছি, হাসল নৃপেশ।

—বল কি, দুধ খেয়েছ, কবে বলত ?

—এই তো—মুশকিলে ফেললে—ইয়ে বোধ হয় কাল—

—চল, বাড়ী চল—আদেশের স্বরে বলে পরেশ।

—বাড়ী ?

—হ্যাঁ।

—অনেক কাজ বাকী রয়েছে পরেশ, ভ্যাটগুলো বসান হয়নি, ওদিকে ফায়ার ব্রিক্সের অভাবে ফারনেসটা সবটা হয়ে উঠছে না—অজানা দেশী গাছ-গাছড়া থেকে ততোধিক অজানা উপায়ে একটিভ প্রিন্সিপিলগুলো বার করতে হবে, ল্যাবরেটারির কাজ ঢিমে-তালে চলছে এ রকম অবস্থায় কি করে যাই বল।

—তা হক চল, একদিন বিশ্রাম করলে আরও কাজে মন দিতে পারবে, কি হাসছ যে ?

—ভাবছি তুমি ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ডাক্তারী করছ, আর আমি যদি ডাক্তার হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং করি—

—ডাক্তারদের কিন্তু একটা সুবিধে আছে দাদা—

—কি বল তো ?

—ডাক্তারী মতটা তাদের নিজেদের উপর প্রযোজ্য নয়, সেটা রোগীদের জন্য। নাও উঠ।

নৃপেশ ভাইয়ের কথা ঠেলতে পারে নি, বাড়ীতে এসে এক রাত্রি বিশ্রাম করেছিল।

কিন্তু অত পরিশ্রম আর অর্থব্যয়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল নৃপেশ— হঠাৎ সেটা ছেড়ে দিতেও বাধল না তার।

পরেশ, কারখানাটা ছেড়ে দিচ্ছি—একদিন নির্লিপ্ত গলায় বললে নৃপেশ।

—সে কি দাদা—কেন ?

—প্রথমতঃ লোকসান হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ এ ধ'নের ওষুধ ডাক্তারবাবুদের কাছে বিশেষ আদর পাচ্ছে না, কবিরাজী বলে নাক সিটকাচ্ছেন।

—সেইজন্য ছেড়ে দেবে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু দাদা অত পরিশ্রম আর অর্থ ব্যয় বিফলে যাবে ?

—বিফল কোথায় পরেশ ? অভিজ্ঞতার মূল্য দেবে না ? মাঝে মাঝে দাদার ওপর বিরক্ত হয় পরেশ—সম্প্রতি তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দাদা যেন মেতে উঠেছে। মালদহ থেকে মাসিমাকে আনিয়ে তার ওপর দস্তুরমত চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এটা তার ভাল লাগছে না ; কারণ বিয়ের কথায় তার রীতিমত ভয় করে। বিয়ে করে লোভনীয় সরকারী স্থায়ী একটা চাকরি নিয়ে দিনের পর দিন বৈচিত্র্য-হীন জীবন কাটাতে সে খুব উৎসুক নয়। সংসার, স্ত্রী, সন্তান এবং সমাজ এইগুলোই বার বার তাকে নিয়ে টেবিল-টেনিসের বলের মত এক হাত থেকে অপর হাতে বার বার সজোর আঘাতে তাড়িত করবে, এটা সে জানে। গতিহীনতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকবে তার জীবনের ওপর। জাতীয় জীবনে তার দেওয়ার মত কিছুই থাকবে না। অনড় অচল হয়ে থাকবে জগন্নাথের রথের মত। দাদাকে অবশ্য বোঝাবার সে চেষ্টা করেছে কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। পরেশ সেইজন্য বিরক্ত হয়েছে দাদার ওপর। এত ব্যস্ত হওয়ারই বা প্রয়োজন কি ? বিয়ে করে বংশবৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই তার, নিজে তো বেশ নির্ঝঞ্ঝাটের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করে যাচ্ছে, এ নিয়ে অবশ্য কয়েকবার ভায়ে-ভায়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে—কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি।

ইতিমধ্যে মেয়ে দেখাও হয়ে গিয়েছে এবং আরও আশ্চর্যের কথা পছন্দও হয়েছে, কোথাকার এক পুলিশ অফিসারের মেয়ে। ভাবতেও সর্বাঙ্গ রাগে

জ্বলে যায় তার, শুধু তাই নয় আবার লোভের ইঙ্গিতও আছে। একমাত্র সুন্দরী কন্যা! কিন্তু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলা শক্ত। বিরুদ্ধতার কথা তো ভাবতেই পারা যায় না। কামরার দিকে তাকিয়ে একবার দেখল পরেশ, এখনও সেই ব্রিটিশ আমলের '২২ জন বসিবেক' লেখা বিজ্ঞাপনটা এনামেলের ফলকে পার্টিশানের গায়ে টাঙ্গান আছে। তিনটে আলো টিম টিম করে জ্বলছে আর গাদাগাদি করে মানুষগুলো বসে রয়েছে তার নিচে।

নিচের তলার মানুষ, প্রলিতারিয়েত। মুহ্যমান প্রকাণ্ড একটা দৈত্য যেন নেশা করে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন, লক্ষ্য করছে না, আঘাতের তীব্রতা স্পর্শও করছে না ওকে। অপর পক্ষ কিন্তু উৎকট উল্লাসে, আঘাত হেনে চলেছে। কিন্তু বুর্জোয়া সভ্যতা শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে, শোষণের দিন শেষ হয়ে এসেছে ওদের। মানুষের মত বাঁচবার অধিকার সকলের আছে তা ওরা স্বীকার করেন না। পৃথিবীতে যতদিন ক্যাপিটালিজম থাকবে ততদিন শোষণ চলবে! তা তো হবেই, রক্তলোলুপের দল রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তাই নিজের থেকে সরে যাবার লক্ষণ নেই। কিন্তু ওরা জানে না ক্রমবিবর্তনের কথা, ওরা বুঝতে চায় না বৈজ্ঞানিক সত্য। মানব-সমাজ যে মানব-দেহের মতই পরিবর্তনশীল এ সত্য ওদের চোখে এখনও ধরা পড়ে নি। আদিম গুহাবাসী মানুষ এবং বর্তমান সমাজের মধ্যে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক বিবর্তনটা যেন ওরা ইচ্ছে করেই লক্ষ্য করছে না। শশকের মত বালির মধ্যে নিজের মাথাটা লুকিয়ে ভাবছে সে অন্যের অগোচরে রয়েছে। ফিউডালিজম, রাজতন্ত্র এবং জমিদারদের উত্থান হয়েছে একের পর এক, প্রজাদের শ্রমের সুফলে নিজেরা পরিপুষ্ট হয়েছে, শুধু পুষ্ট নয় অবাঞ্ছিত ভাবে নষ্ট করেছে, সেই স্বেদমিশ্রিত ধনভাণ্ডার নিজেদের বিলাসব্যসনে। উন্মত্ত দানবের মত স্বৈরাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেল তারা। তার পর এল গণতন্ত্র। কিন্তু শুধু নামেই গণতন্ত্র, পিছনে লুকিয়ে আছে ধনতন্ত্র-বাদী গোষ্ঠীরা। গণতন্ত্রের রহস্যপুণ্য মুখোস পরে অভিনয় করে যাচ্ছে, তারা সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে ধাপ্পাবাজী দিয়ে, বিজ্ঞাপনের জৌলুস দিয়ে তারা নিজেদের কদর্যতা ঢেকে রাখছে। শাসনতন্ত্রের রাশ ধরে রয়েছে জোর মুষ্টিতে। কৌশলে করায়ত্ত করেছে গণদেবতাকে। দুধের বদলে পিটুলি-গোলা জল দিয়ে ভুলিয়ে রাখছে, বার বার চীৎকার করে ঘোষণা করছে—'বিশ্বাস

কর, এইটাই দুধ—পুষ্টিকর, বলকারক এবং খাঁটি নির্ভেজাল'। সমাজতন্ত্র-বাদীরা এতেই খুশী। তারা ভাবছে হিমালয়ের নিচে যখন এসে পৌছেছি তখন আর শৃঙ্গটা কত দূর? মূর্খের স্বপ্ন-বিলাস। ধনতন্ত্রের দিন কিন্তু শেষ হয়ে এসেছে তাই শেষ কা[illegible]িচ্ছে। ছলে-বলে-কৌশলে ভাসিয়ে রাখতে চাইছে তাদের শতচ্ছিদ্র [illegible]কাটা হাস্যকর প্রচেষ্টায়! বৈজ্ঞানিক সত্যকে লুকিয়ে রাখা কিন্তু সম্ভব নয়। এবার মাথা ন ড়া দিয়েছে নিচের তলার লোক। ধর্মের আফিং খাইয়ে, জুজুর ভয় দেখিয়ে আর তাদের দাবিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। ছোট ছোট চোখ দিয়ে হাতিটা নিজের দেহের আয়তনটা দেখে ফেলেছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তার চেতনা-বোধ এসেছে এবার।

ট্রেনের গতিটা কমে আসছে, এক লাইন থেকে অপর লাইনে চলছে সেটা। দুলছে কামরাটা—এক পাশ থেকে অপর পাশে।

মাসিমার দিকে তাকাল পরেশ। তিনি আড়ষ্ট ভাবে বসে রয়েছেন ওধারের বেঞ্চিটায়। সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজেকে অত্যন্ত সাবধানে সরিয়ে রেখেছেন। পাছে কেউ ছুঁয়ে ফেলে এই ভয়ে তিনি যেন সব সময়েই বিচলিত হয়ে রয়েছেন, এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ঠিক তার সামনের বেঞ্চে একটা নিম্নশ্রেণীর মেয়ে বসে রয়েছে তার ছোট শিশুটিকে নিয়ে। মাসিমা এক-একবার আড়চোখে তাকে দেখছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে-চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠছে। হঠাৎ মনে পড়ল পরেশের, হিন্দুস্থানী মেয়েটা মেথরানী! সে পরিচয় সে এবং তার স্বামী প্রথমেই দিয়েছিল। উচ্চবংশীয়রা তাই ও পাশের বেঞ্চে বেশী ভীড় করেন নি, তাতে ওদের সুবিধেই হয়েছিল।

মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন মাসীমা। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল পরেশের, না, তিনি এ ধরনের ছিলেন না, তবে অল্পেতেই বিরক্ত হতেন, অল্পেতে হাসতেন বা কাঁদতেন, মনের জোর কম ছিল। মানসিক সুস্থতা এবং অসুস্থতার মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। মনটা যেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র। একটা 'গাসডেনোমিটারে'র মত, সামান্য তারতম্যও ধরা পড়ে যায়। মায়ের জন্য কিন্তু এভাবে বিপদে পড়তে হয় নি তাদের কোন দিন। মাসিমা যেন এক দিনেই ওদের পাগল বানিয়ে ছেড়েছেন।

বৌদির কথা মনে পড়ল—রেবা বৌদি। মালদহে কয়েকবারই গিয়েছে পরেশ, সে লক্ষ্য করেছিল যে ননীদার সঙ্গে বৌদির খাপ খেত না, কোথায়

যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীর ছিল ওদের মধ্যে, অবশ্য কারণও একটা ছিল। সেটা জানতে পেরেছিল পরেশ মালদহে থাকতেই। বৌদির পুতুলের আলমারীতে একটা পুতুলের ফাঁপা জায়গাটায় একটা ছোট কাগজ লুকান ছিল, পরেশ সেটা লুকিয়ে দেখেছে—একটা ছোট কবিতা, সুন্দর. স্বচ্ছ তার ভাব, ভাষা ঠিক মনে নেই সবটা, তবে এটা জেনেছিল পরেশ, বৌ. অন্য কাউকে ভালবাসে এবং সে ব্যক্তি ননীদা নয় সারাজীবন এই কাঁটাটা বুকে নিয়ে বৌদিকে বেড়াতে হল। মানুষের জীবনটা সামান্য কারণেই যেন অর্থহীন হয়ে যায় বলে মনে হল পরেশের। একজনের অভাবে একটা গোটা সংসার ভেঙে যায়। মনে আছে একদিন এ বিষয়ে বৌদিকে প্রশ্নও করেছিল, পরেশ বলেছিল বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

একটা নয় ভাই, অনেকগুলো কর। মিষ্টিস্বরে উত্তর দিলে বৌদি।

তোমার এখানে ভাল লাগে ? কথাটা হঠাৎ বলা ভাল নয় ভাবলে পরেশ।

এখানে আমার সবচেয়ে কি ভাল লাগে জান ?

কি ?

ওই হারু ছুতোরের কাজ দেখতে আর এই নর্দমাটা।

সেকি ? আশ্চর্য হয় পরেশ।

হ্যাঁ, অবশ্য তোমাকে ভাল লাগে, কিন্তু তুমি আর ক-দিন থাক বল ? হতাশার একটা নকল ভঙ্গী করল বৌদি।

তা হলে আমি, হারু ছুতোর এবং ওই নর্দমাটা এই তিনটে জিনিস তুমি ভালবাস ? পরেশের বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেলল রেবা।

আচ্ছা বৌদি—

উঁ—

তোমার অন্য কোথাও বিয়ের ঠিক হয় নি ?

সম্বন্ধ হয়েছিল অনেক জায়গায়, তবে ঠিক হয়েছিল এইখানে, তা না হলে কি তোমায় পেতাম ?

এ ধরনের কথা প্রায়ই বৌদি বলতেন, মজা দেখার জন্যে, অর্থাৎ আসল কথাটি এড়িয়ে যেতেন এইভাবে। ননীদাকেও মনে আছে পরেশের—মোটা থপথপে চেহারা, মালদহে ওকালতি করতেন। লোক খারাপ নয়, কিন্তু

কেমন যেন ভাল লাগত না ননীদাকে। নস্যি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবান্তর কথা বলতে পারতেন ননীদা। একদিনের কথা মনে পড়ল।

জানিস পরেশ, আজ দিলাম ঠুকে হাকিমকে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন ননীদা।

তাই নাকি? পরেশ পাশ কাটাতে পারে না।

হ্যাঁ, বলে কিনা, 'উইটনেস হোস্‌টাইল'—আরে বাবা—তা কি করে হয়? ১৯৩৫ সনের হাইকোর্টের লর্ড উইলিয়মের ঘরে ক্রাউন ভার্সেস সেখ কামরুদ্দিনের কেসটা সাইট করলাম, একেবারে চক্ষু ট্যারা হয়ে গেল বাছাধনের। অনুকরণ করে ননীদা নিজের চোখ ট্যারা করলেন।

তাই নাকি? মন্তব্য করার মত অন্য কিছু খুঁজে পায় না পরেশ।

হ্যাঁ, আদত কথা কি জানিস? জানে না, কিস্‌সু জানে না, কোন রকমে ধরে করে পাস করেছে, আর তৈল মর্দন করে চাকরিটা বাগিয়েছে, ব্যস, হাকিম বনে গেল। কই গো গামছাটা দাও—

বৌদি গামছাটা দিয়ে গেলেন। সশব্দে নাক ঝাড়লেন ননীদা, তারপর গামছাটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে গেলেন উঠোনের দিকে। পরেশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, এত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবে তা সে আশা করে নি।

হঠাৎ পাশ ফিরে তাকাল পরেশ। মালদহের ছবিটা মিলিয়ে গেল। কোলাহল-মুখরিত, ধূলিধূসরিত, তৃতীয় শ্রেণীর রেল-কামরায় মনটা আবার ফিরে এল পরেশের। পাশেই বসে আছে একটি মেয়ে, নাকে তিলক কেটে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়েছে—এটা পরেশের খুব খারাপ লাগে। ধর্মের বন্ধনে মানুষ কতবার তার মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। কত রক্ত-স্রোতের বন্যায় ধুয়ে গেছে, পৃথিবীর ইতিহাস সে সংবাদ রাখে। যে-কোন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কারণ খুঁজলে ইতিহাসের পাতায় ওই একটি কারণই পাওয়া যায়—ধর্ম। ধর্মের নেশা যে-কোন নেশার চেয়ে অনেক তেজস্কর। এই নেশার বশে পৃথিবীতে যে পরিমাণ লোকক্ষয় হয়েছে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। মানুষকে উন্মাদনা দিতে, তার ব্যক্তিত্ব এবং সত্তাকে অবলুপ্ত করে তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর পর্যায়ে এনে দেয় এই ধর্ম। পৃথিবীর অনেক বড় কাজ মানুষ তুচ্ছ করে এই নেশার বশীভূত হয়েছে, তা না হলে পৃথিবী আজ লক্ষ্য বৎসর এগিয়ে যেতে পারত, একথা পরেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। ঠিক এই বিশ্বাসের

অভাবের জন্য সুলতাকে ছাড়তে হল। সুলতা রায় তার এই বিশ্বাসের মূল্য দেয় নি, উপরন্তু উপহাস করেছিল। দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে আছে ওর মনে ওই কুসংস্কারের আগাছাগুলো। মনটা তার ঘেঁটু ভূত, ওর ঘাড়ে চেপে আছে, সেখানে সুন্দর চেহারা, শিক্ষা, বংশ সবই অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ল, সেদিন আসতে সুলতার একটু দেরী হয়েছিল, ড্রইংরুমে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরেশকে। লাল পাড় শাড়ী পরে ঘরে ঢুকল সুলতা, বললে, কি অনেকক্ষণ বসে আছ? দুঃখিত—এর আগে আসার উপায় ছিল না, কারণ বাড়ীতে পুজো ছিল।

পুজো? ভ্রূকুঞ্চিত হল পরেশের।

হ্যাঁ, সত্যনারায়ণের পুজো।

সত্যনারায়ণ?

হ্যাঁ, তুমি যে একেবারে সাহেব হয়ে গেলে! সুলতা তাকাল পরেশের দিকে।

না, সাহেব হই নি, তবে পার্টি মিটিঙে তুমি বোধ হয় আজকাল আর যাও না?

কেন যাব না—

গেলে এ জিনিস নিয়ে এত মাতামাতি করতে না।

মাতামাতি?

হ্যাঁ, মাতামাতি ছাড়া আর কি! সুলতা, এ নেশা যত বাড়াবে তত বাড়বে, মরফিয়ার মত মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াতে হবে তবে আরাম পাবে।

সে কথা যদি বল পরেশ, তা হলে সব জিনিসই তাই—

তার মানে? আশ্চর্য হয় পরেশ।

তার মানে—এই ধর না মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা। আমরা পরস্পর মিশছি এও তো নেশার মত।

সুলতা! বিরক্ত হয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে পরেশ।

আবার ধর রাজনৈতিক মতবাদের কথাটা, সেটাও তো একটা নেশা বলা যায়।

তোমার মনে এসব কথা কখন এল? আমাদের রাজনৈতিক মতবাদ বৈজ্ঞানিক, সেখানে নেশার কথা ওঠে কেন?

বিজ্ঞানকেও তো নেশা বলতে পারা যায়, রাজনীতিকে বলতে আপত্তি কি?

না সুলতা, তুমি ভুল করছ, তোমার মনের ভেতর বুর্জোয়া ভূতটা আবার

জেগে উঠতে চেষ্টা করছে, শতাব্দীর অভিশাপ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে তোমার মনের কোণে, কুসংস্কারের রূপ নিয়ে।

তুমি কি নিজেকে সংস্কারমুক্ত ভাব নাকি, পরেশ ?

তোমার বিদ্রূপটা বুঝতে পারলাম স্থলতা, কিন্তু কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি যদি ভেবে থাক, আমার দোষ দেখিয়ে তোমার নিজের দুর্বলতাটা ঢাকা দেবে, তা হলে ভুল করছ।

আমার দুর্বলতা নেই পরেশ, আমি ফ্যানাটিক নই, আমার মতবাদ অন্য লোক জানতে না পারলে তাকে আমি ছোট বলে ভাবি না। অন্ধের মত, তোতাপাখীর মত বই পড়ে আমি আমার মতবাদ সৃষ্টি করি না, সে রাজনৈতিকই হোক আর সমাজতান্ত্রিক হোক কিংবা ধর্ম সম্বন্ধেই হোক। আমি আমার মনকে বুঝি, তাকে চলতে দিই স্বাধীনভাবে শৃঙ্খলিত করে, চাপ দিয়ে তাকে মোড় ফেরাই না। আর ধর্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার মত যুক্তি এখনও আমি খুঁজে পাই নি।

ব্যঙ্গের কথা নয় স্থলতা, নেশার কথা। ধর্মান্ধ হলে অন্য জিনিসের রূপ তুমি সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাবে না, নতুন সমাজ গড়বার ভার আমাদের ওপর। পীড়ন বন্ধ করে গ্লানিহীন সুন্দর সমাজ সৃষ্টি করব আমরা।

মানুষকে তৈরি করা সম্ভব নয় পরেশ। তার নিজের সত্তা আছে, রাষ্ট্রের কেন অন্য কোন জিনিসের সঙ্গেই তাকে যুক্ত করে দেওয়া সম্ভব নয়, তা হলে সে আর মানুষ থাকবে না, যন্ত্র হয়ে যাবে—নীরস শুষ্ক যন্ত্র। প্রকাণ্ড একটা হুইলের স্ক্রুর মত। আর কিছু নয়।

তুমি হয় তো সামরিক নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন দেখাবে, তুমি হয়তো রাজনৈতিক মতবাদের ছকে আমার মনকে গড়ে নেওয়ার উপদেশ দেবে, কিংবা তুমি আমাদের মতবাদ ছাড়া আর সবই যে অকল্যাণকর আর দোষণীয়, সে-কথাই আমায় বোঝাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু পরেশ আমি তা মানি না।

তুমি আমাদের মতবাদে বিশ্বাস কর না স্থলতা ?

বিশ্বাসের প্রশ্ন নয় পরেশ, এটা আমার মনের কথা, আর মনকে পঙ্গু করার মত কোন মতবাদই সৃষ্টি হয় নি বলে আমি বিশ্বাস করি।

তার পর মনে পড়ল পরেশের, স্থলতার সঙ্গে এ ঘটনার পর আর দেখা করে নি সে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল পরেশ, রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে সেটাকে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করলে একবার। খোলা জানলা দিয়ে কামরাটার মধ্যে হু হু শব্দে বাতাস বয়ে চলেছে। মাসিমার দিকে এবার তাকাল পরেশ। মাসিমা অপর পাশে উপবিষ্ট মেথরানীটার সঙ্গে কথা বলছেন। আশ্চর্য হল পরেশ, মেথরানীর সঙ্গে কথা কইলে মাসীমার জাত যাবে না তো ? মেথরানীর কোলের ছেলেটা কাঁদছে। কালো মোটা-সোটা ছেলেটা, বয়স প্রায় বছর-খানেক হবে। কোমরে কালো সুতো দিয়ে বাঁধা একটা ফুটো পয়সা। ওদের আলাপের কিছুটা শুনতে পেল পরেশ।

মাসিমা বলছেন, ছেলেটাকে কাঁধে ফেল, না না, ও রকম নয়, বাংলা কথাও বুঝিস না। হ্যাঁ, ওই রকম, পেটে চাপ পড়লে তবে তো ছেলে চুপ করবে।

ছেলেটা এবার সত্যিই চুপ করে।

তোর নাম কি ? মাসীমা সন্তর্পণে আলাপ করছেন মেথরানীর সঙ্গে।

কুসমী। আড়চোখে তাকিয়ে জবাব দেয় সে।

কোথায় থাকিস ?

হাতিবাগানে ধাঙড় বস্তিতে, হাসপাতালে কাম করি মা।

নিজের অজ্ঞাতে সুহাসিনী দেবীর মুখটা বিকৃত হল।

হামার আদমীভি কাম করে। আবার বলল কুসমী। পাশে উপবিষ্ট বিদেশীর দিকে সলজ্জভঙ্গীতে তাকায় একবার, নতুন মা হওয়ার গর্বে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ও। কাঁধের ওপর ছেলেটা আবার যেন উসখুস করছে।

দুধ দে ওকে। আদেশের ভঙ্গীতে বললেন মাসিমা। ছেলেটাকে কোলে শোয়ালে কুসমী, তার পর জামার বোতাম খুলে দুগ্ধপুষ্ট স্তনটা এগিয়ে দিল শিশুটার মুখের কাছে। দু-একবার অন্ধের মত হাতড়ায় শিশুটা, মুখ ঘষে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে তার খাদ্যের উৎস-মুখটা। রকম দেখে হাসে কুসমী, ছেলেটার সত্যিই খিদে পেয়েছে, সে বুঝতে পারে নি, মা কিন্তু ঠিক বুঝেছেন তো ?

সশব্দে একটা ট্রেন ডাউন লাইনে চলে গেল—ছেলেটা আচমকা আওয়াজে চমকে উঠেছে।

সুহাসিনী দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন কুসমীর ছেলেটার দিকে।… ননীর কথা মনে পড়ে গেল তাঁর, ননীও ওই রকম মোটা-সোটা কোলভারী

ছেলে ছিল। কতদিন আগেকার কথা কিন্তু এখনও সব খুঁটিনাটিগুলি পর্যন্ত মনে আছে তাঁর। বিস্মৃতির অতলগহ্বরে এখনও মিলিয়ে যায় নি সব। আনন্দ, শঙ্কা আর তৃপ্তি-মেশানো মধুর দিনগুলি কোথায় গেল কে জানে!

গাড়ীর দোলাতে সুহাসিনী দেবীর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

দোলনায় না শোয়ালে ননীর ঘুম হত না, ছোট ছোট হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে পাড়া মাথায় তুলত। ভারি দুষ্ট ছিল ননী, মোটা নরম হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করত বার বার। স্পষ্ট মনে আছে, সেই ঈষদুষ্ণ কচি হাতের স্পর্শটা এখনও লেপটে আছে যেন, সেই ছোঁয়াটা তাঁর মুখে।

নিজের অজান্তে শীর্ণ শুষ্ক মুখে হাতের তালুটা রাখলেন সুহাসিনী দেবী।

কবি কমলাকান্ত সরকারের ঘুম পায় নি বটে, কিন্তু সে যেন একটু বিরক্ত বোধ করছিল। বিরক্তির অবশ্য কারণও ছিল। অপর বেঞ্চে উপবিষ্ট ভদ্রলোক উপর্যুপরি একটার পর একটা ধূমপান করে চলেছেন, তাতে শীতের রাতে বন্ধ কামরাতে দস্তুরমত ধোঁয়া জমে গিয়েছে। সত্যলব্ধ গলার প্রদাহে সেটা খুব আরামপ্রদ নয়। কবি কমলাকান্ত ধূমপান করে না, শুধু সিগারেট কেন, অন্য কোন রকম নেশাই তার নেই। কমলাকান্তের মনে পড়ল রেবার সঙ্গে এ বিষয়ে ওর একবার আলোচনাও হয়েছিল।

কমল, তুমি সিগারেট খাও না? প্রসঙ্গক্রমে একদিন রেবা জিজ্ঞেস করেছিল।

না, আমার কোন নেশাই নেই। উত্তর দিল কমলাকান্ত।

কবিতা লেখাটা কি? জ্র দুটো একটু তুলে প্রশ্ন করে রেবা।

ওটা জীবনের প্রকাশ। সূর্যের প্রকাশ তার আলোতে, মাধুর্যে আর ভালবাসায়।

তা না হয় হল, কিন্তু ও ছাড়া আরও একটা নেশা তোমার আছে কমল। আড়চোখে তাকায় রেবা।

কই না তো?

হ্যাঁ, এই যে আমি। নিজের দিকে তাকিয়ে কথাটা পেশ করে রেবা।

তুমি নেশা, কি বলছ রেবা?

তা ছাড়া কি। সুন্দর একটা ভঙ্গী করল রেবা।

ভালবাসাকে নেশা বলতে হয়তো মেয়েরাই পারে। সত্যি যারা ভালবাসে তাদের কাছে ভালবাসা নেশা নয়, স্বপ্ন নয়, এমনকি অবলম্বনও নয়, ওটা সত্তা।

তুমি কি সুন্দর কথা বলতে পার কমল!

তুমি পার না?

না,আমি অত ভাবতেও পারি না। তুমি যেন আমার মনটাকে আতস কাচের নিচে লক্ষ্য কর। আর তার বিভিন্নমুখী রসকে বিশ্লেষণ করে উপভোগ কর।

সেইটাই তো কবির কাজ।

আচ্ছা কমল, তুমি কবি কি করে হলে?

তা তো জানি না, কখন কি করে কবিতাকে ভালবেসেছি, কোন্ মুহূর্তে জীবনের বৈচিত্র্যময় অনুভূতির ছোঁয়া আমার মাঝে দোলা দিয়েছিল তা কি করে বলব? জান রেবা, মানুষের মন যুগ যুগ ধরে সত্যের অনুসন্ধান করে চলেছে, সুন্দর আর মঙ্গলের আশায়, পথ বেয়ে চলেছে সে আকুল আগ্রহে। জীবনের কত বৈচিত্র্য রঙে, রসে, গন্ধে সুরভিত হয়ে রয়েছে—প্রাণভরে যদি যদি তাকে অনুভব করতে না পারলাম তা হলে তো দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে রেবা।

আরও যেন কি বলেছিল কমলাকান্ত এখন ঠিক মনে পড়ছে না, সব কথাগুলোকে মনে করার চেষ্টা করল সে। চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে দূরে অন্ধকারে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল কবি। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। একটানা আওয়াজটা হচ্ছে ক্রমাগত ঝক্ ঝক্ ঝক্। শাল আর মহুয়ার বনের মধ্যে শব্দটা যেন লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে—প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বার বার।

ঘন অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেনটা উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে একটা প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত। রাত্রের নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার গতিবেগের মত্ততায়। একবার কামরার দিকে তাকিয়ে দেখল কমলাকান্ত। ওপাশে উপবিষ্ট গেরুয়াধারী সাধু, সুদর্শন প্রেমিকযুগল, মেমসাহেব, সে নিজে, সবাই ভিন্ন জায়গার মানুষ কিন্তু সবাই এসে জুটেছে এই কামরায়। ট্রেনটা যেন একটা চলন্ত মুসাফিরখানা বলে মনে হল কবির কাছে। কত লোক উঠছে, নামছে, আসছে, যাচ্ছে—যেন নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। কত প্রেমিক ফিরে যাচ্ছে তার প্রেমাস্পদের কাছে, দীর্ঘ বিরহের অবসান হবে। সেই

সঙ্গে আবার কত ব্যথা আর বেদনাই না বহন করছে এই ট্রেনটা। বিচ্ছেদের করুণ আর্তস্বরটা যেন বাতাসের হু হু শ্বাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। হাসি-কান্নার মেলা নিয়ে চলেছে ট্রেনটা, মানবহৃদয়ের চলমান প্রদর্শনী যেন একটা। ঝক্ ঝক্—ইঞ্জিনের আওয়াজটা পালটে গিয়েছে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে আবার দেখল কমলাকান্ত।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বাসদেও শর্মা মনমরা হয়ে বসে রয়েছে। অনেক-গুলো চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে। পুলিসে নোকরি তার বাইশ বছর হল, কিন্তু ক্রমেই সে নিরাশ হয়ে পড়ছে। এই তো আজকেরই কথা, সে সবেমাত্র রোটি আর আলু করেলার ভাজি বানিয়েছে, ড়হড় ডালটা সবেমাত্র নামিয়েছে—ব্যস্, হুকুম হল ব্যানার্জি সাহেবের বাড়ী খবর দিতে। মুখের খানা ছেড়ে ছুটতে হল সেই বহুবাজারে। কি করবে, সরকারী কাম করতেই হবে। স্বরাজ পেয়ে তো খুব লাভ হল। আগেকার দিনে সাহেবদের আমলে তবু দু-পয়সার মুখ দেখা যেত। শক্ত কেস-টেস ধরলে বকশিশ মিলত, প্রমোশন ছিল, তা ছাড়া খাতির কি কম ছিল, লাল পাগড়ী দেখলে তা বড় তা বড় বদমাশ ঠাণ্ডা হয়ে যেত, যারা একটু উলটো-পালটা করত তাদের দু'এক দিন ঠাণ্ডিঘরে রাখলে কিংবা ধোবিয়া বা কাছুয়া প্যাচের স্বাদ পেলে তো কথাই নেই। আর এখন? পাবলিক তো পুলিসকে কেয়ারই করে না, তা ছাড়া উপরির কথা না বলাই ভাল, সে তুলনায় আগেকার দিনে তাদের খরচই ছিল না কিছু। মুচি জুতো সেলাই করে, পালিশ করে কৃতার্থ হত, দোকানে খাবার, চা, পান ও সরবতের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল, লোকেরা দেখলেই হাত তুলে 'আচ্ছা হ্যায় জমাদার সাব' বলে সাদর সম্ভাষণ জানাত। এখন আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নাই। স্বরাজ পেয়ে তো এই লাভ! অবশ্য এই মওকায় কয়েকজন বেশ গুছিয়েও নিয়েছে। তার এক ভাতিজা রামস্বরূপ শর্মা তো মন্ত্রী না কি যেন হয়েছে। গোরখপুর থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিল। না, তার সঙ্গে বাসদেও দেখা করে নি। আগে তো সে ক্ষেতির কাম করত, এখন মন্ত্রী হয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, আর ঝুটমুট দেখা করেই বা লাভ কি? খোসামোদ সে করতে পারবে না, তা সে মন্ত্রীই হোক আর লাটসাহেবই হোক!

আর এই খোসামোদ করতে পারে নি বলেই তো আজ তাকে মুখের রুটি ফেলে ছুটতে হচ্ছে, তা না হলে তো এতদিন বাসদেও শর্মা চেয়ারে বসে হুকুম চালাতে পারত।

দেশের কথা মনে পড়ল বাসদেও শর্মার। বছর তিনেক হল, সে আর দেশে যায় নি, আর গিয়েই বা কি হবে? চার সাল হল তার জানানা মারা গেছে, শেষ সময়ে দেখাও হয় নি তার সঙ্গে। একটা মেয়ে অবশ্য আছে—ধনপতি দেবী, তার সাদিও সে দিয়েছে, ব্যস্‌, আর দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? জায়গা জমি আর ক্ষেতির কাম যা আছে সে সব দেখাশুনা তার ভাই রাম-দুলারই করে। ঘরে তার চারটে ভঁইস আছে, গাইভী দু-তিনটে আছে; অভাব কিছুরই নেই তবু যেন তার দেশে যেতে প্রাণ আর চায় না। অবশ্য কারণ একটা আছে, তিন বছর আগে বাসদেও বাড়ীতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তাতে তার মনটা তিক্ত হয়ে গিয়েছে। বাড়ী গিয়ে বাসদেও অসুখে পড়েছিল। প্রায় পাঁচ দিন তাকে খাটিয়াতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল, সেই সময়ে তার বাড়ীর আবহাওয়ার পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে। নিজের বাড়ী তার কাছে যেন অপরিচিত বলে মনে হয়েছিল। তার ভাই রামদুলার অবশ্য তাকে বহু ভক্তি করেছে, কিন্তু ওর বহুটা বহুত বদমাশ, দিনভোর খালি চিল্লাচিল্লি করে, বিলকুল বেসরম, ঘরে যে সে শুয়ে রয়েছে তার সে গ্রাহ্যই নেই। না, দেশে আর সে যাবে না, যখন তার কোন টান নেই, যখন তার আশায় কেউ অপেক্ষা করার লোকই নেই, তখন সে আর যাবে কেন?

চলন্ত ট্রেনের কামরা দিয়ে বাসদেও শর্মা বাইরের শূন্য অন্ধকারের দিকে উদাস ভাবে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ কোমরের পিস্তলটায় হাত ঠেকল বাসদেওয়ের; চিন্তার জালটা মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল, সেই সঙ্গে মনটা তাব নেমে এল বাস্তব জগতে। কর্তব্যের কথা মনে পড়ল বাসদেও শর্মার। ট্রেনটা আর একটা স্টেশনে থামল। জুতোটা পরে বাসদেও ব্রজেশ্বরবাবুর খোঁজে এগিয়ে চলল। ব্রজেশ্বরবাবুর কামরার সামনে গেল না সে। তাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা অপর পক্ষের অগোচরে রাখাই নিয়ম, নিজেদের যত দূর সম্ভব অলক্ষ্যে রেখে কাজ হাসিল করতে হয়। ব্যানার্জি সাহেবও তাকে দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হল, কারণ তিনি কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা নিরিবিলি চায়ের স্টলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাসদেও পাশে

দাঁড়াতেই ব্রজেশ্বরবাবু চাপা গলায় বললেন, নানকুর খবর পেয়েছি বাসদেও। উত্তেজনায় গলার স্বরটা কেঁপে উঠল তাঁর।

কোথায় হুজুর? সারা ডিপার্টমেণ্ট যার জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে, সেই দুর্ধর্ষ নানকুর নামটা শুনেই বাসদেওয়ের সর্বশরীরের মাংসপেশীগুলি মুহূর্তে টান হয়ে গেল।

স্থনীল রায়ের কামরায় সাধু সেজে বসে রয়েছে। ফিস ফিস্ করে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

আমি ও কামরায় যাব হুজুর? ব্যগ্র হয়ে উঠল বাসদেও শর্মা।

এখন নয়, তুমি একবার দূর থেকে দেখে এস।

বাসদেও স্বামিজীর কামরা লক্ষ্য করে চলল, ব্রজেশ্বরবাবু সেই অবসরে এক কাপ চা খেয়ে নিলেন।

ফিরে এল বাসদেও। হ্যাঁ নানকুই বটে, তাকে চিনতে দেরী হয়নি বাসদেও শর্মার।

চিনতে পেরেছ? ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

হ্যাঁ হুজুর।

তোমার কাছে পিস্তল আছে?

আছে। সন্তর্পণে একবার কোমরে রাখা পিস্তলের ওপর হাতটা স্পর্শ করল বাসদেও।

বিজয়ের কাছে?

আছে।

তা হলে তুমি বিজয়কে বল ও কামরায় চলে যেতে।

ক্ষুণ্ণ হল বাসদেও, তার পরিবর্তে বিজয়কে পাঠান তার মনঃপূত হয় নি। ব্রজেশ্বরবাবুর তার মনের ভাবটা যেন বুঝতে পারলেন, বললেন, বিজয়কে আগে পাঠাও, তার পর আমরা দু-জনেই যাব।

কখন হুজুর? ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল বাসদেও।

ন'টা চল্লিশে সারেংহাটি স্টেশনে পৌছব, সেখানেই—। কথাটা শেষ করলেন না ব্রজেশ্বরবাবু, চোখের একটা ইঙ্গিত করলেন শুধু।

আদেশমত বিজয় সিংহ স্থনীল রায়ের কামরায় গিয়ে উঠল। আগন্তুকের দিকে সকলেই তাকাল—স্বামিজী, হাসমু, কবি কমলাকান্ত এবং স্থনীল রায়।

বিজয় সিংহকে দেখে কমলাকান্তর টিকটিকিটার কথা মনে পড়ে গেল। শিকারের আশায় যখন সে হলদে পার্টিশনের ওপর বসে গোল গোল চোখ দিয়ে তাকায়, তখন তার ভাবভঙ্গীটাও অনেকটা এই লোকটারই মত হয় বলে মনে হল যেন।

স্থনীল রায়ও বিজয় সিংহকে লক্ষ্য করল। অপর দিকের বেঞ্চে বসে লোকটা একটা খবরের কাগজের আড়াল থেকে তাকেই নিরীক্ষণ করছে বলে মনে হল তার। স্থনীল রায় অস্বস্তি বোধ করছে, শীতের রাত্রেও তার কপাল ঘামে ভিজে উঠেছে—গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে, পেটের ভিতরের অন্ত্রগুলি তাল-গোল পাকাচ্ছে যেন। শরীরের মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান কম্পনপ্রবাহ তাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, প্রচণ্ড চাপের ফলে তার স্নায়ুতন্ত্রীগুলি ছিন্নপ্রায়। আধঘণ্টা পূর্বের এক পেগ হুইস্কির ক্রিয়া এখন আর অনুভব করতে পারছে না স্থনীল রায়।

আর একটা সিগারেট ধরাল সে—জোর করে সমস্ত জিনিসটার গতি মনে মনে ফেরাতে চেষ্টা করল স্থনীল রায়। হাসনুর দিকে তাকিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি ভুলতে চেষ্টা করল সে।

হাসনু বুঝতে পেরেছে যে কোন কারণে স্থনীল রায় অস্থির হয়ে পড়েছে, চাঞ্চল্যের কারণটা অবশ্য অনুমান করতে সে অক্ষম তবে এটুকু সে জানে স্ত্রীলোকের চাঞ্চল্যের হেতুটা অনেক সময় যেমন হাস্যকর হয় পুরুষের বেলায় কিন্তু তা হয় না, পিছনে অধিকাংশ সময়ে রীতিমত গুরুতর কারণই থাকে। কারণগুলো অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে জানাবার মত হয় না। তা না হলে লক্ষ্ণৌর মনস্থর আলি নির্বাক ভাবে তার জীবন থেকে সরে দাঁড়াল কেন ? পরে অবশ্য হাসনু বুঝেছিল কাপুরের সঙ্গে তার হৃদ্যতার কথা মনস্থরের কানে পৌছেছিল নিশ্চয়ই। মনস্থর আলির কথা মনে পড়ল হাসনুর।

প্রথম যৌবনের রঙীন স্বপ্নময় জীবন! কাশ্মীরের স্বর্গীয় আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলির কথা এখনও মনে আছে হাসনুর। অদ্ভুত স্থদর্শন ছিল মনস্থর আলি। ধীরে ধীরে কথা বলার অভ্যাস ছিল মনস্থরের। পিছন থেকে হাসনুর কাঁধের কাছে মুখটা এনে অস্ফুট স্বরে তার সৌন্দর্যের তারিফ করত। মাঝে মাঝে হাফেজ আর ওমর খৈয়ামের বয়েৎ আবৃত্তি করত মধুর কণ্ঠে। কাশ্মীরের চন্দ্রালোকে শিকারার স্বপ্নময় মধুনিশির কথা এখনও ভোলে নি

হাসমু। মনসুরের ভালবাসার পদ্ধতিটা ছিল অসাধারণ, হাসমুর কাছে সান্নিধ্যের প্রশ্নই বড় ছিল, কিন্তু মনসুর যেন দূরত্বের মাধুর্যকে উপভোগ করত বেশী, অনেক সময় মনসুর তাকে দূর থেকে অপলক দৃষ্টিতে দেখত! বিরক্ত লাগত হাসমুর সেই সময়ে। মন আর দেহ যখন উন্মুখ হয়ে থাকত তার সান্নিধ্যলাভের প্রতীক্ষায় তখন নিরাশ হলে বিরক্তি আসে বৈকি! মনসুর আলি কিন্তু হাসমুর গজল গানের একজন সমজদার ভক্ত ছিল। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত তার দিকে মনসুর—গানের প্রত্যেকটি কথা আর সুরের বিন্যাসকে তারিফ করত, কদর করত গুণমুগ্ধ শ্রোতার মত।

তার পর এল ঘনশ্যাম কাপুর—নিয়ে এল আর এক নতুন ধরনের আস্বাদ। যৌবনের প্রচণ্ডতা আর উদ্দাম চাঞ্চল্য তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ফুটে উঠত; দুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে আর দুর্বার জীবনের উন্মাদনায় যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল ঘনশ্যাম কাপুর। নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দিত না হাসমুকে, হাঁফিয়ে উঠত যেন সে। ঘনশ্যামের ভালবাসার তীব্রতা সহ্য করতে পারত না অনেক সময়, কিন্তু হাসমুর ভাল লাগত—খুব ভাল লাগত। মনসুরের মৃদুমন্দ প্রেমের স্নিগ্ধতার পর হাসমু পেল আর একটা নতুন স্বাদ। রহস্যাবৃত হেমন্তের কুহেলিকার পর এল শত সূর্যের আলো-ঝলমল দীপ্তি। ঘনশ্যাম কাপুরের ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর; অর্থের সীমা ছিল না যেন। কটন মিলস, বিস্কুটের কারখানা, সাবানের কারখানা, মোটরের এজেন্সী, বিল্ডিং কণ্ট্রাক্ট কিছু বাদ নেই। একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল ঘনশ্যাম কাপুর। অদ্ভুত মনের জোর ছিল কাপুরের—সবই করত কিন্তু কাজের সময়—ব্যবসার বেলায় অন্য রকম। তখন শত হাসমুরও সাধ্য ছিল না তাকে ফিরিয়ে আনে! ঘনশ্যামও হারিয়ে গেল—তার বিয়ে হল বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। ব্যবসার জন্যে এ বিয়ের নাকি প্রয়োজন হয়েছিল। প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই মানুষের জন্ম। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এক-একটা করে আহরণ করতে হবে, তার পর সেই সংগ্রহের দিকে তাকিয়ে নিজের পিঠ নিজে চাপড়ানোর নামই বোধ হয় তৃপ্তি! ঘনশ্যাম কাপুরের পর হাসমুর জীবনে এল নিরঞ্জন ভার্গব—পঞ্জাবের অধিবাসী। একটু মোটা ধরনের বুদ্ধি আর স্থূল রুচি ছিল নিরঞ্জনের। হাসমুর নাচ তার খুব ভাল লাগত, তাই তাকে

ক্রমাগত নাচতে হত বিভিন্ন সজ্জায়। তা ছাড়া নিরঞ্জনের আরও একটা দোষ ছিল—প্রচুর মদ খেত সে। নিরঞ্জন ভার্গবের সাহায্যে সে ফিলমে প্রথম নামতে পেরেছিল, সেকথা হাসনুর মনে আছে। এক এক করে কতজন এল তার জীবনে—কত পদধ্বনি মুখরিত করল তার যৌবনের অঙ্গন, কত ফুল সুরভিত করল তার স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা মালঞ্চে? এখনও আসবে, এখনও সে প্রতীক্ষায় আছে তার পরিণতির আশায়। সুনীল রায়ের সিগারেটের ধোঁয়াটা হাসনুর মুখের চতুর্দিকে ঘিরে ধরেছে—খোলা জানলা দিয়ে বাইরে মুখটা বাড়াল হাসনু—ট্রেনটা ধীরে ধীরে চলছে। অদূরে আলোকসজ্জিত স্টেশনটা নজরে পড়ল হাসনুর।

ট্রেনটা দাঁড়াতেই ডাইরেক্টর ধীরেন ভড় নেমে এল। এতক্ষণ সে মনমরা হয়ে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করছিল।

রবীন সরকারের মত লোকেরও চাকরিতে উন্নতি হচ্ছে, অথচ তার অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। উপরি আয়ের সুযোগ আজকাল আর তেমন নেই। কিছুদিন হল অবশ্য একটা বই কোম্পানীতে গছানো গিয়েছে। লেখককে কোম্পানী দু-হাজার টাকা দিয়েছিল, তা থেকে পাঁচশ' টাকা সে লেখককে দিয়েছে, বাকি টাকাটা সে নিজেই নিয়েছে। অজানা নতুন লেখকের পক্ষে পাচশ' টাকাই যথেষ্ট। কে ও বই নিত? কতশত আচ্ছা আচ্ছা সাহিত্যিক দু-বেলা কোম্পানীর দরজায় ধরনা দিচ্ছে। আর লেখকের কেরামতি যে কত তা আর জানতে বাকি নেই তার। পুরানো মাসিক পত্রিকা আর ইংরেজী সিনেমা থেকে জোড়াতালি দিয়ে, এর মুণ্ডু ওর ধড়ে চাপিয়ে, একটা যা হোক তা হোক প্লট খাড়া করলেই হল, আর কোনরকমে ধরে-করে একবার ফিলম কোম্পানীতে গছাতে পারলেই হল—ব্যস সাহিত্যিক বনে গেলেই আজ এ কাগজে, কাল সে মাসিকে, পরশু ও ছবির বইয়েতে ছবি ছাপতে সুরু হয়ে গেল।

সাপ-ব্যাং যা হোক লিখলেই হল—দোষ যা কিছু তার জন্যে আছে প্রবাদবাক্যের নন্দ ঘোষ—মানে ডাইরেক্টর। বাইরে থেকে শুনতেই ভাল—ফিলম ডাইরেক্টর, কিন্তু ভেতরের খবর রাখে কে?

মোটরগাড়ীটা কোম্পানীর—তার নয়, সঙ্গের সুন্দরী নারী তার লীলা-সঙ্গিনী নয়, কোম্পানী নিয়োজিত, মালিকের মনোরঞ্জনকারিণী অভিনেত্রী

মাত্র, এ খবর কে রাখে! জনসাধারণের ডাইরেক্টর সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা আছে বলে মনে হয়। হয়তো ভাবে কবিত্বপূর্ণ আবহাওয়াতে আধুনিক রুচি-সম্মত পরিবেশে ডাইরেক্টরের সময় কাটে ভাল। এদের একবার তার নিজের বাড়ীটা দেখিয়ে আনলে হয়। বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেই চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। নোনা ধরা দেওয়ালে ঘেরা ছোট দুটো গুমোট ঘর—তার মাঝে শ্যাওলা-ধরা উঠান—পাশের কল থেকে সুতোর মত জল পড়ছে, নিচে রয়েছে একটা জং-ধরা পুরনো টিনের ড্রাম। খালি বার্লির একটা মরচে-ধরা টিনে করে তা থেকে জল নেওয়া হয় নানা দরকারে। বাইরের দিকে পায়রার খোপের মত একটা ছোট কুঠুরি আছে, সেটা হল ধীরেন ভড়ের বৈঠকখানা। একপাশে তার একটা ছোট তক্তপোশ, তার ওপর একটা তেলচিটে শতরঞ্জি পাতা থাকে। দু-পাশে দুটো নড়বড়ে হাতলবিহীন চেয়ার। সামনের দেওয়ালে দু-বৎসরের পুরনো একটা ক্যালেণ্ডার টাঙান—শিবের ছবি,ঘন জটার মধ্যে থেকে মা গঙ্গা শতধারে ঝরে পড়ছেন। শিবের চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত, কানে দুটো ধুতরো ফুল গোঁজা আর গলায় মাফলারের অনুকরণে একটা মোটা সাপ জড়ানো। ক্যালেণ্ডারের তলায় লেখা 'জাহাজমার্কা বিড়ি পান করুন—সোল এজেণ্টস্ মহম্মদ সুলেমান'। অপর দিকের দেওয়ালে একটি বাঁধান ছবি। একটি বিদেশী নর্তকী মনোহর ভঙ্গীতে নৃত্য করছেন, আশপাশে আরও কয়েকজন স্বল্পবেশা মহিলা বিভিন্ন ভঙ্গীতে শুয়ে বা বসে রয়েছেন, একধারে একটি জলাধার, তার একপ্রান্তে কয়েকটি পদ্মপাত দেখা যায়, অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি ময়ূর।

দরজার মাথার ওপরেও একটি ছবি, তবে এটি একটি ফটো। ছবিটির বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে সময়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে সর্বাঙ্গে। কাঠের ফ্রেমের রং বা পালিশ বহু পূর্বেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, কাঁচের ওপর একটা পুরু ময়লার আস্তরণ পড়েছে।

ফটোটি স্ত্রীলোকের কিংবা পুরুষের তা বুঝতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

এর সঙ্গে অপর্ণার চীৎকার, ছড়া সংযোগে ঝগড়া, অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি, পাওনাদারদের সঙ্গে কচলা-কচলি, ছেলেমেয়েদের মারপিট এবং অকালপক্কতা—সব মিলিয়ে যে নরকের দৃশ্যটি দেখা যায় মহাকবি দান্তেও

তা কল্পনা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ! অপর্ণা কি করছে কে জানে! টুকুনের ল্যাকটোজেন কিনে নিয়ে আসা হয় নি। যা কাণ্ড করে দিনরাত, কোন্ মানুষের কি মনে থাকে? দোকানের ভুবন সাহাকে অবশ্য বলাই আছে, বাড়ীতে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের কথা, বাজার বোধ হয় বাসন-মাজা ঝিটাকে দিয়েই চালিয়ে নেবে। কিন্তু একটা মুশকিল, গত তিন মাসের ঝিয়ের মাইনে ছ-টাকা হিসাবে আঠারো টাকা এখনও দেওয়া হয় নি। দোকান নমিতাই করতে পারবে। চোদ্দ-পনর বছর বয়স কিন্তু পাকিয়ে গিয়েছে, ভাল খাদ্যের অভাবে থেমে গিয়েছে তার কৈশোরের বৃদ্ধি। এক রকম ভালই, ফ্রক পরিয়ে বেশ কিছুদিন খুকী সাজিয়ে রাখা যাবে, সবিতার মত বাড়ন্ত গড়ন হলেই তো চিত্তির। সবিতার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে—ভাবল ধীরেন ভড়। কিছু টাকা যোগাড় না করতে পারলে আর ভদ্রস্থতা নেই। চিন্তা করতে করতে ধীরেন ভড় এগিয়ে চলল স্থনীল রায়ের সঙ্গে দেখা করতে, স্থনীল রায় যদি মেয়েটাকে বাগাতে পারে তা হলে একটা হিল্লে হয়।

কি ব্যাপার? স্থনীল রায় বেরিয়ে এল কামরা থেকে। ধীরেন ভড়কে দেখে সে খুশী হয় নি।

একটা জবর খবর আছে ব্রাদার।

কি বল তো?

একটা মেয়ে আমাদের কম্পার্টমেণ্টে রয়েছে, অদ্ভুত। আধবোজা চোখের একটা সরস ইঙ্গিত করল ধীরেন ভড়।

তুমি নতুন মেয়ে দেখলেই তো অদ্ভুত বল।

না না স্থনীল, এ রকম ফিল্ম ফেস এতদিনে একটাও দেখি নি, মাইরি বলছি, যদি বাগাতে পার তা হলে কেল্লা ফতে! কিছুদিন মৌজ করতে পারি। চল ভাই একবার।

এদিকে সামলাবে কে? ইশারায় স্থনীল রায় হাসনুর দিকে দেখালে।

ছাড়পত্র নিয়ে এস না বাবা, কতক্ষণ আর লাগবে। এ রকম জিনিস হাতছাড়া করতে মায়া লাগছে ভাই। ধীরেন ভড়ের গলার স্বর যেন বেদনায় ভারী হয়ে গেল। স্থনীল রায় অনুমতি নিতে ফিরে গেল হাসনুর কাছে, তারপর ধীরেন ভড়ের সঙ্গে চলল।

কেট্ ডগলাসও প্ল্যাটফরমে নেমে এগিয়ে চলল ইঞ্জিনটার দিকে। কেট্ খুব খুশী হয়েছে, সাডুজীর দয়ায় আবার তার শান্তি ফিরে আসবে। রবার্টকেও খবরটা জানাতে হবে, রবার্টও খুশী হবে নিশ্চয়ই। আবার সেই আকুলতাভরা সুন্দর সজীবতা ফিরে আসবে তাদের জীবনে।

নানুভাই দেশাই ভাবছেন তাঁর নিজের কথা। সুদূর গুর্জর দেশ থেকে যখন এই বাংলাদেশে বাবার সঙ্গে আসেন তখন তাঁর বয়স বছর বারো হবে। বড়বাজারে তাঁদের বাসনের দোকান ছিল। হ্যারিসন রোডের প্রান্তে ছোট বাসনের দোকান। ঝকঝকে সাদা পালিশ করা গেলাস, থালা, ডেকচি, হাঁড়ি থেকে সুরু করে টিফিন কেরিয়ার মায় চামচ পর্যন্ত। সামনে একটা ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা ঝোলান। খরিদ্দারের পছন্দমত বাসন ওই পাল্লাতে ওজন করে সের হিসাবে দাম ঠিক করে বলতে হয়। ঝক্‌ঝকে বাসনগুলো নাড়াচাড়া করতে নানুভাইয়ের বেশ ভাল লাগত, টাকাপয়সা হিসাব করতেন ওঁর বাবা জীবনলাল দেশাই। বাবাকে মনে আছে নানু-ভাইয়ের, মাথার চুলগুলো পেকে গিয়েছিল, কিন্তু শরীর বেশ শক্ত ছিল। রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পূজো করতেন তিনি। বেশ শান্ত প্রকৃতির ধর্মভীরু লোক ছিলেন জীবনলাল। অপূর্ব নিষ্ঠা ছিল তাঁর— কি ধর্মবিষয়ে, কি বৈষয়িক ব্যাপারে, কি ব্যবসায়ে। প্রত্যেকটি কাজই নিয়মিত ভাবে পরিপূর্ণ শক্তিতে করতেন তিনি। 'দিনগত পাপক্ষয়' গোছের ভাব ছিল না। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে ফলপ্রসূ করার সার্থকতা তিনি নানুভাইকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার নামই যে বাঁচা সে কথাও ছোটবেলা থেকে নানুভাই শিখেছিলেন। এখনও সেই মূলমন্ত্রই নানুভাইয়ের জীবনের ধ্রুবতারা বলা চলে। তারপর কত উত্থানপতনই যে তাঁর জীবনে এসেছে তার হিসাব রাখা শক্ত। বাবা মারা যাবার পর বাসনের দোকান তুলে দিতে হল নানুভাইকে, জীবনলালের দান এবং দেনা দুই-ই তার জন্যে দায়ী। গামছা কাঁধে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে নানুভাই তাঁর নিজস্ব ব্যবসা সুরু করেছিলেন। তারপর এক এক করে কত জিনিসই যে কেনাবেচা আরম্ভ করলেন তার সমস্ত কথা এখন আর নানুভাইয়ের মনেই নেই। একদিন লক্ষ্মী প্রসন্না হলেন। এক-একটা বালু জমতে জমতে বিরাট

পাহাড় হল, ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে এখন বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। দিনের পর দিন তিনি সঞ্চিত করে এসেছেন প্রচুর ঐশ্বর্য আর মেদ। ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর স্ফীত উদরের প্রতিযোগিতায় কাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায় তা নির্ধারণ করা শক্ত। বহুদিন পূর্বেই বড়বাজারের একটা নোংরা গলিতে ততোধিক নোংরা পরিবেশে নান্নুভাই তাঁর সংসার পেতেছিলেন, এখনও সেই-খানেই বসবাস করেন তিনি, ব্যবসায়ের সুবিধা হয় অনেক, কারণ বাসার নিচেই তাঁর গদি আছে। অবশ্য আধুনিক রুচিসম্মত আপিসও ডালহৌসী স্কোয়ারে আছে। বড়বাজারের গদি আর ডালহৌসী স্কোয়ারের আপিস দুটোরই পৃথক কার্যকারিতা আছে, দুটোই সমভাবে লাভজনক। অন্য কয়েক জায়গায়ও তাঁর বাড়ী আছে, সেগুলো ভাড়া দিয়েছেন—অবশ্য একটি বাদে, সেটা হল পানিহাটির বাগানবাড়ী—দেশাই লজ। বাড়ীটা দেখবার মত—প্রকাণ্ড লন, মাঝে একটা ফোয়ারা, এক কোণে মালীর ঘর, সামনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রকাণ্ড হল, তার চার পাশে চারটে ঘর। হলঘরের সজ্জাটা অসাধারণ, সমস্ত মেঝে জুড়ে মোটা কার্পেট বিছানো, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লাল ভেলভেটের তাকিয়া। প্রত্যেক দেওয়ালে প্রকাণ্ড আয়না টাঙানো—বিভিন্ন আকৃতির সেগুলো, কোনটা লম্বা কোনটা বা গোল। মেঝের যে-কোন অংশ যে-কোন অবস্থাতেই ছায়া প্রতিফলিত হবে আয়নার উপরে। শিলিঙে আগেকার ধরনের কয়েকটি ঝাড় টাঙানো, কিন্তু ভেতরে রয়েছে ইলেকট্রিক বাল্ব। দরজার গায়ে মোটা ভারী পর্দা ঝোলান। দেশাই লজ নান্নুভাইয়ের প্রমোদ ভবন। অবসর সময় চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন। মাসের মধ্যে দু-একটি শনিবারে দেশাই লজে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম হয়। বিভিন্ন আমোদপ্রমোদের মধ্যে ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনদেনও সম্পন্ন হয়ে থাকে। মনোরম পরিবেশ মনকে যে দরাজ করে এ সংবাদ নান্নুভাই রাখেন।

নান্নুভাই সতৃষ্ণ নয়নে এষার দিকে আর একবার তাকালেন। টাকায় সব জিনিসই কেনা যায় একথা নান্নুভাই বিশ্বাস করেন। তাঁর জীবনে কয়েকবারই সে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে।

মনে পড়ল কয়েক বৎসর আগের কথা, একটা মেয়ের ব্যাপারে বেশ জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পানিহাটিতে দেশাই লজে মেয়েটিকে আনা হয়েছিল। মেয়েরটির নাম ছিল কৃষ্ণা, সে দুর্যোগের রাত্রের কথা মনে পড়ল নান্নুভাইয়ের। সে রাত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ছিল দেশাই লজে। বেশ কিছু খরচ হয়েছিল নান্নুভাইয়ের, শুধু মেয়েটাকে বাগাতেই হাজারখানেক দিতে হয়েছিল। কৃষ্ণা নিজে হাত পেতে টাকাটা নিয়েছিল মনে আছে।

বলেছিল এত কম? কৃষ্ণা যেন আশ্চর্য হয়েছিল।

হাজার টাকা কম হল, বল কি? আমি তো এর আগে একশ' দেড়শ'র বেশী দিই নি।

নান্নুভাই মিথ্যা বলেন নি, তবে একথাও ঠিক—সে এ ধরনের মেয়ে নয়—তারা সাধারণ মনোরঞ্জনকারিণীদের দলেই পড়ে।

বেশ তাই দিন। হাত পেতে টাকাটা নিলে কৃষ্ণা, তারপর বললে, কখন আসবেন তাঁরা?

রায়বাহাদুর আসবেন সাতটার সময়, তারপর স্যার দেবীপ্রসাদ, সেনসাহেব, মুখার্জী সাহেব—সব একে একে আসবেন, সেই নাচটা হবে তো? বিগলিত ভাবে বললেন নান্নুভাই।

হ্যাঁ হবে বৈকি, নাচগান সব হবে। টাকাটা নিয়ে কৃষ্ণা ধীরেন ভড়ের হাতে দিয়ে বলল, আমার বাবাকে পৌঁছে দিন, পারবেন তো?

হ্যাঁ, তা পারব বৈকি।

বাবার হাতের একটা রসিদও নিয়ে আসবেন।

ঘণ্টাখানেক পর ধীরেন ভড় ফিরে এল রসিদ নিয়ে, কৃষ্ণা বাবার হাতের লেখা রসিদটা ভাল করে দেখে নিল। হ্যাঁ, বাবার হাতের লেখাই বটে। বাসকসজ্জা সম্পূর্ণ করতে গেল সে।

নান্নুভাই দু-হাত কচলে ধীরেন ভড়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললে, টাকাটা দিয়েছ তো? না নিজে মেরেছ?

না না, কি যে বলেন, ওর বাবা হল গিয়ে আমার বিশেষ জানাশোনা।

ও তাই নাকি? তা বেশ—হ্যাঁ দেখ তো একবার হলঘরে গিয়ে সব রেডি কিনা।

ধীরেন ভড় হলঘর পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এল, সব ঠিক আছে রিপোর্ট দিল সে।

মুসা এসেছে ?

না, কৈ মুসাকে তো দেখলাম না—

দেখলাম না। —ভেংচি কাটলেন নান্নুভাই, তা হলে ককটেল করবে কে—তুমি ? যাও—গাড়ী পাঠিয়ে দাও—কোন কাজ যদি তোমার দ্বারা হয়—আর হ্যাঁ শোন—

থমকে দাঁড়াল ধীরেন ভড়।

রান্নাঘরেও অমনি দেখে এস—

ধীরেন ভড় দ্রুত রান্নাঘরের দিকে গেল, কিরে লতিফ তোদের হল ?

হ্যাঁ বাবু, আমরা রেডি।

ওটা কিরে ?

চিকেন রোস্ট, একটু দেখবেন নাকি ?

দে একটু চেখে দেখি। একটা প্লেটে একটু মাংস দিলে লতিফ।

নিন, দেখুন টেস্ট করে।

ধীরেন ভড় ধীরে ধীরে খাচ্ছে। মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে লতিফ। ধীরেন ভড়ের মন্তব্য শুনতে সে উৎসুক।

কি রকম হয়েছে বাবু ? জিজ্ঞাসা করল সে।

ভালই ! তবে কি রকম একটু যেন গন্ধ লাগছে।

হুঁ। কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লতিফ। তার সহকারী ইসাককে বলল, কিরে ইসাক, তখন বলি নি আমি যে অতটা পিঁয়াজ দিস না, দেখ এখন সাহেবরা কি বলেন।

খেতে খারাপ হয়েছে নাকি বাবু ?

না, খেতে ভালই হয়েছে।

আমতা আমতা করে বললে ধীরেন ভড়। নমুনা হিসাবে রোস্টের পরিমাণ এত অকিঞ্চিৎকর ছিল তাতে কোন কারণেই রন্ধনকারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা চলে না। রুমালে হাত মুছে ধীরেন ভড় ককটেলবিশারদ মুসার সন্ধানে চলল।

কি ওস্তাদ, রোস্টে অন্য কিছু দেবে নাকি ? ইসাক জিজ্ঞাসা করল।

দূর, মাথা খারাপ নাকি, ও বাবু জীবনে কখনও রোস্ট খেয়েছে ? এই দু-একবার যা পেসাদ পায়। উত্তর দিলে লতিফ, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল ওরা।

ধীরেন ভড় ফিরে গেল নান্নুভাইয়ের ঘরে। নান্নুভাই ইতিমধ্যে পোশাক পালটেছেন। গিলে-করা পাঞ্জাবি, চুনোট-করা ধুতি, হীরের আংটি ও বোতাম, গলায় সোনালী রঙের জরীর কাজ করা চাদর রয়েছে তাঁর অঙ্গে। সযত্নে আতর মাখছেন নান্নুভাই গোঁফে, কানে, গলায় তলার। অতঃপর হাতটা সোনালী চাদরের ওপর মুছলেন তিনি। নান্নুভাই বড় খুশী হয়েছেন, সুগন্ধি ও সুন্দর কাপড় মানুষকে প্রফুল্ল করে একথা তিনি স্বীকার করেন।

কি হে? হাসিমুখে তাকালেন তিনি ধীরেন ভড়ের দিকে।

মুসা তো এসে গিয়েছে। বললে ধীরেন ভড়।

হ্যাঁ, সে খবর আধ ঘণ্টা আগে পেয়েছি। এতক্ষণ কি করছিলে?

এই মানে চারিদিক দেখে এলাম। তাড়াতাড়ি কথাটা বললে ধীরেন ভড়।

তোমার পাঞ্জাবির ওপর মাংসের ঝোলের দাগ পড়েছে। ওটা ধুয়ে ফেল, খারাপ দেখাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখল পাঞ্জাবির দিকে ধীরেন ভড়—ইস, সত্যিই তো! লতিফ কৃত ফাউল রোস্টের এক টুকরো হয়তো তার অজান্তে কোন্ সময়ে জামায় পড়ে থাকবে। অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ধীরেন ভড়।

পোর্টিকোতে রায়বাহাদুরের ক্যাডিলাক এসে গিয়েছে, নান্নুভাই ছুটলেন চাদর সামলাতে সামলাতে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। একে একে সকলেই এলেন—স্যার দেবীপ্রসাদ, সেনসাহেব, মুখার্জিসাহেব, মিত্রা দেবী, আবদুল হাফেজভাই, বিশ্বনাথ আঢ্য, ডাক্তার ব্যানার্জি, কুমারস্বামী, লেডী কর্মকার কেউ বাদ নেই, একেবারে জমজমাট ব্যাপার। কয়েকবার ককটেল দেওয়া হল, পান-সিগারেট-চুরুট চলতে লাগল সমানে।

রায়বাহাদুর বললেন, দেশাই আর একটা কি যেন প্রমিস করেছিল।

ও হ্যাঁ, এইবার হবে, এ রকম নাচ আপনি দেখেন নি রায়বাহাদুর—

তাই নাকি? রায়বাহাদুরের গালটা যেন শিরশির করে উঠল।

তবে আর বিলম্ব কেন? কি বল হাফেজভাই।

বিশ্বনাথ আঢ্য লোহার ব্যবসা করলেও মনটা নরম, অনেক কালচারাল এসোসিয়েশনে সভাপতিত্ব করেছেন, সুতরাং চারুকলার যোগ্য সমাজদার তিনি।

হাফেজভাই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললে, জরুর।

ধীরেন! নান্নুভাই ডাকলেন।

ধীরেন এসে দাঁড়াল।

একবার খবর দাও কৃষ্ণাকে, আর কতক্ষণ ধরে সাজবে? ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নান্নুভাই।

নাচ এবং সাজ দুটোই ভাল হওয়া চাই দেশাই। মন্তব্য করলেন সেনসাহেব।

দেখুন—তার পরে বলবেন। নান্নুভাই হাত কচলালেন।

ধীরেন ভড় কৃষ্ণাকে ডাকতে চলল।

নান্নুভাই ঠিকই বলেছিলেন, কৃষ্ণা সাজছিল, অনেকক্ষণ ধরে যত্নসহকারে মনোহর বেশে সেজেছিল সে।

নাচতে সে খুবই ভাল জানে, আর শুধু নাচ কেন, সুন্দর চেহারার জন্য খাতিও তার কম নয়! কিন্তু অর্থের অভাব তাদের সংসারে। তিনটি ছোট ভাই, উপার্জনহীন বৃদ্ধ বাবা। তার সৌন্দর্যের আর দেহের চাহিদাও কম নয়, তা সে জানে। আশপাশের পাড়াপড়শী থেকে সুরু করে আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত সকলেই সাহায্য করতে উন্মুখ, তার বদলে যে দাম তারা দিতে চায় সেটা কিন্তু সামান্য, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং নীলামে চড়াতে হল তার দেহ-সুষমাকে। দেশাই সর্বোচ্চ দাম দিয়েছেন সুতরাং—

ধীরেন ভড় দরজায় টোকা মারল। হাসি হাসি মুখ তার, বিচারকদের কাছে কৃষ্ণাকে হাজির করে আবিষ্কারক হিসাবে বাহাদুরী নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে তার। আবার জোরে কড়া নাড়ল—কড়াটা বেশ জোরে জোরেই নাড়ল। না হাসি মিলিয়ে গিয়েছে ধীরেন ভড়ের।

কি হল কৃষ্ণা? এস, সকলেই এসে গিয়েছে যে—

সকাতরে অনুনয় করল ধীরেন ভড়, কোন সাড়া নেই। ব্যস্ত হয়ে হলঘরে ফিরে গেল ধীরেন ভড়, নান্নুভাইয়ের কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, কৃষ্ণা সাড়া দিচ্ছে না—

সে কি?

হ্যাঁ।

চল।

নান্নুভাই ও ধীরেন ভড় কৃষ্ণার ঘরে গেল, অনেক চেষ্টা করা হল, কৃষ্ণা কিন্তু দরজাও খুলল না, সাড়াও দিল না। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে দেখা গেল, কৃষ্ণা শুয়ে আছে। সাপের মত বেণী, ফুলের মালা দিয়ে জড়ান একপাশে

ঝুলছে। পাতলা বেনারসী শাড়ী, ঘন লাল রঙের ব্লাউজ, পায়ে নূপুর, হাতে বাবার দেওয়া রসিদটা। কৃষ্ণা বিষ খেয়ে মরেছে।

অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম মেয়েছেলে! দাঁতে দাঁত দিয়ে চাপালেন নান্নুভাই। অনেকগুলো টাকা নিয়েছে, আরও যাবে ওই একটা মেয়েছেলের জন্যে। নান্নু-ভাইয়ের দেহ বিফল আক্রোশে আর ভয়ে অবশ হয়ে গেল।

বরাত জোরে রায়বাহাদুর আর শ্যার দেবীপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন, তাই কোন রকমে জিনিসটা ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

নান্নুভাইয়ের মনে পড়ল সে সময় কি দুশ্চিন্তায়, অনিদ্রায় না তাঁর দিন কেটেছিল! পুলিসের ঝঞ্ঝাট তো বটেই, তা ছাড়া তাঁকে বেশ কিছু টাকাও অপব্যয় করতে হয়েছিল।

কৃষ্ণা মেয়েটা অনেকটা এই ধরনের ছিল বলেই মনে হল। তাড়াতাড়ি দৃষ্টিটা এষার দিক থেকে ফিরিয়ে নিলেন নান্নুভাই।

ব্রজেশ্বর ব্যানার্জি একটু চিন্তিত হয়েছিলেন, হবারই কথা। বাসদেও শর্মাকে না পাঠিয়ে বিজয়কে স্বামিজীবেশী নানাকুর মত দুর্ধর্ষ ডাকাতের কাছে পাঠিয়ে ভুল করলেন কিনা তাই চিন্তা করছিলেন তিনি। যদি কোন প্রকারে নানকু জানতে পারে যে, বিজয় তার পিছু নিয়েছে তা হলে তাকে ধরতে রীতিমত বেগ পেতে হবে।

চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ব্রজেশ্বরবাবু। এবার যেন একটু ঠাণ্ডা লাগছে তাঁর। সারেংহাটি স্টেশনে টেলিগ্রাফ করেছেন ব্রজেশ্বরবাবু, সেই সঙ্গে কলকাতায় সেন সাহেবকেও খবরটা জানিয়ে রেখেছেন। এসব কাজে তাঁর কোনদিনই খুঁত থাকে না। এখন ভালয় ভালয় জালটা গুটিয়ে তুলতে পারলে হয়। ব্যাপারটা মিটে গেলে তারপর বাড়ী যেতে পারলে বাঁচেন তিনি। বুড়ী মানে কল্যাণীর বিয়ের কথাটা যদি নৃপেশ ডাক্তারেব ভাইয়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে যায় তা হলে মাসখানেক ছুটিব জন্যে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিতে হবে। বলা যায় না, কোন সময়ে আবার এই রকম ঝামেলা এসে পড়তে পারে। মেয়ে সম্প্রদান করার সময় তিনি তো আর সে সব ছেড়ে, চোর-জোচ্চোরের পিছু ধাওয়া করতে পারবেন না। বেআক্কেলে ওপরওয়াদের কাছ থেকে সে সময়ে ও ধরনের আদেশ পেলেও আশ্চর্য হবেন না তিনি! বুড়ীর বিয়ের ব্যাপারে তাঁকে নিজেই সব করে নিতে হবে—তিনি ছাড়া অন্য লোক কোথায়? তাঁর

এক শ্যালক অবশ্য আছে, তবে সে ভালোর চেয়ে খারাপই করতে পারে বেশী। বি-এ পর্যন্ত পড়ে তিনি গায়ক হয়েছেন। আধুনিক গায়কদের মধ্যে নাকি নাম আছে তাঁর। বুড়ী তো মামার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ।

ব্রজেশ্বরবাবুও শুনেছেন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তাঁর ভাল লাগে নি। যেমন গানের কথা তেমনি গানের সুর। দুনিয়ায় যত রকম ফুল আছে এক এক করে তার নাম উচ্চারণ, তৎসঙ্গে নীল আকাশ, পাহাড়, নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ক নানা অবাস্তব কথা আর পরিবেশে 'তোমায় আমায় আবার দেখা হবে' ইত্যাকারের স্তোক দেওয়া। সুরও তথৈবচ। আজকাল সুবকারেরা চালাক হয়েছেন, আধুনিক গানে তাঁরা মামুলী সুর সংযোজনা করেন না, পাঁচ-মিশেলী করে দেন। ইংরেজী রেকর্ড থেকে নকল করে, দেশী ছাঁচে ফেলে সেটা চালিয়ে দেন। তাল, লয় সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ ওয়াকিবহাল তা নয়, তবে তাঁর মনে হয় ও জিনিসের বেওয়াজটা উঠে গিয়েছে। শ্রুত, অশ্রুত নানারকম যন্ত্র সহযোগে যে যত অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারেন তাব মিউজিক তত নাকি বাহবা পায়।

সে যাই হোক, বুড়ীর বিয়ের ব্যাপারে শ্যালক মহাশয়ের হাতে কোন কাজের ভার দিলে বিপদ অনিবার্য, তার প্রমাণ তিনি আগেই পেয়েছেন। আরামবাগে তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধের সময় এই শালাবাবুকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন বাজার করতে। বাজার অবশ্য পৌছেছিল কিন্তু কাজের একদিন পরে। কোন রকমে অবশ্য ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন ব্রজেশ্বরবাবু, পরে শোনা গেল শালাবাবু নাকি নির্দিষ্ট দিনটা ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর সেদিন রেডিওতে সিটিং ছিল কিনা সেই জন্য। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে তাঁর, আজকালকার ছেলেদের এই রকম চরিত্রের শিথিলতা দেখে। তাঁর ছেলে নেই এক পক্ষে ভালই হয়েছে। গুণধর মাতুলের মত ওই রকম গায়ক হলেই তো চক্ষুস্থির হয়ে যেত। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল, তা ছাড়া ছেলে হলে ঝামেলার ঠেলায় অস্থির হতে হত। তার চেয়ে এই বেশ, মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই ব্যাস, হাঙ্গামা মিটে গেল। ব্রজেশ্বরবাবু দু-খিলি পান মুখে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তির একটা নিশ্বাস পড়ল তাঁর।

ধীরেন ভড় সুনীল রায়কে নিয়ে বীরদর্পে ফিরে এল। একটা নতুন আয়ের পন্থা পাওয়া গেল বলে মনে মনে সে খুব খুশী।

সুনীল রায় কামরায় ঢুকে এষাকে লক্ষ্য করে চীৎকার করল, এষা তুমি ?

সুনীলদা আপনি ?

দু-জনেই অবাক হয়ে গিয়েছে। একেবারে এষার পাশে গিয়ে বসল সুনীল রায়।

কোথায় যাচ্ছ ? প্রশ্ন করল সুনীল।

চাকরি করতে।

সে কি ?

কেন অবাক হবার কি আছে ? উত্তর দেয় এষা।

তা ঠিক, অবাক আর কিছুতেই হওয়া উচিত নয়—

কেন ?

তুমি যে এ ট্রেনেই যাচ্ছ তা আমার ধারণাই ছিল না।

এখন এষার ভাল লাগছে, অনেকক্ষণ একলা চুপ করে বসেছিল সে। সুনীলদা আসতে তার মনের অবশ ভাবটা কেটে গিয়েছে। এতক্ষণ গুমোট নিঃসঙ্গতায় হাঁফিয়ে উঠেছিল এষা। অনেক সময় সে লক্ষ্য করেছে সঙ্গীরা অকারণে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। হয় তো কোন দোষ নেই, ত্রুটিবিচ্যুতিও নেই অথচ সঙ্গটা বিষবৎ লাগে। পাশের পেটুক ভদ্রলোক বা ওদিকের বসা মাড়োয়ারী ভদ্রলোক কিংবা লাল হরিণমার্কা জামাপরা টেকো ভদ্রলোক তার কোনই ক্ষতি করে নি, কোন অসঙ্গত ব্যবহারও করে নি, কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছিল আর কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে থাকলে হয় তো ওর দমবন্ধ হয়ে যেত। এষা জানে কয়েকজন লোক আছে তাদের দেখলেই মনটা বিষিয়ে ওঠে আবার কেউ কেউ আছে তাদের প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে, আর ভাল না লাগলেও মনে এ ধরনের বিদ্রোহের ভাবটা নিশ্চয়ই আসে না।

সুনীলেরও ভাল লাগছে, হঠাৎ যেন স্বাভাবিক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে। হাসনুর কাছে নিজের সত্তাকে লুকিয়ে যেন শুধু দেঁতো হাসিই হেসেছে এতক্ষণ, সে হাসির মধ্যে প্রাণ ছিল না। সান্নিধ্যে উত্তেজনা ছিল সত্যি, কিন্তু মাধুর্য ছিল না। স্নায়ু অবশ করার সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদনা ছিল হয় তো কিন্তু দীপালোকে কোমলতা ছিল না। আর একটা সত্য সুনীল রায়ের কাছে প্রকট হয়ে উঠল। উদ্বেগজনিত পরিস্থিতি, মানসিক অশান্তি, একটানা উত্তেজনা, এতদিনের অস্বাভাবিক জীবনের অসারতা হঠাৎ তার কাছে যেন মূর্ত হয়ে

উঠল। সুনীল রায় যেন বিপদজনক ভাবে একটা গিরিবর্ত্মের একধারে এসে পড়েছে, নিচের খাদের ঘন অন্ধকার আর ভয়াবহ গভীরতাটা আচম্বিতে তার কাছে যেন প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিভিন্নমুখী দুটো নারীর মন আর পরিবেশ সুনীল রায়ের নিজের মনকে চিনিয়ে দিলে যেন!

কি ভাবছেন সুনীলদা। এষা জিজ্ঞাসা করল সুনীল রায়কে।

ভাবছি এষা, এতদিন কি করেছি।

তার মানে?

একটা সাংঘাতিক সত্যের মুখোমুখি এসে পড়েছি।

সাংঘাতিক সত্য?

হ্যাঁ, সত্যের অজানা ভিন্ন রূপটা প্রকট হলে কোন কোন সময় সাংঘাতিক মনে হয় বৈকি।

হঠাৎ এষার মনে পড়ে গেল, মালতীদির কথা। এই লোকটাই তার স্নেহের বোনটিকে আঘাত দিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে—তার আদরের হাস্যমুখী স্নেহময়ী মালতীদি। রাগে, দুঃখে, অপমানে এষার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল। চোখ জলে ভরে এল তার, মুখ ফিরিয়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে।

এষা! ডাকল সুনীল রায়।

উঁ।

আমার ভুল কি আমি শোধরাতে পারি না? সুনীল রায়ের কণ্ঠস্বরে আকুলতা ফুটে উঠেছে অকস্মাৎ।

এষা তাকিয়ে দেখলে সুনীলের দিকে, তার পর প্রশ্ন করল, কি হয়েছে সুনীলদা?

ওই তো বললাম—

কিন্তু একথা কি আগে কোনদিন ভাবেন নি?

হ্যাঁ ভেবেছি, কিন্তু ভুল করছি বলে তো মনে হয় নি, এমনকি এই কামরায় ঢোকবার আগের মুহূর্তেও মনের কোন পরিবর্তন হয় নি আমার।

তবে অনুশোচনায় পরিবর্তন হল নাকি? এষার কথায় শ্লেষের আভাস রয়েছে।

না, অনুশোচনা নয়। যখনই এ ধরনের কাজ করেছি উন্মুক্ত মন নিয়েই

করেছি। তুমি বোধ হয় জান না, এটা শুধু আমার নেশা নয়, পেশাও বটে।

অবাক হল এষা, বলল—পেশা?

হ্যাঁ, কিন্তু সে পেশার পিছনে যে একটা ভীষণ আত্মঘাতী পরিণতি আছে সেটা আগে কোনদিন অনুভব করিনি, এমনকি বিশ্বাসও করি নি। হাস্যকর নীতিবোধকে অবহেলাই করেছি সুখ আর সম্ভোগের পরিপন্থী বলে। এর সঙ্গে কোনদিন সত্যের এত স্পষ্ট রূপটা ধরা পড়ে নি আমার কাছে।

তা হলে বোধ হয় ভয় পেয়েছেন সুনীলদা। এষার ব্যঙ্গটা এবারে সুস্পষ্ট।

হ্যাঁ, তা পেয়েছি। পাল্লার একদিকে ভার চাপিয়ে তাকিয়ে খুশী হয়েছিলাম এতদিন, অপর পাল্লাটার ওপর নজরই পড়ে নি। সেটা যে আপেক্ষিক লঘুত্বের জন্য অকেজো হয়ে গিয়েছে কিংবা গোটা দাঁড়িপাল্লাটাই যে হুড়মুড় করে একদিন ভেঙে পড়বে এ সম্ভাবনার কথা আগে মনে আসে নি—তা ছাড়া এ শুধু ভয় নয় এষা, তোমার আর হাসনুর মধ্যে বিরাট পার্থক্যটাও হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। নিজের মনের কথাটা বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল সুনীল রায়।

হাসনু কে সুনীলদা?

ফিল্মের শ্রীলেখা দেবী, তাকে নিয়ে পালাচ্ছিলাম।

সে কি?

শুধু তাই নয়, আপিসের সত্তর হাজার টাকাও আত্মসাৎ করেছি সেই সঙ্গে!

সুনীলদা! অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করে উঠল এষা।

ভয় পেও না এষা।

তা হলে কি হবে?

আর্তস্বরে প্রশ্ন করল এষা, সুনীল রায় হাসল। বলল, কেন ভালই তো হবে, এতদিনে তোমাদের দুঃখের অবসান হবে, দুর্বৃত্তের দমন হবে। কিন্তু তার জন্যে আমি চিন্তিত নই—আমি ভাবছি মালতীর কথা। আবার হাসল সুনীল রায়, তুমি বোধ হয় আমার সুবুদ্ধির আকস্মিক আগমনে আশ্চর্য হচ্ছ?

মনের পরিবর্তনের কথা এখন কি করে বুঝব?

সারেংহাটি স্টেশনের পুলিসের কাছে সারেণ্ডার করার পর হয় তো বুঝতে পারবে।

সে কি? চমকে উঠল এষা।

এটার দরকার আছে এষা, জিনিসটা শেষ করতে চাই তাড়াতাড়ি।

না। দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে এষা, কর্তৃত্বের ভার আর দায়িত্ব নিল সে।

কেন ?

আমায় আগে ভাল করে বুঝতে দিন ব্যাপারটা।

বোঝবার কি আছে, আপিসের টাকা চুরি করে পালাচ্ছি আর সঙ্গে রয়েছে ফিল্‌ম্‌-স্টার শ্রীলেখা—এতো খুব সহজ ব্যাপার। কথাটা বলে স্থনীল রায় তাকাল এষার দিকে।

তা হোক, আপনি এখন কিছু করতে পারবেন না। আদেশ করল এষা।

তবে কি করব বল ?

সারেংহাটি স্টেশনে আমরা দুজনাই নেমে যাব।

তার পর ?

তার পর টেলিগ্রাম করব, কলকাতা পুলিসের অনিল সেনকে। তার আগে আপনি এ গাড়ী থেকে যেতে পারবেন না।

বেশ তাই হবে।

ভাল হয়ে বসল স্থনীল রায়, সমস্ত জিনিসটার যেন মীমাংসা হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সব অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হল। স্থনীল রায়ের মাংসপেশী আর স্নায়ুতন্ত্রী কঠিন নিষ্পেষণ থেকে সহসা যেন মুক্তি পেয়েছে, বেশ হালকা লাগছে তার—ঠিক যেন মুক্ত হাওয়ার মত হালকা, মনের মধ্যে যে তুফানের সৃষ্টি হয়েছিল, এতক্ষণে সেটা যেন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। একটা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক চাপ পড়েছিল তার স্নায়ুর ওপর, এবার সেটার তীব্রতা অনেক কমে গিয়েছে। বিভিন্ন উত্তেজনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার শক্তি যেন নিঃশেস হয়ে গিয়েছিল, এবার যেন ফিরে আসছে মনের সজীবতা। হঠাৎ নজর পড়ল ওধারে বসা ধীরেন ভড়ের ওপর। ধীরেন ভড় তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে তাদের দিকে।

স্থনীল রায়ের সঙ্গে মেয়েটার আলাপ আছে দেখে খুশীই হল ধীরেন ভড়। ট্রেনের শব্দে ওদের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না বটে, তবে এককালে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে মনে হল। যাক, মেয়েটাকে তা হলে বাগানো যাবে—আত্ম-প্রীতিতে মনটা ভরে উঠল তার। ইশারায় স্থনীল রায় ধীরেন ভড়কে ডাকল।

মৃদু আপত্তির স্থরে অস্পষ্টভাবে এষা বলে উঠল—ওঁকে আবার ডাকছেন কেন ?

তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে।

লোকটা কিন্তু ভাল নয়।

কেন ?

না, কোন কারণ নেই, তবু যেন ভাল লাগছে না—

ধীরেন ভড় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

ইনিই হচ্ছেন বিখ্যাত ধীরেন ভড়, দেশাই কোম্পানীর ফিল্‌ম্ ডাইরেক্টর। পরিচয় করিয়ে দিলে সুনীল রায়।

নমস্কার। বিগলিত ভাবে বললে ধীরেন ভড়।

আর ইনি এষা চৌধুরী, আমার একমাত্র শ্যালিকা।

সুনীল রায় আলতো ভাবে শেষের কথাটা উচ্চারণ করলে।

অ্যাঁ! ধীরেন ভড় যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

হ্যাঁ। আবার সুনীল রায় বললে, আমার একমাত্র এবং নিজস্ব শ্যালিকা।

অঃ! ধীরেন ভড় এতক্ষণে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু বিস্ময়-প্রসূত মুখের 'হাঁ'টা এখনও বন্ধ হয় নি।—ইয়ে, আলাপ করে খুশীই হলাম। অবশেষে আমতা আমতা করে বললে ধীরেন ভড়, তাড়াতাড়ি ফিরে গেল সে নিজের জায়গায়।

বেলুনটা চুপসে গেল। এষার দিকে তাকিয়ে সুনীল রায় ধীরে ধীরে বললে। এতক্ষণে বোধ হয় সুনীল রায়ের মনের স্বাচ্ছন্দ্যটা ফিরে এসেছে।

সে আবার কি ? রহস্যটা বুঝতে পারে না এষা।

আছে, পরে বলব। কারণটা ঠিক প্রকাশযোগ্য নয় বলে চুপ করে গেল সুনীল রায়।

সুনীল রায় ও এষার পাশে বসে রয়েছেন ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ওদের কথোপকথনের কিছুটা অংশ কানে গিয়েছে তাঁর। তাজ্জব ব্যাপার! পাশের মেয়েটি যে ওই চোরটার শ্যালিকা তা তিনি ধারণাই করতে পারেন নি, আরও আশ্চর্যের কথা হল, তারা যে একই ট্রেনে ভ্রমণ করছে পরস্পর তাও জানে না। সুনীল রায় অবশ্য ঘটা করে সকলকে জানিয়ে আসতে পারে না, কারণ পলায়নটা যত গোপনে হয় ততই তার পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু লোকটা এ কম্পার্টমেণ্টে আসায় একটু বিপদ হল তার। ব্রজেশ্বরবাবু দুজনকে একই কামরায় নজরবন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন স্বামিজী ওরফে নানকু এক জায়গায় আর সুনীল রায় অপর জায়গায় থাকাতে

অসুবিধার সম্ভাবনা রয়ে গেল। বিজয় অবশ্য নানকুর ওপর নজর রেখেছে, আবার কোন ঝামেলা না করে। সুনীল রায়কে ধরায় কোন ঝঞ্ঝাট হবে বলে মনে হল না। হয়তো একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। এতগুলো লোকের সামনে, বিশেষতঃ শ্যালিকার সামনে, গ্রেপ্তার করতে গিয়ে হয়তো নিজেই লজ্জায় পড়ে যাবেন। কিন্তু কি আর করবেন কোন উপায় নেই। তাঁকে তাঁর কর্তব্য করতেই হবে, তা সে যত অপ্রিয়ই হোক না কেন। আর এ রকম অপ্রিয় কাজ তাঁকে কয়েকবারই করতে হয়েছে, এ বিষয়ে পুলিসের কাজ ডাক্তারদের কাজেরই অনুরূপ। ডাক্তার যখন তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে দেহের বিষাক্ত অংশটা অনায়াসে বাদ দিয়ে দেন তখন তার পেছনে রুগীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই থাকে, সমাজকে নির্দোষ ও পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য তাঁদেরও এ সব করতে হয়। ব্রজেশ্বরবাবু পরবর্তী ছবিটা মনে মনে কল্পনা করে নিলেন।

আপনার নাম ?

আমায় বলছেন ? হয়তো সুনীল রায় আশ্চর্য হবে।

হ্যাঁ।

আমার নাম সুনীল রায়, কিন্তু কেন বলুন তো ?

আপনি কি গ্রেসাম জোন্‌সে কাজ করেন ?

তখন সুনীলের মুখটা নিশ্চয়ই পাংশুবর্ণ হয়ে যাবে। না-বোঝার ভান করতে পারে, ভ্রুকুঞ্চিত করে হয় তো বলতে পারে, কেন বলুন তো ?

আমি পুলিসের লোক।

ব্রজেশ্বরবাবুকে তখন নিশ্চয়ই আত্মপরিচয় দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বলবেন তিনি, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। তার পর হয়তো আর কোন আপত্তি উঠবে না। মেয়েটি তখন কি করবে কে জানে ? চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাবে, না শান্ত হয়ে আঘাতটা গ্রহণ করবে ?

আসামী সুনীল রায়ের দিকে তাকালেন ব্রজেশ্বরবাবু।

সুনীল রায় শ্যালিকার সঙ্গে প্রাণখুলে নিশ্চিন্তমনে আলাপ করছে। সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছিল সুনীল রায়।

এষাকে বলছিল সে, তুমি একলা যাচ্ছ কেন ?

দোকলা পাব কোথায় ? হাসল এষা।

কেন সেই যে—। সুনীল রায় নামটা ঠিক মনে করতে পারছে না।

কি ?

কি যেন নামটা—হ্যাঁ হ্যাঁ—সঞ্জীব—সঞ্জীব দত্ত—

কেন, সে যাবে কেন আমার সঙ্গে ?

যাবে না ?

না।

কেন আপত্তি কিসের ?

কি মুশকিল, তার তো অন্য কাজ থাকতে পারে, আর তা ছাড়া আমি যাচ্ছি চাকরি করতে, সে যাবে কোথায় ?

তোমার চাকরি করতে। রসিকতা করলে সুনীল রায়।

হাসল এষা। কতদিন বাদে সুনীলদা আবার স্বাভাবিক ভাবে তার সঙ্গে কথা বললেন। ঠিক এই স্বাভাবিকতাটা যদি সুনীলদার বজায় থাকে তা হলে আবার মালতীদিকে ফিরে পাবে তারা।

সঞ্জীব এলে আপনার আর কি লাভ হত ? একটু হেসে বলল এষা।

আর কিছু না হোক একটু আড্ডা জমান যেত, ওখানের লোকগুলোর সঙ্গে ঠিক জমানো যাচ্ছে না—

কেন ?

বলছি শোন—এক নম্বর হল স্বামিজী, তিনি পাশে একটা বোঁচকা নিয়ে বসে আছেন, আর মাঝে মাঝে অন্য যাত্রীদের হস্তরেখা বিচার করে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করছেন বা মাতুলী গচাচ্ছেন। দু-নম্বর হলেন একটা মোটা মেম-সাহেব—পরিধি প্রায় ধীরেন ভড়ের মতই হবে, বোধহয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—তিনি তো সাধুজীর নামে ঢোক গিলছেন। তৃতীয় জন হল একজন গুণ্ডা—

গুণ্ডা ?

মানে গুণ্ডা কিনা জানি না, তবে চেহারা দেখলে তাই মনে হয়, তিনি একটা খবরের কাগজে মুখ লুকিয়ে অন্য লোকের ওপর নজর দিচ্ছেন।

কেন ?

বদ মতলব আছে নিশ্চয়ই। তারপর চতুর্থ নম্বর একজন কবি।

কবি ?

নির্ঘাৎ—

কি করে বুঝলেন ?

লক্ষণ দেখে আবার কি। হাতে খাতাকলম, ঘন ঘন জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে আর কি যেন লিখছে, গোঁপদাড়ি কামানো, মাথার চুলটা তোলা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা—চোখ দুটো সর্বদাই আধ-বোজা ভাব, কবি না হয়ে যায় না।

তা হলে কি—

সুটকেশে লেখা আছে কে সরকার।

তা হলে নিশ্চয় কমলাকান্ত সরকার—

চেন নাকি ?

হাঁ, পোস্ট গ্রাজুয়েটে পড়তেন ভদ্রলোক। সঞ্জীবের কাছে ওঁর কথা প্রায়ই শুনেছি। রেবা বলে একটি মেয়েকে ভালবাসতেন, কিন্তু মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল অন্য জায়গায়—বোধ হয় মালদহে এক উকিলের সঙ্গে, কিছুদিন পরে রেবা বিধবা হল।

ইস্, তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তার পর ?

তার পর শুচিবাইগ্রস্তা শাশুড়ীর পাল্লায় পড়ে, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে অবশেষে শুনলাম নার্স হয়ে বেলওয়ে না কোন্ হাসপাতালে যেন কাজ নিয়েছে।

এই সেই কমলাকান্ত ? জিজ্ঞেস করল সুনীল রায়।

হ্যাঁ।

তা হলে তোমায় ও কম্পার্টমেন্টে গিয়ে একবার দেখা করতে হয়।

কথাটা বলেই সুনীলের মনে পড়ল ও কামরায় আরও একজন আছে—হাসনু। সঙ্গে সঙ্গে একটু অপ্রস্তুত আর লজ্জিত হয়ে পড়ল সে।

সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ ঘনিয়ে এল এষাব মনে, সুনীলের দিকে একবার তাকাল সে। এত তাড়াতাড়ি কি মানুষের স্বভাব পরিবর্তন সম্ভব ? হয় তো সম্প্রতি কোন কারণে এ জীবনে অরুচি কিংবা বিপদের সামনে এসে একটু বোধ হয় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—তা হোক, দেখা যাক সারেংহাটি স্টেশনে গিয়ে কি হয়। চিন্তাটা মনে আসতেই এষা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

রবীন সরকারও গম্ভীর ভাবে তাকিয়েছিল ওদের দিকে। হঠাৎ লোকটা কোথা থেকে এসে মেয়েটার সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে তুলেছে। অবশ্য তার কিছুই নয়—তবুও রবীনের কেমন যেন খারাপ লাগছিল। খারাপ লাগার কারণটা রবীন ঠিক বলতে পারে না, তবে সে লক্ষ্য করেছে, ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে আগন্তুকের ওপর সে অকারণে বিরক্ত হয়ে ওঠে। আদত কথা সে একটু হিংসুটে—ইংরেজীতে যাকে বলে জেলাস, তাই। এজন্যে কয়েকবারই সে লজ্জায় পড়েছে—যেমন এই মাস দুই আগে ব্যাপারটা ঘটেছিল—

সেদিন রবিবার ছিল। পাশে রামধন মুস্তফীর বাড়ীতে মীরা গিয়েছিল বেড়াতে। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, মিণ্টু ঘুমিয়ে আছে। পাশে রাখা সেই ঘোড়াটার গায়ে একটা হাত রাখা—মা যেমন শোবার সময় তার গায়ে একটা হাত রাখেন ঠিক সেই রকম ভঙ্গীতে। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হল, দরজাটা খুলে দিয়ে এল রবীন। হঁ্যা, মীরাই বটে! মাথায় ছাতা ধরে আছে রামধন মুস্তফীর বড় ছেলে সুধীর মুস্তফী—রেণুর দাদা। ফিরে এসে নভেলটা আবার তুলে নিলে রবীন। দরজাটা বন্ধ করে মীরা মন্তব্য করলে, বাবা, যা বিষ্টি।

কোন জবাব নেই, মন্তব্যের সমর্থনও এল না রবীনের কাছ থেকে।

মিণ্টু ওঠে নি তো? জিজ্ঞেস করল মীরা।

উত্তর নেই, রবীন যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইটা পড়ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা অক্ষরও এগোয় নি তার।

কি হল? কাছে এসে মীরা রবীনের গায়ে হাত রাখলে।

কৈ, কিছু হয়নি তো। রবীনের নির্বিকার ভঙ্গীটা সন্দেহজনক!

বুঝেছি।

কি?

আসতে দেরী হয়েছে বলে বিরক্ত হয়েছ?

আমার বিরক্তিতে তোমার কি এসে যায়? রবীনের স্বর ভারাক্রান্ত।

কি করব বল? রেণু কিছুতেই ছাড়ল না, পুরো গানটা তুলে দিয়ে তবে ছুটি পেলাম—

হুঁ—

কথা বলছ না যে ? মীরা ওর বিরক্তির কারণটা জানতে চায়।

ঘরেবাইরে তো অনেক কথা শুনলে, বললে, তাতেও সাধ মিটল না ?

তার মানে ? এবার বিরক্ত হয়েছে মীরা, ইঙ্গিতটার তীক্ষ্ণতা স্পর্শ করেছে তাকে।

মানে তো খুবই স্পষ্ট। মুস্তফীর বাড়ীতে আড়াই ঘণ্টা গল্প করে এলে, তারপর বাইরেও কতক্ষণ তার ঠিক নেই—

বাইরেও ?

হ্যাঁ, ওই যে ছত্রধারকের সঙ্গে—

ও ত রেণুর দাদা।

তাই নাকি ? তা হলে তো কথাই নেই, একেবারে নিকট-আত্মীয় বলা যায়। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা রবীনের স্বরে স্পষ্ট।

তা কেউ বলেনি। মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে মীরা।

না বলেনি, তবে ব্যবহারে তাই প্রকাশ পায়। চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলে রবীন।

ব্যবহারে ?

হ্যাঁ, ওই যে আত্মীয়সুলভ ব্যবহার। মাথায় ছাতা ধরে, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে সযত্নে বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন।

দেখ ! কয়েক পা এগিয়ে এল মীরা।

বল। মুখ তুলে চাইল রবীন।

অসভ্যতা করো না।

অসভ্যতা ?

হ্যাঁ, তোমার ইঙ্গিতটা খুব ভদ্র নয়। মুখটা আরক্ত হয়ে উঠেছে মীরার।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, কোন ভদ্রলোক যদি একজন মহিলাকে এভাবে সাহায্য করেন তাতে ও ধরনের ইঙ্গিত করার কোন কারণ নেই।

তা ঠিক, তবে ওর জন্যে ভদ্রলোকের সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুস্তফীর বাড়ীতে কি চাকরের অভাব আছে ?

অভাব নেই, তবে ভদ্রলোক বেরুচ্ছিলেন—

সুতরাং তোমায় সঙ্গদানে কৃতার্থ করলেন।

মীরা উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা অবশ্য সেই রাতেই মিটে গিয়েছিল স্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে। না, স্ত্রীকে সন্দেহের কথা নয়, তবে রবীনের ওদিক দিয়ে সহ্যশক্তি কম। মীরাও সামনাসামনি আপত্তি জানিয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু রবীনের স্বভাবটা থেকেই গিয়েছে।

এষা এবং ঐ ভদ্রলোকের সম্পর্কের কথা যখন তার কানে পৌছল তখন রবীন যেন নিজের উপরই একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, ট্রেনটা এবার একটা ছোট গ্রামের পাশ ঘেঁষে চলেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ছোট্ট গ্রামটা—ছোট ছোট কুটিরগুলো আঁকাবাঁকা মেঠো পথের পাশে পাশে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে যেন। ঝোপ-ঝাড়গুলো যাদুমন্ত্রে অভিভূত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে—অন্ধকার আর ঘন কুয়াশার জাল ঘিরে ধরেছে গ্রামটার চতুর্দিকে। খুব নিঃসঙ্গ মনে হল রবীনের। আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে আর রহস্যাবৃত বলে তার কাছে ঠেকল। মনটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে রবীনের, হয়তো নবলব্ধ প্রমোশনের উত্তেজনাটা মিলিয়ে গিয়েছে এতক্ষণে, কিংবা হয় তো আনন্দের উচ্ছাসটা সম্যক-ভাবে প্রকাশ না করার ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কপালের কাছের শিরাদুটো দপ্ দপ্ করছে, কানের মধ্যে তার প্রতিধ্বনিটাও শুনতে পারছে সে, জানলার ধারে মাথাটা রাখল রবীন। লাইনের পাশে পাশে একসুরে ঝিঁঝিঁ পোকার দল ডেকে চলেছে, কামরার মধ্যে বাঙ্কের শিকলগুলো একযোগে আওয়াজ করছে ঝম্···ঝম্···ঝম্। গাড়ীটা দুলছে কিন্তু গতিটা কমে এসেছে। একটা স্টেশন এসে পড়েছে। খুশী হল রবীন, অনেকক্ষণ সিগারেট খেতে পারে নি সে; মালিক নাসুভাই-এর সাক্ষাতে সেটা সম্ভব নয়। পর পর উত্তেজনা আর অবসাদ এসে রবীনের ধূমপানের তৃষ্ণাটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এরকম ক্ষেত্রে ধূমপানটা প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে, তখন আর এটাকে বিলাস বলা চলে না। রবীন লক্ষ্য করে দেখেছে যে, উত্তেজনা আর অবসাদের মত নিভৃতে চিন্তার সময়ও ওটা সমভাবে দরকারী, তখন অবশ্য সিগারেট খাওয়ার ধরনটা পালটে যায়; তখন আর ঘন ঘন টানতে হয় না, একটা

মৃদু টান দিয়ে ধোঁয়াটা নাসারন্ধ্রে আর শ্বাসনালীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুসের ভিতর পাঠিয়ে দিতে হয় তারপর তার অব্যবহার্য অংশটুকু বেরিয়ে আসে ক্ষীণ ধারায়, নাক এবং মুখ দিয়ে। কথাটা চিন্তা করতেই রবীনের চাঞ্চল্য আরও বেড়ে গেল। এতক্ষণে গাড়ীটা থামল।

অপর বেঞ্চে বসা ব্রজেশ্বরবাবুর চাঞ্চল্যটা বাহ্যত প্রকাশ পায় নি কিন্তু। এইটাই শেষ ষ্টেশন, এর পরেই আসবে সারেংহাটি জংসন। সব ব্যবস্থাই করা হয়ে গিয়েছে বটে তবুও সব জিনিসটা মনে মনে একবার ছকে নিচ্ছিলেন তিনি। অভিজ্ঞ সেনাপতির মত ব্রজেশ্বরবাবু আগামী লড়াই-এর খুঁটিনাটিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করছিলেন মনে মনে। ব্রজেশ্বরবাবু যেন একজন বৈজ্ঞানিক—অনেক গবেষণার পর তাঁর আবিষ্কারের সাফল্যের জন্যে শেষ পরীক্ষাটির ফলাফলের আশায় ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন তিনি।

নিখুঁতভাবে সেইজন্যে তিনি সব দিকেই লক্ষ্য রাখছেন, সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে বিপদ আর পরাজয়ের গ্লানিতে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। বহুদিন তিনি পুলিসে কাজ করছেন এবং অনেক শিক্ষার পর সুসম্বদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার পদ্ধতিটা আয়ত্ত করেছেন। ট্রেনটা একটা ঝাঁকানি দিয়ে থামল। প্লাটফর্মে নেমে ব্রজেশ্বরবাবু চারিদিকে ভালভাবে দেখে নিলেন, সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। স্টেশনটা ছোট, প্ল্যাট-ফর্মের একাংশে করগেট টিনের ছাউনি-দেওয়া কয়েকটা কুঠরী নজরে পড়ল। ইতস্ততঃ কয়েকটা হ্যারিকেনের ধরনের তেলের আলো স্বল্পালোকিত প্ল্যাটফর্মে টাঙ্গান রয়েছে। যাত্রীসংখ্যাও নগণ্য। ব্রজেশ্বরবাবু বাসদেও শর্মার সন্ধানে চোখ ফেরাতেই মাধবীকে দেখতে পেয়ে বিব্রত বোধ করলেন। বস্তুতঃ কাজের সময় স্ত্রীলোকদের ঝামেলা যে কত অসুবিধাজনক সে অভিজ্ঞতা তিনি ইতিমধ্যে বহুবারই অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি পাশ কাটাতে সক্ষম হলেন না।

দাদাবাবু, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মাধবী ডাকল।

দাঁড়াতে হল ব্রজেশ্বরবাবুকে, বললেন, কি বল ?

বৌদি আর ছেলেমেয়েরা কোন্ গাড়ীতে ?

ও, তারা তো আসে নি, আমি একলাই এসেছি—

আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা আমাকে দিন তা হলে কলকাতায় গিয়ে দেখা করব একবার।

আচ্ছা, এর পরের স্টেশন মানে সারেংহাটি জংসনে আমার সঙ্গে দেখা করো। কথাটা বলে তিনি এগিয়ে চললেন, বাজে সময় নষ্ট করার মত অবস্থা তাঁর নয়। ক্ষুণ্ণ হল মাধবী।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে পরেশও প্ল্যাটফর্মে নেমেছে। এতক্ষণ একটানা-ভাবে সঙ্গীহীন অবস্থায় ছোট্ট কামরাটায় গাদাগাদি হয়ে বসে থাকতে তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। পাশের উচ্চশ্রেণীর কামরার দিকে নজর পড়ল পরেশের। এবার পাশে বসা সুনীল রায়কে দাদার বন্ধু বলে চিনতে দেরী হল না তার। মেয়েটির সঙ্গে তার বিলক্ষণ হৃদ্যতা আছে বলে মনে হল যেন। হাওড়া স্টেশনে আরও একজন লোক ফুল নিয়ে মেয়েটিকে 'সি-অফ' করতে এসেছিল। আর কিছু না হোক মেয়েটিকে দেখাশোনা করার লোকের অভাব নেই, কথাটা মনে হতে মনে মনে হাসল পরেশ।

পরেশ পিছন ফিরতেই ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লাগল তার। পাশ দিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু বেশ দ্রুতগতিতেই ফিরে আসছিলেন। ভাবী শ্বশুর এবং জামাই পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুতরাং সংঘর্ষণের ফলে স্থানচ্যুত হলেও পরেশই সৌজন্য প্রকাশ করে বলল, সরি—। উত্তরে ব্রজেশ্বরবাবু কিছু বললেন না, শুধু একবার ছোকরাকে তাকিয়ে দেখলেন। এ-ধরনের ভদ্রতা প্রকাশের রীতি তিনি পছন্দ করেন না, এর মধ্যে যেন কিছুটা উদ্ধত ভাবের সংমিশ্রণ আছে বলেই তাঁর ধারণা।

পরেশ নিজের কামরায় উঠে পড়ল। গার্ডের তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ ও সবুজ আলোর রশ্মিটা অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

গাড়ীটা চলতে সুরু করে দিয়েছে আবার।

ঘট্ ঘট্—ঘটর ঘট···তালে তালে কামরাগুলো দুলছে একসঙ্গে। ক্রীচ্-ক্রীচ···ঘটর-ঠং—এক লাইন থেকে অপর লাইনে ইঞ্জিনের পনিহুইলগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

কুসমী মেথরানীর ছেলেটা আবার উসখুস করছে তার মায়ের কোলের ওপর, হয় তো পেটের ব্যথাটা আবার কষ্ট দিচ্ছে তাকে। অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছেলেটা। চোখদুটো বন্ধ করে প্রাণপণ শক্তিতে

চিৎকার করে যাচ্ছে সে। কুসমী নানাভাবে তাকে শান্ত করার চেষ্টায় আছে।

কাঁধে ফেলে চাপড়ালে কয়েকবার, কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াবারও চেষ্টা করল একবার, নানা রকমের শ্রুত-অশ্রুত শব্দ উচ্চারণ করে ব্যথায়-কাতর শিশুর মনটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে চেষ্টা করল কতক্ষণ।

ছেলেটা কিন্তু কেঁদেই চলেছে, আর্তস্বরটা এবারে একটানা গোঙানিতে পরিণত হয়েছে।

সুহাসিনী দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন কুসমীর ছেলেটার দিকে। বিরক্তি বোধ করছেন তিনি নতুন মায়ের অজ্ঞতা লক্ষ্য করে ; বেদনার্ত তীক্ষ্ণ স্বরটা চাঞ্চল্য বাড়াচ্ছে তাঁর মুহূর্তে মুহূর্তে, অনভিজ্ঞ মায়ের অস্থিরতায় তিনি নিজেও বিচলিত হয়ে পড়ছেন যেন। শিশুদের ভাষা সুহাসিনী দেবী বুঝতে পারেন, তাদের মাংসপেশীর সামান্যতম প্রসারণ বা সঙ্কোচনের একটা বিশদ মানে আছে আছে তাঁর কাছে।

সুহাসিনী দেবী কুসমীর কোল থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিলেন শিশুটাকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুসমী তাঁর দিকে। মেথরাণী জেনে যাকে এতক্ষণ সন্তর্পণে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এসেছেন আবার তারই ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন তিনি কি করে ?

বজ্রাহতের মত নির্বাক হয়ে শুধু দেখছে কুসমী। সব আনন্দের উত্তেজনাটা গলার কাছে যেন একটা ঢ্যালার মত আটকে গিয়েছে।

ছেলেটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়েছে এবার, গোঙানিটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, যন্ত্রণার তীব্রতা হয়তো কমে আসছে অল্প অল্প করে। ছোট্ট মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। স্ফীত নাসারন্ধ্রের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক বলা যায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে শিশুটা।

সুহাসিনী দেবী একাগ্রভাবে লক্ষ্য করছেন ছেলেটার ভাবভঙ্গিগুলো। বাঁ হাত দিয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন তিনি, ছেলেটার দেহের উত্তাপটা অনুভব করছেন যেন। শুষ্ক পঞ্জরঅস্থিগুলো অনেকদিন পরে হারানো উষ্ণ স্পর্শটা আবার ফিরে পেয়েছে। ছেলেটার একটা হাত সুহাসিনী দেবীর বাহুর ওপর রাখা রয়েছে। ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে মুঠো করে যেন সে ধরে রাখতে চাইছে যন্ত্রণার অবসানকে।

ঠিক ননীর মত, প্রত্যেকটি ভঙ্গি যেন নকল করেছে ছেলেটা। সেই আঁকড়ে ধরে থাকা, সেই বুকের ওপর মাথা রাখার ধরনটা, তলার ঠোঁটটা একইভাবে ফুলিয়ে রাখা—সব ননীর মত, এতটুকু তফাৎ নেই।

ট্রেনটা বেশ জোরেই চলছে—একটু অস্বাভাবিক রকমের জোরে বলা চলে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত গাড়ীর কামরাগুলো দুলছে একদিক থেকে অপর দিকে। বাঙ্কের শিকলগুলো আওয়াজ করছে—ঝম্-ঝম্ ··ঝম। লাইনের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের আওয়াজটা আরও দ্রুত হল এবার।

সুনীল রায় চুপ করে বসেছিল—মনটা তার অকস্মাৎ নিস্তেজ হয়ে থেমে গিয়েছে যেন। এখন আর চিন্তার ঢেউগুলো এসে তার মনের ওপর বার বার আছড়ে পড়ছে না—নিস্তরঙ্গ নদীর মত স্থির, নিশ্চল আর সম্ভাবনাশূন্য হয়ে গিয়েছে সে। ফুটো বেলুনের মত সে যেন চুপসে পড়েছে, উত্তেজনার গ্যাসটা কোন ফাঁকে বেরিয়ে এসে তার মনের রূপটা বিকৃত করে ফেলেছে অকস্মাৎ। হাসনুর কথা আর মনেই পড়ছে না তার।

ট্রেনটা ছোট স্টেশনটা ছাড়বার পরই এষা একবার সুনীলের দিকে তাকাল। সুনীলদাকে কেমন যেন নিরাসক্ত বলে মনে হল তার।

এষার মনে কিন্তু ঝড় বয়ে চলেছে। সমস্ত দায়িত্বটা তার ওপরে হঠাৎ কিভাবে যে এসে পড়ল তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। নিখুঁতভাবে সাজানো জিনিসগুলো এক মুহূর্তে কে যেন উল্‌টে-পাল্‌টে, লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে একেবারে। নতুন চাকরির কথা, বাবার কথা, মালতীদির দুঃখ, সঞ্জীবের বিরহ—কিছুই আর মনে নেই এষার। সব চিন্তাগুলো ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এখন। এ ধরনের পরিস্থিতির সামনে তাকে কোন দিনই আসতে হয় নি অবশ্য। বিপদের সামনাসামনি জীবনে সে অনেকবারই এসেছে কিন্তু সেগুলো সামলে নেবার জন্যে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগও পেয়েছে সেই সঙ্গে।

অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাটায় অস্থির হয়ে পড়ল এষা—সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, সুনীলদা—

উঁ—

চুপ করে রয়েছেন কেন? নিজেই চুপ করে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

না, এই ভাবছিলাম সব ব্যাপারটা—আর কি—হাল্কাভাবে উত্তর দিল সুনীল রায়,—সমস্ত ঘটনাগুলো অদ্ভুতভাবে একটার পর একটা কে যেন সাজিয়ে রেখেছিল। কথাগুলো খুব দার্শনিকের মত শোনাচ্ছে না? ম্লান হাসি হেসে এষার দিকে তাকাল সে।

না; মাথা নাড়ল এষা, আপনি ঠিকই বলেছেন সুনীলদা, কিছুক্ষণ আগে আমিও ভাবছিলাম ওই কথা।

আমি কিন্তু নিজেকে খুব অপরাধী ভাবছি। তুমি নতুন চাকরিতে হয়তো আমার জন্যে জয়েন করতে পারবে না ঠিক সময়মত—

কয়েক ঘণ্টার দেরীতে খুব ক্ষতি হবে না আমার—

কয়েক ঘণ্টার বেশীও হতে পারে তো—

কেন তা আবার হবে কেন?

সেইটাই তো প্রশ্ন—মনে মনে ভেবে দেখ এষা, আমার, তোমার, এই ট্রেনের হয়তো অনেকেরই নিয়মমাফিক সাজানো রুটিনগুলো পালটে গেছে কিনা? তুমি যাচ্ছিলে নবোদ্যমে নতুন কর্মক্ষেত্রে নামতে। আমি কামিনী-কাঞ্চনের রস গ্রহণের আশায়—হাসনু নতুন আবিষ্কারের সন্ধানে···সকলেই তো এক-একটা বাঁধা নিয়মে নিজের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে চলেছিলাম কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে কেন?

কথার জবাবটা দিল না এষা। অনেক প্রশ্ন আছে তার জবাবের প্রয়োজন হয় না এমনকি প্রশ্নকারী হয়তো নিজেও তার আশা রাখে না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে এষা বলল, সুনীলদা একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলতে আর সঙ্কোচ কিসের এষা, তোমার কাছে আমি তো কিছুই লুকোই নি—

সব জিনিসটা এত স্পষ্টভাবে হঠাৎ প্রকাশ না হলেই ভাল হত বোধ হয়।

তোমার কথা আমার বন্ধু ডাক্তার নৃপেশ মুখার্জির কথা মনে পড়িয়ে দিলে—সে বলে, মানুষ অনেক বেশী সুখী হতে পারে যদি ঠিক সময়মত সে তার মনের আর দেহের রোগ-সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে পারে, তাই সেপটিক্ হবার আগেই বিষাক্ত ফোড়াটাকে বহির্মুখী করে দিলাম, কিন্তু সে-কথা থাক, তুমি যেন কি বলছিলে?

আমি বলছিলাম মালতীদির কথা, কথাটা এষা শেষ করল না।

বুঝেছি এষা, তুমি জানতে চাইছ মালতীকে আমি ভালবেসেছি কিনা ? আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসি নি, বাসতে পারি নি। সুন্দর চেহারার গর্ব আমার মনের স্বচ্ছতাকে বহুদিন থেকেই ঢেকে রেখেছে—তাই আমি কোন দিকেই তাকাতে পারি নি, তা ছাড়া—

তা ছাড়া ? এষা তাকাল সুনীল রায়ের দিকে, সবটা সে শুনতে চায়।

আমার নিজের ধারণা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সাময়িক—মানে সময়ের ঘায়ে সেটা ভেঙ্গে যেতে বা সময়ের সাহায্যে গড়ে উঠতে দেরী হয় না সেটার। স্ত্রী হিসেবে মালতী আমায় কি দিয়েছে তা আমি কোনদিনই ভেবে দেখি নি।

স্বামী হিসেবে আপনার দানের কথাটাই ভেবেছেন কি ?

হাসল সুনীল রায়, তারপর সস্নেহে এষার দিকে তাকিয়ে বলল, জান এষা, তোমার এই প্রশ্নটা আজ আমার আর একটা অভাব যেন পূর্ণ করে দিলে, ছোট বোন কিরকম হয় জানতাম না, এতদিনে তার যেন একটু স্বাদ পেলাম।

লজ্জা পেল এষা, আঘাত করতে গিয়ে নিজেই বেদনাটাকে বরণ করে নিল যেন সে, শুধু বলল, আচ্ছা সুনীলদা, ভালবাসার কথা না হয় বাদ দিলাম কিন্তু কারও জন্যে কোনদিন কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাও কি হয় নি আপনার ?

খুব বেশী নয় এষা ; যা কিছু দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তা তা আমি নিজেকে নিয়েই করেছি সর্বক্ষণ। অপরের জন্যে চিন্তা করাকে আমি দুর্বলতা বলেই জেনে এসেছি, কিন্তু জান এষা, এখন আমি যেন কিরকম হয়ে গেছি। এমিটিন ইনজেকসান নেবার পর যেমন রাস্তায় একটা মরা কুকুর পড়ে থাকতে দেখলেও ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ; অনেক দিন রোগ ভোগ করার পর যেমন পাশের বাড়ীর ছেলের কান্না শুনলে মনটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে, এখন আমার প্রায় সেই অবস্থা।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল এষা সুনীল রায়ের দিকে।

সুনীল রায় হাসল একটু, তারপর এষার দিকে তাকিয়ে বলল, বিশ্বাস করবে কিনা জানি না এষা, তবে ঠিক এই সময়ে মালতীর কথাই মনে পড়ছে বেশী করে। কেন জানি না মনে হচ্ছে সে কাছে থাকলে আমি হয়তো সবই সহ্য করতে পারতাম।

আর পারল না এষা, অভিমানের বাষ্প গলে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল গাল বেয়ে।

সুনীল রায় বলতে লাগল, জান এষা, কান্না আমার কোনদিনই ভাল লাগে না, মালতীর কান্নাগুলো মনে পড়ছে আমার। মনে আছে, তার চোখের জলের দিকে তাকিয়ে মনটা আমার কঠিন হয়ে উঠত, ব্যঙ্গও করেছি কয়েকবার সেজন্য। কিন্তু কতদিনের শুকিয়ে-যাওয়া মালতীর সেই চোখের জল যেন বন্যার মত আমায় ডুবিয়ে দিতে চাইছে এখন।

বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল এষা, গ্রীবার কাছের মাংসপেশীটা মোটা দড়ির মত টান হয়ে উঠল, পাশের ধমনীটার দ্রুত চলন সুস্পষ্ট হল সেই সঙ্গে। সুনীল রায়ের গলার স্বরটাও শেষের দিকে ভার ভার ঠেকল।

হঠাৎ সুনীল রায়ের নজর পড়ল ধীরেন ভড়ের ওপর—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের নিরীক্ষণ করছে সে। মুখে হাসি টেনে সুনীল রায় এষাকে বলল, এষা, ফিল্ম ডাইরেক্টার ধীরেন ভড় আমাদের মানসিক চাঞ্চল্যের কারণটা জানতে খুব উৎসুক হয়ে পড়েছে, কিন্তু ওকে খুশী করা চলবে না, হাসিমুখে তুমি ওর দিকে একবার তাকাও।

মুখ ফেরাল এষা—চিবুকটা কাঁপছে তখনও, কিন্তু হাসি ফুটে রয়েছে ওর মুখে আর সজল চোখে।

বেলুনটা চুপসে গেল আবার, ধীরেন ভড়ের হতাশার ভঙ্গি লক্ষ্য করে হাসিমুখে মন্তব্য করল সুনীল রায়। পাশের ও লোকটি হল আমাদের মালিক নানুভাই দেশাই—কথার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করল সে।

আপনাদের মালিক? বিস্মিত হল এষা।

দেশাই ফিল্মস্-এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী উনি এবং বর্তমানে আমাদের কর্ণধার—আউটডোর স্যুটিং-এর জন্যে সকলে চলেছেন পশ্চিমের দিকে।

ট্রেনটা যেন বেশী রকমের দুলছে, বলল এষা।

হ্যাঁ, স্পীড বেশী হয়েছে বলে তাই মনে হচ্ছে বটে। বাইরে তাকাল সুনীল রায়।

ব্রজেশ্বরবাবুও দুলছিলেন গাড়ীর তালে তালে, তবে মনটা এখন তাঁর স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন তিনি শুধু অপেক্ষা করছেন একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষা। চাঞ্চল্যটা তাঁর কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক, সেটা মনের একাগ্রতাকে নষ্ট

করে দেয়, স্নায়ু আর মাংসপেশীকে করে অচল, ক্ষিপ্রতা অদৃশ্য হয়ে আসে বিফলতায়। এখন অর্জুনের মত তাঁর একটিমাত্র লক্ষ্যবস্তু—আসামীকে করায়ত্ত করা। টিফিন কেরিয়ারটা কখন বেঞ্চের তলায় কাৎ হয়ে পড়ে গিয়েছে সেদিকে তাঁর নজরই নেই। আরামবাগের মাধবীর কথাও বিস্মৃত হয়েছেন তিনি।

ইঞ্জিনের আওয়াজটা আরও যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—ঝক্‌-ঝক্‌-ঝক্‌।

স্বামিজী বুঝেছে জালটা তার চতুর্দিকে ঘিরে এসেছে, তাই এখন সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে সে। সারেংহাটি স্টেশন আসার পূর্বেই তাকে জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হবে। পাশের থলিটায় হাত রাখল স্বামিজী। ব্রজেশ্বরবাবু প্রেরিত বিজয় সিংহের মুখের সামনে কাগজটা আর আড়াল নেই। এখন দুজনেই দুজনের কাজে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, আত্মগোপন করে লুকোচুরির প্রয়োজনীয়তার শেষ হয়েছে এতক্ষণে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিজয় সিংহ সাধুবেশী ডাকাতটার দিকে। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে তার প্রত্যেক ভঙ্গিগুলি। থলিটা এতহাতে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল স্বামিজী, একই সময়ে দাঁড়িয়ে উঠল বিজয় সিংহ। দুজনেই দুজনকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, শিকারী নেকড়ের মত। নিষ্পলক দৃষ্টিটা ঠাণ্ডা ইস্পাতের অনুরূপ। এক মুহূর্তের অসতর্কের ফলে পরাজয় স্বীকার করতে হবে, একথা দুজনেই জানে।

কেট ডগলাস, কবি কমলাকান্ত, হাসনু সকলে বজ্রাহতের মত শুধু তাকিয়ে রয়েছে, আকস্মিক ঘটনার আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে ওরা।

তীক্ষ্নস্বরে ইঞ্জিনের হুইসিলটা বেজে উঠল। প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে ট্রেনটা ছুটে চলেছে লৌহবর্ত্মের ওপর দিয়ে।

ছোট স্টেশন ছাড়বার পরই ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস পকেট থেকে মোটা চেন-দেওয়া ঘড়িটা বার করে দেখল। প্রায় সতের মিনিট লেট চলেছে ট্রেনটা। ভ্রূ কুঞ্চিত করে অস্ফুটস্বরে কয়েকটা কুট মন্তব্য করল রবার্ট। মেজাজটা ভাল নেই তার। গতকাল কেটের অগোচরে সহিদের সঙ্গে 'সিতারা' হোটেলের ভিতরের ঘরে বসে একটু মৌজ করেছিল সে। মৌজের মাত্রাটা যে শুধু বেশী হয়েছিল তাই নয়, গত রাতে তার একটুও ঘুম হয়নি, কেটের তীব্র গঞ্জনার দংশনে। ক্লান্তি আর বিরক্তিতে মনটা তার বিষিয়ে

রয়েছে এখনও। সহকারী আবদুল সাহেবের বিরক্তির কারণটা অনুমান করে নিয়েছে। তার নিজের জীবনেও, রাত্রের পানাহারজনিত অবসাদের অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস ট্রেনের স্পীড বাড়াতে নির্দেশ দিল আবদুলকে। এখনও অস্ফুটস্বরে রবার্ট হিন্দী আর ইংরেজীতে মেলান অশ্রাব্য কটু কথাগুলো বার বার উচ্চারণ করছে।

সাহেবের অবস্থা লক্ষ্য করে আবদুল আমোদ অনুভব করল; তারপর হাসিমুখে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

উজ্জ্বল ক্রাউন প্লেটটা চক চক করছে, সীসার প্লাগগুলো সারবন্দীভাবে সাজানো তাতে। বিভারসিং হুইলটা নড়ছে ইঞ্জিনের দুলকী চালের সঙ্গে। ফায়ার ডোর হ্যাণ্ডেলটা নামিয়ে দিল আবদুল, চুল্লীর আগুনের হল্কাটা অনুভব করল সকলেই, লক্ লক্ করে শিখাগুলো অজস্র সাপের ফণার মত কিলবিল করছে যেন।

ক্র্যাক এক্সেলের সুতীক্ষ্ণ একটানা আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত। স্পীড বাড়াবার জন্যে রেগুলেটারে চাপ দিল আবদুল, তাড়া—খাওয়া নেকড়ের মত ইঞ্জিনটা গর্জন করতে করতে তীব্রবেগে ছুটে চলল।

ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস পিছনের সিটে এসে বসেছে। বিরক্তি, অবসাদ আর ক্লান্তি রবার্টের চিন্তাশক্তিকে ধোঁয়াটে আর অকর্মণ্য করে দিয়েছে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আবদুল, সাহেব সিটে বসে ঢুলছে। ওয়াটার গেজ আর ভ্যাকুয়াম গেজদুটো ভালভাবে নজর করে দেখল আবদুল।

ইঞ্জিনের চিমনীর ওপর দিয়ে জলন্ত ফুলকিগুলো উড়ে পড়ছে চতুর্দিকে, তীব্রবেগে বাতাস এসে ইঞ্জিনের গায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে; লাইনের পাশে পাশে চাকা আর লাইনের সংঘর্ষণের শব্দটা জেগে রয়েছে, সবেগে বাষ্পটা তার অস্তিত্ব আর সতেজ বলিষ্ঠতা প্রকাশ করছে সুতীক্ষ্ণ বজ্রনির্ঘোষে। ঝক্-ঝক্-ঝক্, এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা উন্মত্ত প্রাগৈতিহাসিক বিরাট একটা সরীসৃপের মত।

টেণ্ডারের ওপর খালাসীটা বড় বড় পাথুরে কয়লা ভেঙ্গে চলেছে, ফার্নেসে যোগান দিতে হবে এখখুনি তাকে। ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস এখনও বসে বসে ঢুলছে, কিন্তু অবচেতন মনের পর্দায় বার বার একটা জিনিস ধাক্কা দিচ্ছে—সারেংহাটি তিন নম্বর কালভার্টের বিপদজনক বাঁকটার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত…।

হুহুঙ্কার গর্জনে লৌহ দানবটা কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে ঘুমন্ত সারেংহাটি গ্রাম মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠেছিল। নদীর স্রোতের মত লোকেরা ছুটে এসেছিল দুর্ঘটনাস্থলে। তিন নম্বর কালভার্টের কাছেই ইঞ্জিনটা লাইনচ্যুত হয়ে নিচের নালার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সারেংহাটি জংশন মাঝারী রকমের স্টেশন, সেখান থেকেও স্টেশন স্টাফ এবং কুলীরা সবাই এসে পৌঁছেছিল যথাসময়ে।

শীতের রাতে ঘন অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন দুর্ঘটনার বিভীষিকা কল্পনাতীত। একটানা আর্তনাদের শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না, দেখা যায় না। তুমুল কলরোলে আর জনতার অসংযত ব্যবহারে দুর্ঘটনার সমগ্র রূপটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি এখনও।

সারেংহাটির মধ্য দিয়ে প্রায় সাত মাইল রেলপথ সমতল ভূমির বিশ ফুট উঁচু দিয়ে সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। দু-পাশের গড়ান ধারে ঘন আগাছার জঙ্গল আর অসমতল মাটির ছোট ছোট স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। গড়ানে ধার যেখানে শেষ হয়েছে, তার দু-পাশেই রয়েছে লম্বা প্রশস্ত খাল। ভাল ইঁট তৈরি করার জন্যে সারেংহাটির খ্যাতি আছে এবং সেই প্রয়োজনে মাটি কেটে নেওয়ার ফলে হয় তো এ খালের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। আশপাশের ক্ষেতনিকাশীর কর্দমাক্ত জল এই খালেতেই মিশেছে, আর সমগ্র জলের ধারাটা তিন নম্বর কালভার্টের নিচে দিয়ে রেললাইনের অপরদিকে মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। ডাঙ্গার ধার ঘেঁষে রয়েছে নলখাগড়া, উলুঘাস আর হোগলার জঙ্গল। সারেংহাটি স্টেশনের অব্যবহিত পূর্বে লাইনটা প্রায় ইংরেজী অক্ষর 'এল'-এর অনুকরণে বেঁকে গিয়েছে, গাড়ীর ইঞ্জিনটা এখানেই লাইনচ্যুত হয়েছিল।

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিঘাতে জনতা প্রথমে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল এবং একযোগে সকলেই সাহায্য করার চেষ্টা করতে গিয়ে এক বিশৃঙ্খল তাণ্ডবের সৃষ্টি করল। সারেংহাটির ডাক্তার বলাই পাল চৌধুরীর কৃতিত্ব সেইখানেই। অসংযত জনতার বিশৃঙ্খলাকে রূঢ়ভাবে দমন করে ডাক্তার পাল চৌধুরী তাকে কাজে লাগালেন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে

স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি সুসংবদ্ধভাবে উদ্ধারের কাজে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করলেন। প্রথমেই একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সেটাকে তিনি 'বেস ক্যাম্প' রূপে ব্যবহার করতে মনস্থ করলেন। ভিড় হটানো হল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম কাজ। উত্তেজিত দর্শকদের তারা জোর করে দূরে সরিয়ে দিলে। হ্যারিকেন, মশাল, টর্চ এবং সারেংহাটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পেট্রোম্যাক্স দুটো কাজে লাগল ডাক্তার বলাই পাল চৌধুরীর। অকস্মাৎ জোয়ার এসেছে যেন তাঁর স্তিমিত থমকে-যাওয়া মাংসপেশী আর মনের মধ্যে। মেডিকেল কলেজে ছাত্র-জীবনের সেই হারানো উৎসাহ আর উদ্দীপনা আবার অনুভব করলেন তিনি।

ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে আহতদের বার করে নিয়ে আসার কাজ সুরু হয়েছে এবার। কাজটা অবশ্য সহজসাধ্য নয়। রাত্রের অন্ধকারে, উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এবং অপটু অনভ্যস্ত কাজের জন্যে উদ্ধারের কাজ ঠিকমত অগ্রসর হচ্ছে না। একদল লোক গাঁইতি, কোদাল, কুড়ুল নিয়ে বিধ্বস্ত বগীগুলির অন্তরালে অবরুদ্ধ যাত্রীদের বার করার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। তুমুল কলরোল পূর্বাপেক্ষা কমেছে, জনতার মানসিক স্থৈর্য এতক্ষণে ফিরে এসেছে বোধহয়। একমনে তারা নিজেদের কর্তব্য করে চলেছে। যাত্রীদের মধ্যেও কয়েকজন সাহায্যের কাজে হাত লাগিয়েছে, তার মধ্যে একজনের নাম বিনয়—রোগা লম্বা ধরনের যুবক, মেডিকেল কলেজে ওয়ার্ডবাবু হিসেবে কাজ করেছে কয়েক বৎসর। নিজেই সে ডাক্তার পাল চৌধুরীর সহকারীর কাজের ভার নিলে। অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তার পাল চৌধুরী বুঝলেন, বিনয় নির্ভরযোগ্য।

ড্রাইভার রবার্ট ডগলাসকে পাওয়া গেল নালার একপাশে। আকস্মিক মৃত্যুর চিহ্ন ওর মুখে ফুটে রয়েছে—চিন্তা করার মত অবসরও পায় নি সে, তাই বিমূঢ় বিস্ময়ের ভঙ্গিটা সুপরিস্ফুট।

একজন আহতকে নিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবকরা। মধ্যবয়স্ক, মোটা ধরনের চেহারা। ডানদিকের আঘাতটাই বেশি হয়েছে। কাঁধের কাছ থেকে বাহু পর্যন্ত রক্তাক্ত, চামড়া আর মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। কনুই-এর কাছে হাড়দুটো মাংস ভেদ করে বাইরে চলে এসেছে, পরিষ্কার সাদা হাড়দুটো দেখা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। বিনয়কে টুর্নিকেট বাঁধতে বললেন ডাক্তার

পাল চৌধুরী, নিজেও একটা ইনজেক্‌সান দিয়ে দিলেন সেইসঙ্গে। বাহুর সন্ধিস্থলে ধমনী দিয়ে বেগে রক্তের ধারা বয়ে চলেছিল, টুর্নিকেট বাঁধার পর ধীরে ধীরে সেটা কমে আসছে। বিনয় এখনও দড়ির ভেতর একটা কাঠি দিয়ে সেটা ঘুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত—চাপ হয়ে দড়িটা বসে গিয়েছে হাতের ওপর, রক্তটা ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে এবার।

মর্‌ফিন দোব? জিজ্ঞেস করল বিনয়।

দাও, কিন্তু বুজে-সুঝে দিতে হবে, আহতের সংখ্যা বেশি, ওষুধ কম, বললেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

ব্যাণ্ডেজ করব?

কর। তুলো এবং ছেঁড়া কাপড় দিয়ে হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলে বিনয়।

মুমূর্ষু লোকটা চোখ মেলে তাকাল একবার, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে ডাক্তারবাবু।

কোন ভয় নেই, চোখ বন্ধ করুন, আশ্বাস দিলেন ডাক্তারবাবু।

যদি বাড়ীতে একটু খবর দেন,—আমার নাম ধীরেন ভড়, অস্ফুটস্বরে বলল আহত লোকটি।

খবর দেওয়া হবে, আপনি নিশ্চিন্ত হন।

ফের অজ্ঞান হয়ে গেল, বলল বিনয়।

ভালই হল, মরফিয়ার কাজ সুরু হয়েছে তা হলে।

বাঁচবে?

যদি রিলিফ ট্রেনটা তাড়াতাড়ি এসে যায় তা হলে আশা আছে—ব্লাড দেওয়া খুব দরকার, হাতটা অবশ্য বাদ দিতে হবে শেষ পর্যন্ত, 'ক্রাসড' হয়ে গেছে একেবারে। কম্বলটা গায়ে চাপা দিয়ে যাও।

ডাক্তার পাল চৌধুরী অন্য কেসে হাত দিলেন। আশপাশে মাঝে মাঝে চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সারেংহাটি থানা থেকে পুলিস এসে গিয়েছে ইতিমধ্যে, এখন ভিড় নিয়ন্ত্রন করছে তারাই। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা আলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে সেখানে ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত ভিড় দেখা যাচ্ছে।

ঘন কুয়াশা নালার উপর থিতিয়ে জমাট বেঁটে রয়েছে যেন। আলোগুলির উজ্জ্বলতা কমে গিয়ে হলদে রং-এর হয়ে গিয়েছে।

স্ট্রেচারে করে আর একজন আহতকে নিয়ে এসেছে ওরা। ডাক্তার পাল চৌধুরী একবার তাকিয়ে দেখলেন। গেরুয়া পরিহিত একজন আহত যাত্রী, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। ভারী একটা হাতুড়ী দিয়ে কে যেন সাধুজীর মাথা আর মুখটা চূর্ণ করে দিয়েছে একেবারে। ভ্রূর ওপর থেকে চোয়াল পর্যন্ত একটানা লম্বা একটা ফাটলের মত দেখা যাচ্ছে। চোখটা অক্ষিকোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে প্রায়, কানের ভেতর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর ঘিলু বার হয়ে আসছে ক্রমাগত। বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার পাল চৌধুরী বললেন, এখানে একে আনলে কেন? ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের দিকে।

মারা গেছে? জিজ্ঞেস করল ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে—, দেখছ না মাথার খুলি আর মুখটা চূর্ণ হয়ে গেছে। যাও, ওকে ওখানে রেখে এস।

মৃত দেহগুলি ঢালু জায়গার একপাশে রাখা হয়েছে। ভিজে নরম ঘাসের ওপর একটার পর একটা বিভিন্ন ভঙ্গিতে সেগুলি শুয়ে রয়েছে। ট্রেনের ধ্বংসাবশেষের মত এগুলিও আর কাজে লাগবে না,—এখন ওগুলি মূল্যহীন, অব্যবহার্য ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

পিছনের কামরার যাত্রীদেরও সাহায্যের প্রয়োজন। দৈহিক আঘাত এড়িয়েছে অনেকেই কিন্তু আকস্মিক মানসিক আঘাতে অনেকেই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তারবাবু একবার ওদিকে আসবেন?

আগন্তুকের দিকে তাকালেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

কি হয়েছে?

আমার স্ত্রী কি রকম হয়ে গেছে যেন।

ভীত পাংশু মুখের দিকে একবার তাকালেন ডাক্তার পাল চৌধুরী, তারপর বিনয়কে বললেন, তুমি একবার যাও, দেখে এস কিছু করতে পার কিনা। হাতে কাজ রয়েছে তাঁর, একজন আহতের পরিচর্যা করছেন তিনি।

আগন্তুকের সঙ্গে এগিয়ে গেল বিনয়।

বিক্ষিপ্ত কোলাহলের কিছু কিছু অংশ শুনতে পাচ্ছেন ডাক্তার পাল চৌধুরী। বিধ্বস্ত বগির অন্তরালে সন্ধান পেয়েছে ওরা আর একটা মুমূর্ষু মানুষের—

তাই এই আলোড়ন। মনে মনে হাসলেন ডাক্তার, এরা আঘাত করতেও যেমন পটু আবার উদ্ধার করতেও তেমনি ব্যগ্র। কিছুদিন আগে সারেংহাটি বাজারে একজন চোর ধরা পড়েছিল, উন্মত্তের মত জনতা তাকে প্রহার করেছিল নির্দয়ভাবে। মনে পড়ল, চোরটার প্রাথমিক চিকিৎসা তিনিই করেছিলেন।

ডাক্তারবাবু—আহত লোকটা কথা বলছে, আমি কি বাঁচব ?

কেন, কি হয়েছে আপনার যে বাঁচবেন না ? কলার-বোনটা ফ্র্যাকচার হয়েছে মাত্র, ওতে কেউ মরে না।

কিন্তু শরীরটা কি রকম ঝিম ঝিম করছে যেন।

ওটা ভয়েতে হচ্ছে, আপনি পিছন ফিরে বসুন। কাঁধের পিছনে একটা কাঠের টুক্‌রো দিয়ে তার ওপর ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী, তারপর বললেন, এখন আপনার শুয়ে থাকা দরকার নেই।

দরকার নেই ?

না, আপনি বরঞ্চ আমাদের একটু সাহায্য করার চেষ্টা করুন।

কি করব বলুন ?

ওই লোকটিকে একটু ওয়াচ করুন।

এ কি ! এ যে ধীরেন ভড়।

চেনেন ?

হ্যাঁ, একই কোম্পানীতে কাজ করি আমরা। রবীন সরকার ধীরেন ভড়ের পাশে গিয়ে বসল।

ডাক্তার পাল চৌধুরী আকাশের দিকে একবার তাকালেন।

কুয়াশার আবরণে আকাশের রংটা দেখা যাচ্ছে না। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরোগুলি ভেসে ভেসে একটা কোণের দিকে জড়ো হচ্ছে এক এক করে।

ডাক্তারবাবু, বিনয় ফিরে এসেছে।

কি হল ?

কিছু করতে পারলাম না, ভদ্রমহিলা কেবল চীৎকার করছেন পাগলের মত। একটা মরফিয়া দিয়ে আসব ?

না, এসব কেসে মরফিয়া দেওয়া হয় না, তা ছাড়া মরফিয়া বেশী

নেই, বাজে খরচ করা চলবে না। আমি যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ ওখানেই থাক। ডাক্তার পাল চৌধুরী ট্রেনের পিছন দিকে এগিয়ে চললেন। অদূরেই দেখা গেল একটা ছোট ভিড় হয়ে রয়েছে। তিনি নিকটে যেতেই ভিড় সরে গেল। একজন ভদ্রমহিলা চীৎকার করছেন ক্রমাগত, দু-পাশ থেকে দুজনে তাকে ধ'রে রেখেছে।

ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও—তীক্ষ্ণ অনুনাসিক স্বরটা একঘেয়ে আর একটানা। শান্ত করতে কয়েকবার বিফল চেষ্টা করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—নিজেকে মুক্ত করে নিতে চেষ্টা করছেন তিনি।

চুপ করুন, একেবারে চুপ—দু-বাহু ধরে ঝাঁকানী দিয়ে সজোরে চীৎকার করে উঠলেন ডাক্তারবাবু। ফল হল না কিছু।

ছেড়ে দাও, আমায় ধরে রেখ না, ছেড়ে দাও—চীৎকারটা চলেছে সমানে। অকস্মাৎ ডাক্তার পাল চৌধুরী সজোরে চড় মারলেন মহিলাটির গালে। থমকে থেমে গেলেন তিনি, কান্নাটা বন্ধ হল কিন্তু এখনও কি যেন বিড় বিড় করে বকছেন আপন মনে। আবার এক চড়। এবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মহিলাটি। দর্শকরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ডাক্তার পাল চৌধুরীর, সেই ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, ওঁকে নিয়ে একটু নির্জনে চলে যান, এবারে ঘুমিয়ে পড়বেন হয়তো, আর আপনারা এখানে ভিড় করবেন না, সরে যান। শেষের কথাগুলি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি ফিরে চললেন আগের জায়গায়, এসব ক্ষেত্রে এর চেয়ে ফলদায়ক ওষুধ নাকি আর কিছু নেই।

ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছেন ডাক্তার পাল চৌধুরী, ভ্রূ কুঞ্চিত করে একবার পিছন ফিরে তাকালেন তিনি, চিকিৎসার রূঢ় আর অপ্রিয় প্রতিক্রিয়াটা যেন নিজের মধ্যেই ফুটে উঠছে তাঁর অজ্ঞাতে।

আর একজন আহত তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসলেন তিনি। আগের রোগীর কথা মন থেকে মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে, হাতের কাছে যে এসেছে সেই জুড়ে বসল তাঁর মনটায়।

আর্টারী ফরসেপ দাও—কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে ডাক্তার পাল চৌধুরীর—স্পিরিটে ডুবিয়ে আর্টারী ফরসেপ এগিয়ে দিলে বিনয়।

ক্যাটগাট—বাঁ হাতটা বাড়ালেন তিনি।

স্টেরিলাইজড করা নেই, দ্বিধাভরে বলল বিনয়।

রাখ তোমার স্টেরিলাইজেসান, ধমকে উঠলেন যেন তিনি, একটা এ্যাট্রোপিন ইনজেক্‌সান কর। একমনে সেলাই করছেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

বাসদেও শর্মার হাঁটুর ওপরে আঘাত লেগেছে। উরুর চামড়া আর মাংস-পেশী ছিন্নভিন্ন হয়ে যেন দলা পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমে ছিন্নমুখ শিরাগুলো নির্ভুল ভঙ্গিতে ফরসেপ দিয়ে ধরে একটার পর একটা বেঁধে চলেছেন তিনি। এর পর এলোমেলো মাংসপেশীগুলোকে সাজিয়ে চর্বির আস্তরণটা সেলাই করে সব-শেষে ওপরের ত্বকটা সেলাই করতে লাগলেন ধীরে ধীরে। কাজ করতে ভাল লাগছে ডাক্তার পাল চৌধুরীর, খুব ভাল লাগছে। প্রথম জীবনের সজীবতা আর ক্ষিপ্রতা ফিরে এসেছে তাঁর মধ্যে, জড়তা অদৃশ্য হয়েছে উৎসাহ আর নতুন উদ্দীপনায়।

বাবুজী, এতক্ষণে কথা বলল বাসদেও শর্মা।

কেয়া?

থোড়া পানি, বহুত পিয়াস—।

তার মুখে জল ঢেলে দিল বিনয়। আকণ্ঠ জল পান করল বাসদেও, তৃষ্ণায় গলাটা তার কাঠের মতো শুকিয়ে গিয়েছে।

ত্বকের ওপর সেলাইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাঁচি দিয়ে বাড়তি ক্যাট-গাটগুলি নিপুণ হাতে ছেঁটে দিলেন তিনি, তার পর একদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত অনুধাবন করলেন নিজের কাজটা। হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে, জামার আস্তিন দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখটা একবার মুছে নিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী। অনেকদিন পর আবার যেন জোয়ার এসেছে তাঁর রক্তস্রোতে—পল্লীগ্রামের থিতিয়ে-যাওয়া জীবনে এসেছে উত্তেজনা আর কর্মব্যস্ততা। ভাল লাগছে ডাক্তার পাল চৌধুরীর, বেশ ভাল সাগছে। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। সজোরে সেটায় টান দিয়ে ধোঁয়াটা আত্মসাৎ করার চেষ্টার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি—শ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়ার অব্যবহৃত অংশটুকু বেরিয়ে এল ক্ষীণ ধারায়।

নতুন কেস এসেছে একটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেসটা কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করলেন তিনি, তার পর বিনয়কে বললেন, পাল্‌সটা দেখে। কয়েকবার অনুভব করার বিফল চেষ্টা করে বিনয় বলল, বুঝতে পারছি না।

সর, আমি দেখি—কয়েক সেকেণ্ড হাতের কব্জির কাছে তাঁর তিনটে

আঙুলের চাপে অনুভব করতে চেষ্টা করলেন দুর্বল 'ধমনীর মৃদু কম্পনটা, তার পর বললেন, হ্যাঁ পালস্ আছে, পারকর্টা ইনজেকসানটা বার কর, ব্যাগেই আছে।

হ্যাঁ পেয়েছি, দিয়ে দোব ?

দাও, তার আগে গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়ে দাও।

কিন্তু বাইরে তো কোন চোট দেখছি না, মাথায় শুধু একটা জায়গায় একটু কেটে গেছে।

খুব সম্ভব ইন্টারনাল হেমারেজ হচ্ছে আর মাথার চোটটাও কম নয়, ড্রেস করে দাও ওটা। একটু প্লাসমা পেলে হয়তো লোকটাকে বাঁচান যেত, আমার বড় ব্যাগে গ্লুকো স্যালাইন আছে, বার কর, উপস্থিত তাই দেওয়া যাক।

স্যালাইন সেটটা খাটিয়ে ফেলল বিনয়। স্ট্যাণ্ডের ওপর উল্টান বোতলে রয়েছে গ্লুকোজ এবং স্যালাইন। রবার টিউবের প্রান্তের মোটা স্থঁচটা বাহুর ধমনীতে নির্ভুল ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী। রবারের নল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা স্যালাইন ধমনীর ভেতর রক্তের সঙ্গে মিশছে ধীরে মন্থর গতিতে। স্তিমিত আলোকে কাঁচের টিউবটার মধ্যে স্যালাইনের ফোঁটাগুলো চোখের জলের মত ঝরে পড়ছে এক-একটা করে।

বুনো ঘাসের সোঁদা গন্ধ ভিজে কুয়াসার সঙ্গে এক হয়ে মিশে রয়েছে। লোকেরা দলবদ্ধভাবে খালের পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে আনাগোনা করছে বার বার, পায়ের শব্দগুলি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—ছপ ছপ ছপ। অদ্ভুত আকৃতির দীর্ঘ ছায়াগুলি বার বার সরে যাচ্ছে একদিকে থেকে অপর দিকে।

ডাক্তার পাল চৌধুরী খালের অপর পারে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ আগে সারেংহাটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরিদাসকে তিনি বাজারে পাঠিয়েছেন ওষুধের খোঁজে, এখনও এসে পৌছায় নি সে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, ওষুধের অভাবে কাজ ব্যাহত হচ্ছে তাঁর।

ডাক্তারবাবু, হরিদাস ফিরেছে।

কি হল ?

পেলাম না কিছু।

সে কি, রমণীবাবু কোথায় ?

বাজারের রমণী মেডিকেল হলের মালিক তিনি।

রমণীবাবু আজ বাড়ী চলে গেছেন।

বাড়ী গেলে না কেন?

সে তো নদীর ওপারে, যেতে আসতে সকাল হয়ে যাবে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী, তার পর বললেন, তা হলে এক কাজ কর।

বলুন।

দোকানের দরজা ভেঙ্গে ফেল।

দরজা ভাঙ্গব? বিস্মিত হল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরিদাস।

এতগুলি লোকের প্রাণ নির্ভর করছে ওষুধের ওপর।

কিন্তু—

বুঝেছি, ভয় পাচ্ছ তুমি ওখানে কে, পয়েণ্টসম্যান জীতনারায়ণ না?

হ্যাঁ।

ডাক ওকে। জীতনারায়ণ এসে দাঁড়াল।

তুমি বাজারের রমণী মেডিক্যাল হল জান?

দরজা ভেঙে ওষুধ আনতে পারবে? আমার ওষুধ চাই।

আমি এখুনি যাচ্ছি। মনের মত কাজ পেয়ে খুশীই হল জীতনারায়ণ, মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের হরিদাসের মত সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ল না একমুহূর্তের জন্যেও। জীতনারায়ণের সঙ্গে হরিদাস আর বিনয়ও গেল। কোন্ কোন্ জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন তার একটা ফর্দ মুখে মুখে বলে দিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

ধোঁয়া বেরুচ্ছে যেন কোথা থেকে, হয়তো কিছু পুড়ছে। রবার, কাঠ বা ঐ জাতীয় কিছু হবে বোধ হয়—কটু, চামসে, উগ্র গন্ধটা সমস্ত জায়গায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। আলো নিয়ে ঢালু জায়গার ওপর দিয়ে লোকেরা ওঠা-নামা করছে বার বার। কুয়াশার আস্তরণটা ভারী হয়ে নিচের দিকে নামছে ধীরে ধীরে—আকাশটা ভালভাবে দেখা যাচ্ছে এতক্ষণে।

জীতনারায়ণ, হরিদাস, বিনয় অনেক ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। প্লাস্‌মা, গ্লুকোস্যালাইন, গজ, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, প্লাসটার, পেনিসিলিন, এ্যান্টিটিটেনাস সিরাম, এ্যাড্রিনালিন, এ্যাট্রোপিন, মরফিন, কোরামিন—প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই নিয়ে এসেছে ওরা, আর এনেছে এক কেটলী গরম চা। ডাক্তারবাবুর দিকে এক গ্লাস চা এগিয়ে দিল হরিদাস।

চা কোথায় পেলে ? জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

বাজারে চা তৈরি করে যাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে, উত্তর দিল হরিদাস।

পয়সা নিচ্ছে নাকি ?

না, এমনি দিচ্ছে, আমার দোকানেও যা খাবার আর দুধ ছিল সব এখানে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওদিকের কোন খবর ডাক্তার পাল চৌধুরী রাখতে পারেন নি। নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন তিনি যে, অন্যদিকে মন দেওয়ার মত অবসর ছিল না তাঁর। মাত্র কয়েকদিন আগে এই হরিদাস একজন ক্রেতার সঙ্গে কয়েক পয়সা কম দেওয়ার জন্যে তুমুল বচসা করেছিল বলে মনে পড়ল তাঁর, এখন অকাতরে সব বিলিয়ে দিয়ে যেন পরম কৃতার্থ হয়েছে সে। ডাক্তার পাল চৌধুরী বিস্মিত হলেন।

ডাক্তারবাবু, আমায় একটু আইডিন দেবেন ? ডাক্তার পাল চৌধুরী তাকালেন, এই যুবকটিও এতক্ষণ অক্লান্তভাবে বিনয়ের মত পরিশ্রম করেছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। আহতদের বহন করা, অকুণ্ঠচিত্তে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা ইতিপূর্বেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কি হয়েছে—জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, উত্তর দিল পরেশ, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি—এবার বেশ জ্বালা করছে। জানলার ধারে বসেছিলাম, কি ভাবে যে ছিটকে পড়েছি তা নিজেই জানি না।

কোথায় পড়েছিলেন ?

নরম মাটির ওপর—

তাই বেঁচে গেছেন—ডাক্তার পালচৌধুরী ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বিনয়কে ড্রেস করে দিতে বললেন, তারপর পরেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন ?

মাসিমাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছিলাম।

তিনি কোথায় ? যুবকটিকে ভাল লাগছিল ডাক্তার পাল চৌধুরীর।

এখনও ভেতরে আটকে রয়েছেন—হয়তো বেঁচে নেই। একদল লোক ওখানে কাজ করছে, তাই ভিড় না বাড়িয়ে এদিকে কিছু করার চেষ্টা করছি।

খবর পেয়েছেন কিছু ?

না, এখনও পাই নি, পুলিস জায়গাটা কর্ডন করে রেখেছে। আচ্ছা, আপনি তো একলাই সব করছেন, এখানে অন্য কোন ডাক্তার নেই ?

নদীর ওপারে আছেন আর একজন, এতক্ষণে হয়তো খবর পেয়ে থাকবেন।

আমার দাদাও ডাক্তার, কলুটোলায় আমাদের বাড়ী।

কি নাম বলুন তো ?

ডাক্তার নৃপেশ মুখার্জী।

নৃপেশ আর আমি একসঙ্গেই পড়তাম—।

অন্ধকার ভেদ করে দূর থেকে একটা তীব্র আলোর রশ্মি দেখা গেল। রিলিফ ট্রেন আসছে, আশা আর আশ্বাসের প্রতীক যেন ওটা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল অকস্মাৎ।

রিলিফ ট্রেন থেকে একসঙ্গে অনেক লোক নামল—ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার কুলী, ডোম—। অনেক জিনিস এনেছে ওরা—তাঁবু, স্ট্রেচার, আলো, ওষুধ, ক্রেন, যন্ত্রপাতি। এ ধরনের আকস্মিক বিপদে যা-কিছু প্রয়োজনীয় সব জিনিসই সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ গত মহাযুদ্ধে বর্মাফ্রণ্টে কাজ করেছেন, এ ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা তাঁর কম নয়। তিনিই রিলিফের চার্জে আছেন, এ্যাসিস্টেণ্ট হিসেবে তাঁর সঙ্গে এসেছেন ডাক্তার ভার্গব। এদের সঙ্গে রয়েছেন চার জন নার্স, দু-জন মাদ্রাজী, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং বাঙালী নার্স রেবা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রেল-হাসপাতালে রেবা কাজ করেছে কিন্তু রিলিফের কাজে তার এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

দুর্ঘটনার সংবাদ তারা আগেই পেয়েছ, কিন্তু এই পথটুকু আসতে প্রায় দু-ঘণ্টা সময় অপব্যয় হয়ে গিয়েছে, তাই ত্রস্ত হয়ে সাজসরঞ্জাম এবং ওষুধ-পত্রগুলি গুছিয়ে নিচ্ছে নার্সরা। আহতদের ইতিমধ্যে আনা সুরু হয়ে গিয়েছে।

আমায় কয়েকটি এ্যাট্রোপিন দেবেন ? ডাক্তার পাল চৌধুরী রিলিফ ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এ্যাট্রোপিন ফুরিয়ে গিয়েছে তাই তাঁকে আসতে হয়েছে এখানে। মেজর কল্যাণসুন্দরম্ এগিয়ে এলেন।

আপনি ?

আমি ডাক্তার, এখানে ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা আমিই করেছি।

চলুন, আমি যাচ্ছি—। মেজর কল্যাণসুন্দরম্ ডাক্তার পালচৌধুরীর সঙ্গে উঁচু জায়গাটির দিকে এগিয়ে গেলেন—ওখানেই ডাক্তার পালচৌধুরী তাঁর 'বেস ক্যাম্প' করেছেন। চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন মেজর কল্যাণসুন্দরম্, খুশী হলেন তিনি। এত অল্প সময়ে এবং এত অসুবিধার মধ্যেও ডাক্তার পালচৌধুরী যেভাবে আহতদের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করেছেন তা লক্ষ্য করে মেজর কল্যাণসুন্দরম ডাক্তার পালচৌধুরীকে অভিনন্দন জানালেন।

তীব্র কর্ণভেদী একটা শব্দ হচ্ছে—ক্রেনটা চালু হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর বগিটায় হাত লাগিয়েছে ওরা। ক্রেনের আওয়াজ হচ্ছে ঘড় ঘড় করে। তীব্র আলোর রশ্মি পড়েছে আসগরের মুখের ওপর—ক্রেন চালাচ্ছে সে। চীৎকার করে উঠল আসগর—'হাপিস'।

অবরুদ্ধ যাত্রীরা জীবিত বা মৃত যে-কোন অবস্থাতেই থাক মুক্তি পাবে এবার। উন্মুখ জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে চারিদিকে ঘিরে। মেজর কল্যাণসুন্দরম্ এবং ডাক্তার পালচৌধুরীও এগিয়ে গেলেন সেই দিকে।

আহত ও নিহতদের বার করা হচ্ছে এক এক করে। অকস্মাৎ শিশুর কান্নায় সচকিত হয়ে সকলে তাকাল সেই দিকে। বার করা হল একজন শীর্ণ মহিলার মৃতদেহ, জীবন্ত শিশুটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তিনি—মৃতদেহের ভাঙা পাঁজরার তলায় শিশুটা অদ্ভুত ভাবে বেঁচে গিয়েছে। তারস্বরে চীৎকার করে কাঁদছে শিশুটা—হিমশীতল মৃতের বন্ধনে প্রাণচাঞ্চল্যের উত্তাপ। শুষ্ক শীর্ণ লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে সুহাসিনী দেবী কুসমী মেথরানীর ছেলেটাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

কড় কড় কড়াত—ভাঙা বগির লোহার কাঠামোটাকে ক্রেনে করে টেনে তোলা হচ্ছে—আসগরের কালিমাখা হাতের মাংসপেশীগুলো চেন টানার সময় ফুলে ফুলে উঠছে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠল আসগর—'আরিয়া'।

রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ইসরাইলও এই গাড়ীতেই এসে গিয়েছেন, তিনিও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু করে দিয়েছেন—নিপতিত ইঞ্জিনটার কাছে গিয়ে তিনি ভালভাবে লক্ষ্য করছেন তার বিভিন্ন অংশগুলি।

সকাল হয়ে আসছে, পূর্বদিকের আকাশের রঙ প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, অপর দিকের আকাশের রঙ্ কিন্তু এখনও পাণ্ডুর বর্ণের।

ডাক্তার পালচৌধুরীর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে—এবার ফিরতে হবে তাঁকে। গড়ান জায়গাটার কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মৃতদেহগুলি রাখা হয়েছে—অবিন্যস্তভাবে দেহগুলি একটার পর একটা সারবন্দীভাবে রাখা আছে। এক একটার ভঙ্গি এক এক রকমের—কোন মিল নেই, কোন সামঞ্জস্য নেই, যেন অর্থহীন বিচিত্র সমাবেশ একটি। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চললেন তিনি ফিরতি পথে। বাজারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন ডাক্তার পালচৌধুরী। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সকলে তাঁর দিকে—জনতা নীরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে একজন অকুণ্ঠ অক্লান্ত জনসেবককে।

হঠাৎ চোখে পড়ল তাঁর ডিসপেনসারীর ভাঙা দেওয়ালটার ওপর। দেখলেন তাঁর প্রাত্যহিক রুগী মহেশ ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রতিদিনের মত যকৃৎ ও পেটের পীড়ার হুবহু বিবরণটি পেশ করার জন্যে তিনি একটু সকালেই হাজির হয়েছেন আজ।

অকস্মাৎ বিষাক্ত তিক্ততায় আকণ্ঠ যেন ভরে গেল ডাক্তার পালচৌধুরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এল তাঁর, মুহূর্তে অবসাদগ্রস্ত আর ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি।

স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে সারেংহাটিতে। রিলিফ ট্রেনটা ফিরে গিয়েছে অনেকক্ষণ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমী এবার ফিরে আসছে ধীরে ধীরে।

রেললাইনটা চালু হয়েছে আবার। পয়েণ্টসম্যান জীতনারায়ণ তার ডিউটিতে চলেছে। ওভারব্রীজ পার হওয়ার সময় একবার লাইনের দিকে তাকাল সে। আর একটা গাড়ী আগের সেই লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে, ইঞ্জিনটাও এক ধরনের—ডাব্লুউ. পি. টাইপের। তীক্ষ্ণ হুইসিল বাজিয়ে সগর্জনে এগিয়ে চলল গাড়ীটা সেই দিকে। হঠাৎ জীতনারায়ণের মনে হল মানুষগুলিও ঠিক ইঞ্জিনেরই মত—একটার পর একটা মদগর্বে উন্মত্ত হয়ে একই দিকে এগিয়ে চলেছে গর্জন করতে করতে, আগেরটার পরিণতির কথাটা আর স্মরণ নেই তার। পিছন ফিরে একবার দেখল জীতনারায়ণ।

কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীটি ওভারব্রীজের দু-পাশ দিয়ে ধীর-মন্থরগতিতে উঠছে ওপর দিকে—পিছনে তার নীল আকাশ।